www.banglastreet.online
বাংলাস্ট্রি.
উৎসব
১৪৩০

Heartiest Bijoya Greetings from :

MAIDEN CONTAINERISED CARGO MOVEMENT ON INDO BANGLADESH PROTOCOL ROUTE FROM HALDIA TO PANGAON

- Five Star Logistics is proud to announce the first voyage of containerized cargo movement through the Indo Bangladesh Protocol Route to further strengthen the ties between India and Bangladesh. This is the first movement of EXIM containers to Bangladesh through the protocol route.
- 45 containers carrying Sponge Iron on account of Rashmi Cements Limited and Orissa Metaliks Pvt. Ltd. will be loaded from Haldia Port for Pangaon Terminal in Bangladesh.
- The voyage will take about 8 days via Hemnagar and Mongla.
- Five Star Group would like to thank Rashmi Cement Limited, Orissa Metaliks Pvt Ltd., Haldia Port Authorities, Kolkata Customs and Adani Logistics for their guidance and support in making this vision a reality.
- This will be a regular service with a voyage every 15-20 days.

FIVE STAR LOGISTICS PVT. LTD.

OUR SERVICES :

▸ Stevedoring ▸ Logistics Storage ▸ Man Power handling ▸ Documentation

▸ Shipping Agency and Chartering ▸ Exporting & Importing (Iron Ore Fines, Coal, Clinker)

KOLKATA OFFICE : 19A, J. N. Road, Lesley House, 2nd Floor, Kolkata-700087, West Bengal India. Ph : 91-33-22171040 / 40014608, Fax : 91-33-22171041

HALDIA OFFICE : Ranichak, Haldia, Dist: Purba Medinipur, West Bengal, India. Ph: +91-3224 252415, +91-324093, Fax: +91-3224-251740

PIC : Yogesh Agarwalla, Mob. : 98300 84611, E-mail : yogesh@haldiafivestar.com

www.haldiafivestar.com

প্রকাশন সংস্থা

লুক ইস্ট মিডিয়া প্রাইভট লিমিটেড

সম্পাদক

আশিস পণ্ডিত

অনুপ্রেরণা
বিপ্লব ঘোষ
সাগরিকা ভট্টাচার্য

সহযোগী সম্পাদক
পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়

সহ সম্পাদক
প্রণব দত্ত

ওয়েব ডেভেলপ
শুভ্রনীল

ব্যবস্থাপনা
মহম্মদ শাহজাহান
দীপিকা শাসমল

রিসার্চ
রাহুল শাসমল

পৃষ্ঠাসজ্জা ও পরিকল্পনা
অভয় দে

অলংকরণ
বিনীতা পণ্ডিত

বিপণন
তপন পাল

বর্ণ সংস্থাপন
বাপ্পাদিত্য নায়েক

প্রচ্ছদ
অ্যাডস

বিশেষ সংবাদদাতা
মহম্মদ ইরফান
২\১, ওয়ারী , ঢাকা-৩
ফোন- +৮৮০ ১৬৭৮-৭০৫০৪৩

লন্ডন প্রতিনিধি
এ কে এস মাসুদ
১১২ শেরউড গার্ডেন , লন্ডন,ই১৪৯, ডব্লিউ ডব্লিউ
ফোন ৪৪৭৭২৩৩১৭৮১৩

আশিস পণ্ডিত কর্তৃক সি ই ১৭ সল্ট লেক কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও কলকাতা গ্রাফিক প্রা লি , ৩বি মানিকতলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট থেকে মুদ্রিত
RNI No. WBBEN/২০০৯/৩৫২৯৯

সম্পাদকীয় দপ্তর
সি ই ১৭, সল্ট লেক, কলকাতা -৭০০০৬৪

ই-মেল banglastreet@gmail.com
Banglastreet2@gmail.com
Website : banglastreet.online

১০০ টাকা

আবারও এসে গেল উৎসবের দিন। আলোর মুহূর্ত ।
কবির কথায় , এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা ! রঙ্গ নয়, বলা যায় বোধহয় উৎসবের মেজাজ। আনন্দের মুহূর্ত । এত কষ্ট , এত বেদনা , তবু বাঙালি আশ্বিনের শারদ সকাল এসেছে কী আসেনি, সেই কবে থেকে দিন গুণতে বসে গেছে মা আসছেন কবে... আর কত দিন , কত দণ্ড, কত পল বাকি মাকে বরণ করে নেবার সেই আনন্দ মুহূর্তের !
আসলে এই মেজাজটাই বাঙালি। তার দেহে কোথায় কত আঘাতের চিহ্ন তাতে নয়, তার পরিচয় সব কিছু ছাড়িয়ে, ছাপিয়ে উঠে কোথায় কখন কোন সোনালি রঙের রোদের আভাস আকাশের বুকে পেজা তুলোর মতো ভেসে আসা মেঘের ওই উড়োজাহাজ থেকে টুক করে নেমে এসে রাঙিয়ে দিল তার ভারাক্রান্ত মনটাকে, এইটাতেই। এইটাই তার আসল কথা। বলা ভালো তার ইউ এস পি।
অতয়েব, মা আসছেন। সবাই ভালো থাকুন। সবার ভালো হোক। আর বাংলাস্ট্রিট সঙ্গে থাকুক সেই আনন্দ মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে। শুভ হোক পৃথিবীর । আনন্দম।

Nightingale
CLINIC IVF LAB

Dhaleswar, Road No 13, Near UBI, Blue Lotus Club Chowmuhani, Agartala - 799007
Email : nightingaleclinicivf@gmail.com , Web : www.nightingaleivf.com

Ultra Modern Clinic
Reputed Foreign Doctor
Imported Machinery
Affordable Cost

Only IVF Clinic in Agartala Now Open

Reg. Off. **KROMOSOM DIAGNOSTICS LLP,**
CE - 17 , Sec - 1, Salt Lake, Kolkata - 700064, Ph : **+91 33 2321 0004**

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

আখ্যান

দুর্গা
আদিত্য ঠাকুর ১১

ফিচার

ফেরা
পূর্ণেন্দুশেখর মিত্র ৩১

প্রবন্ধ

বাংলা থিয়েটারের পটপরিবর্তন প্রাথমিক পর্ব
দীপঙ্কর সেন ৪৮
ইতিহাসে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো
পার্থ মুখোপাধ্যায় ৬৫

বড়ো গল্প

শুধু তোমারই জন্য
প্রণব দত্ত ৩৯
ফোবিয়া
কিঞ্জল রায়চৌধুরী ৫৩

গল্প

সবই অভিনয় নয়
অর্পিতা ঘোষ পালিত ২৬
মায়াজাল
রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯
কায়ার ছায়া
সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬
পোস্টার
আদিত্য সেন ৭৪

NATIONAL INSTITUTE OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT (NIIEM)

WHO WE ARE

Launched in 2021, National Institute of Innovation and Entrepreneurship Management (NIIEM) has been working to develop the Innovation and Entrepreneurial capabilities of students. The focus of the Institute is to make the Gen Z future-ready with skills that makes human unique – Creative, Empathetic, Critical, Persuasive.

Call now! +91 33 2321 0004

Kolkata - CE 17, Sec - 1. Saltlake, Kolkata- 700064(W.B)

Pune - New Modi Colony, Rasta Peth, Pune, Maharashtra 411011

www.niiem.com

Email id - Info@niiem.com

থ্রিলার
অরিন্দম উধাও
চন্ডী মুখোপাধ্যায় ৭৮

অনুবাদ কবিতা
রুমি
জ্বলন্ত এই পৃথিবীতে এক মরুদ্যান
ভূমিকা ও ভাষান্তর শোভন ভট্টাচার্য ৪৫

অ্যাডভেঞ্চার
ফিরে পাওয়া জীবন
বাবলু সাহা ৫৮

ভ্রমণ
অস্ট্রেলিয়ার রয়াল ফ্লাইং ডক্টরস
রাজর্ষি পাল ১০০

কবিতা
অনিন্দ্য রায়, সঞ্চারী ভট্টাচার্য,অদিতি সেনগুপ্ত, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলিকা মজুমদার,মালবিকা মিত্র ৯৬

শতবর্ষে
শতাব্দীর নায়ক
অলোক দেবনাথ ১০৮

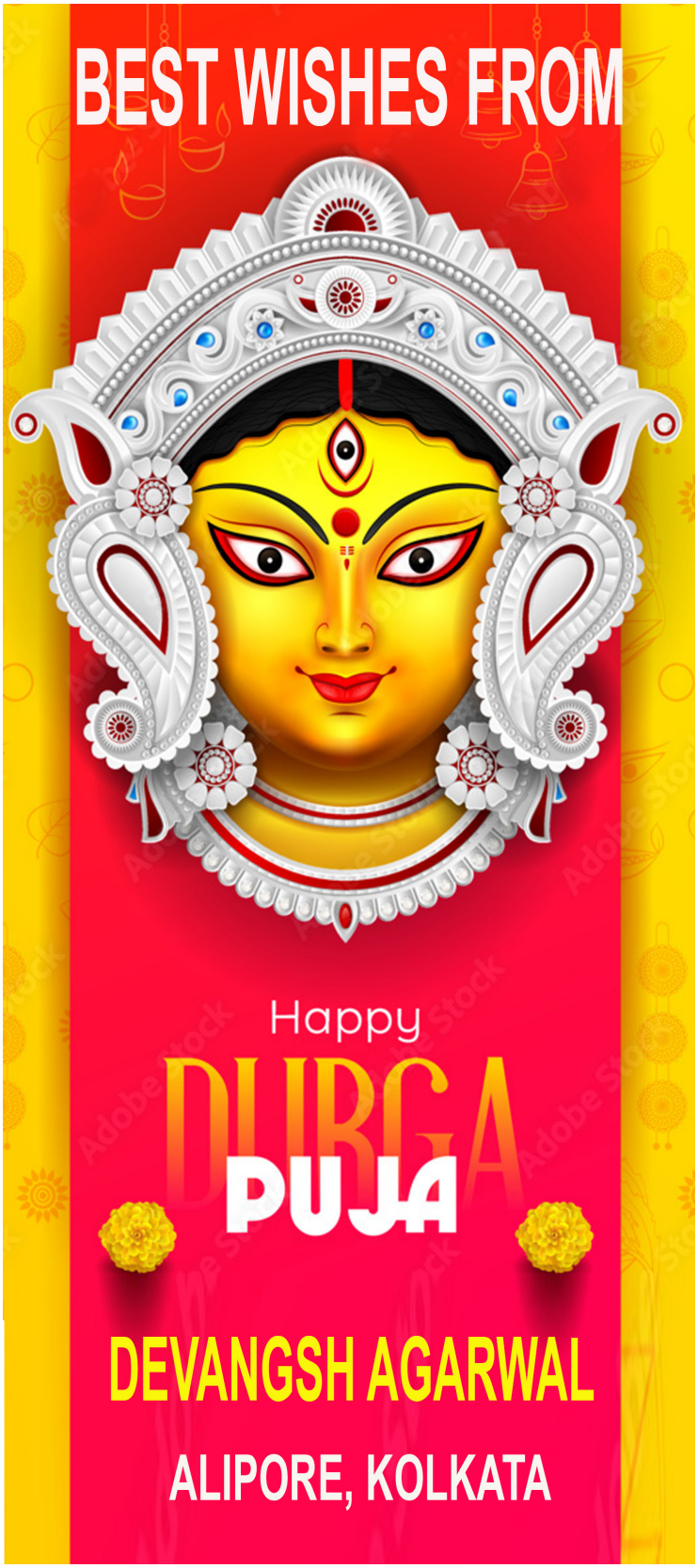

১০০ টাকা

Apollo Clinic
Expertise. Closer to you.

NOW IN AGARTALA

WITH ULTRA MODERN FACILITIES

Experience doctors available from all over the India

OUR SERVICES

Consultation | Health Check | X-Ray (Digital) | Ultrasonography | Echocardiography | Dental | TMT (Cardiac Stress Test) | Pulmonary Function Test | Holter Monitoring | ECG | Pathology (Biochemistry, Haematology,Serology, Clinical Pathology, Microbiology, Biopsy, Hormones,Immunology) | Eye Clinic

 # Dhaleswar Road No: 13, Near Blue Lotus Club Chowmohani, Agartala - 799007 | Phone : 0381-232 8088/8089
E mail : agartala@theapollo.com

With Best Compliment From

M/S. N.C.BANERJEE & SON

Engineer & Govt. Contractor, Class "A" in MES

We are Member of: INDIAN ROADS CONGRESS

INDIAN INSTITUTE OF BRIDGE ENGINEERS

&

BUILDER'S ASSOCIATION OF INDIA

Office at AE-552, Sector-I, Salt Lake City,
Kolkata-700064 (Near Bhagabati Devi Girls High School)

Powered By ARH DR. A. RAMACHANDRAN'S DIABETES HOSPITALS

Overseas Consultants

diahome DIABETES CARE COMES HOME

Namashkar Kolkata

MONTHLY OPD STARTED BY ARH

(Dr. A. Ramachandran Hospital, Chennai.)

- Diabetologist Consultation
- Lab Tests & Special Investigation
- Delivery of Medicines
- Dietitian Consultation
- Dedicated Physician Assistance
- ECG
- Doppler
- Biothesiometry
- Funduscopy

ECG

Doppler

Biothesiometry

Funduscopy

GET THESE TESTS AT YOUR DOOR STEP

Dial +91 9830601899 To book an appointment

CE-17, SECTOR-1, SALT LAKE, KOL-700064

দুর্গা

আদিত্য ঠাকুর

যা কিছু প্রিয় তা রক্ষার জন্য আমরা সদা তৎপর। এই পাঠ আমরা প্রকৃতির থেকে শিখেছি। অভিযোজিত হওয়া সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রাকৃতিক ভাবে সুরক্ষিত একটি নির্দিষ্ট সময় কালের জন্যে।

নিজেদের শরীরের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাব আমাদের শরীরের শ্রেষ্ঠ অংশ মস্তিষ্ক কীভাবে সুরক্ষিত হয়েছে। মস্তিষ্কের মূল অংশ ভাসমান তরলে। সেই অংশকে ঘিরে রেখেছে করোটি। করোটি চর্ম দ্বারা আবৃত। সেই ত্বক আবার রোম অর্থাৎ কেশ দ্বারা সুরক্ষিত। এভাবেই মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী তাদের

সুরক্ষার প্রয়োজনে বাসস্থান নির্মাণ করেছে। বুদ্ধিবৃত্তিতে মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী, তাই সে তার দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত কিছুই সুরক্ষার আবরণে আচ্ছাদিত করে রাখে, তা সে বাড়ি রঙ করা হতে পারে, হাতের ফোনটির সুদৃশ্য আবরণী হতে পারে, শক্ত মলাটে আবদ্ধ প্রিয় বইও হতে পারে। বইয়ে থাকে আমাদের মেধা দ্বারা উৎপন্ন সম্পদ। বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ তার মেধা দ্বারা সৃষ্ট সম্পদকে বিভিন্ন ভাবে রক্ষা করে চলেছে।

প্রাচীন কালে ভাষা জ্ঞানের পর থেকেই মানুষ সমকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে কাব্য রচনা করতে শুরু করে। তার নিদর্শন সারা বিশ্বে পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু লিপির উৎপত্তি ভাষা উৎপত্তির বহু পরে তাই রচিত কাব্য রক্ষা পেয়েছিল ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এইভাবে নিজের সৃষ্ট মেধা সম্পদ মানুষ রক্ষা করার চেষ্টা করত। কিন্তু এভাবেও নিজের সৃষ্ট রচনা বা কাব্য বা জ্ঞানবিজ্ঞানকে রক্ষা করা সম্ভব হত না।

প্রকৃতিকে মানুষ ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। ভীত হয় তার মারণ ক্ষমতা দেখে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যেমন ঋতু পরিবর্তন, সূর্য চন্দ্রের নিয়মিত আকাশে ভ্রমণ, তারার উদয় অস্ত ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ মানুষের মনে সম্ভ্রম তৈরি করল। মানুষ ভাবতে শুরু করল এই সমস্ত ঘটনার পিছনে কোনো সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁকে দেখা যায় না। সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রা তিনি। তিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁর তুষ্টিবিধান করলে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তিনি রক্ষাকর্তাও। মানুষের স্বভাব দু'টি ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধ ও সম্পর্ক রচনা করা, কার্যকারণ খুঁজে বার করা। সমগ্র বিশ্বে দেশকাল অনুসারে সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তার আবাহন ও পুজো শুরু হল। নিজ নিজ সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা পুজোর পদ্ধতি নির্দিষ্ট করতে লাগলেন। জলবায়ুর প্রকার ভেদে এই সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকলেও মূল বিষয়টি ছিল সৃষ্টিকর্তার বন্দনা এবং তাঁর কাছে সুখ সমৃদ্ধির প্রার্থনা। ফলে আচারবিচার, সমাজ রক্ষা সবই কালক্রমে একটা নিয়মের মধ্যে আনার চেষ্টা চলতে থাকল। সৃষ্টি হল ধর্ম। তৈরি হল ধর্মের অনুশাসন।

২

সমাজ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব না, তবে ধর্মের প্রভাবে মনুষ্য সমাজে বহু শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল তা সর্বজনবিদিত। পুরোহিত শ্রেণির মধ্যে থেকেও কিছু মানুষ অন্য ধারায় চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা প্রকৃতির শৃঙ্খলা, প্রতিসাম্য, সময়ের নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদির কারণ অনুসন্ধানে রত হলেন। সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন হল তা সময় মাপা এবং ঋতু বিভাগ করা।

তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন প্রতিদিন সূর্যকে সকাল বেলায় একই স্থান থেকে আকাশে ভেসে উঠতে (সূর্যোদয়) দেখা যায় না। গরমের সময় প্রতিদিন একটু একটু করে সূর্য বাঁদিকে সরতে থাকে (সূর্যের উত্তরায়ণ)। একটা সময়ে সূর্য একজায়গায় এসে যেন স্থির হয়ে থাকে ক'টা দিন (উত্তরায়ণের সমাপ্তি)। তারপর সূর্য ডানদিকে চলতে থাকে (সূর্যের দক্ষিণায়ন যাত্রা)। তাঁরা লক্ষ্য করলেন এই পথ পরিবর্তনের পরই বৃষ্টি আসে। তারপর গরম কমে আসে, মানুষ ফসল উৎপাদন করে। ক্রমশ ঠাণ্ডা বাড়তে থাকে। দিনের আলো থাকার সময় কমে যায়, রাতের অন্ধকারের সময় বৃদ্ধি পায়। এভাবে সূর্যের ডানদিকে চলা একজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। এরপর আবার বাঁয়ে চলা শুরু হয়। সূর্যের দিনের আলোর পরিমাণ বাড়তে থাকে, ঠাণ্ডার প্রকোপ কমে মনোরম পরিবেশ তৈরি হয়। যে সমস্ত গাছের পাতা ঝরে পড়েছিল সেইসব গাছে আবার নতুন করে পাতা এল। এই সামগ্রিক চলন তাঁরা খুব নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার কার্যকারণ অনুসন্ধানে নিজেদের ব্যাপৃত করলেন।

তাঁরা লক্ষ্য করলেন এই পর্যাবৃত্ত প্রাকৃতিক পরিবর্তন যা বছরের পর বছর ধরে ঘটমান, তার প্রধান কারণ হ'ল সূর্য।

এতদিনে তাঁরা জেনে গেছেন সূর্যের উদয় এবং অস্ত কী। তাঁরা লক্ষ্য করলেন সূর্যোদয়ের ঠিক আগে কোনো কোনো তারার (এই পর্যায়কালের বিভিন্ন সময়ে) উদয় হয় এবং সূর্যের তেজ বাড়ার পরেই সেই তারাগুলো আকাশে মিলিয়ে যায়। তাঁদের মনে হল সূর্য যেন তারাগুলোকে হত্যা করল। তাঁরা এক সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী অবস্থাকে একটি দিন বলে চিহ্নিত করলেন। আর এই বিশেষ অবস্থার নাম দিলেন সময়। এই দিন ও সময়ের অর্থ বুঝতে বহু হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে মানব জাতির।

তাঁরা দিনের বেলা সূর্যের উপস্থিতিতে স্থির বস্তুর ছায়ার দৈর্ঘ্য এবং দিক (direction) দেখে দিনের আলো স্থায়িত্ব বুঝতে শিখলেন। দিনের আলোয় সমস্ত কাজকর্ম হলেও রাতের আকাশ দেখেও অনেক কিছু তাঁরা শিখলেন। রাতের আকাশের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বস্তু হ'ল চাঁদ। তাঁরা দেখলেন চাঁদেরও গতি আছে এবং তা সূর্যের তুলনায় দ্রুত। আবার চাঁদের আকারেরও পরিবর্তন হয়। সম্পূর্ণ গোলাকার থেকে তা পরিবর্তিত হতে হতে একটা বাঁকা উজ্জ্বল কাস্তের আকৃতি পায়। তারপর চাঁদ আর দেখা যায় না আকাশে প্রায় দুদিন, তারপর আবার সেই বাঁকা চাঁদ দেখা দেয় আকাশে, যা একটু একটু করে বাড়তে থাকে এবং একসময় তা আবার উজ্জ্বল গোলাকৃতি লাভ করে।

চাঁদের এই পর্যায় লক্ষ্য করে তাঁরা দেখলেন প্রায় তিরিশ দিন পরপর এই পর্যায় ফিরে আসে। বলা বাহুল্য এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে মানুষ গুণতে শিখেছে এবং সারা পৃথিবীর মানুষই সেই যুগে এই প্রাকৃতিক জ্ঞান লাভ করেছিল। প্রায় সব দেশের মানুষই লক্ষ্য করেছিল আকাশে কিছু তারা স্থির এবং কিছু তারা গতিশীল। ভারতীয়রা গতিশীল তারাদের বললেন গ্রহ। আবার গ্রীক ভাষায় Planet

কথাটির অর্থ হ'ল চলমান তারা। প্রাচীন যুগে সূর্য এবং চাঁদকেও গ্রহ বলে গণ্য করা হয়েছিল।

আধুনিক কালে আমরা অনেক সময় সমালোচনা করে বলি চাঁদ সূর্যকে গ্রহ বলা একটা ভুল ধারণাকে পোষণ করা। একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমরা যে যুগের কথা বলছি তখন মানুষ ভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন গ্রহ তারাদের, যা আজকের সংজ্ঞার থেকে ছিল আলাদা।

এইভাবে সময়ের সরণী ধরে মানুষ চাঁদের দুটি পক্ষ, মাস (চান্দ্র এবং সৌর), বছর ইত্যাদি সংজ্ঞায়িত হল।

বছর সংজ্ঞায়িত হওয়ায় বিভিন্ন ঋতুর দৈর্ঘ্য এবং আগমন চিহ্নিত হল।

ঋতুর আগমন সময় চিহ্নিত করা প্রাচীন যুগে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় ও কার্য হিসাবে পরিগণিত হত। ঋতুর ধারণা মূলত করা হয়েছিল প্রকৃতির প্রতিকূলতার থেকে বাঁচার তাগিদে এবং কৃষিকাজের স্বার্থে। পৃথিবীর নানা দেশে ঋতুর দৈর্ঘ্যের মাপ ভিন্ন। ভারতে বৈদিক যুগের প্রাক্কালে বছরে তিনটি ঋতুর কথা পাওয়া গেলেও পরবর্তী কালে ছয় ঋতুর বিভাগ ঠিক করা হয়।

বৈদিক মাস ও ঋতুর নামগুলো এখন শুধুমাত্র বইতেই পাওয়া যায়, বাস্তব জীবনে তার আর বিশেষ তাৎপর্য নেই। আলোচনার স্বার্থে নামগুলো জানিয়ে রাখা হল। [ছবি দ্রষ্টব্য সায়ন বর্ষ এবং বৈদিক মাস]

সূর্যপথ বা ক্রান্তিবৃত্তকে (Ecliptic) ৩৬০° এবং বিষুব ক্রান্তিপাত বিন্দুকে বসন্ত ঋতুর মধ্যবিন্দু ধরলে

(১) ঋতু বসন্ত

মাস মধু ও মাধব।

ঋতু বিস্তৃতি ৩৩০° থেকে ৩০° অবধি।

(২) ঋতু গ্রীষ্ম

মাস শুক্র ও শুচি।

ঋতু বিস্তৃতি ৩০° থেকে ৯০° অবধি।

(৩) ঋতু বর্ষা

মাস নভঃ ও নভস্য।

ঋতু বিস্তৃতি ৯০° থেকে ১৫০° অবধি।

(৪) ঋতু শরৎ

মাস ইষ ও ঊর্জ

ঋতু বিস্তৃতি ১৫০° থেকে ২১০° অবধি।

(৫) ঋতু হেমন্ত

মাস সহঃ ও সহস্য

ঋতু বিস্তৃতি ২১০° থেকে ২৭০° অবধি।

(৬) ঋতু শিশির বা শীত

মাস তপঃ ও তপস্য।

ঋতু বিস্তৃতি ২৭০° থেকে ৩৩০° অবধি।

তপঃ, তপস্য, মধু, মাধব, শুক্র ও শুচি এই ছয় মাসকাল উত্তরায়ণ ধরা হত।

নভঃ, নভস্য, ইষঃ, ঊর্জ, সহঃ ও সহস্য এই ছয় মাসকাল ছিল দক্ষিণায়ন।

বর্তমান ভারতীয় মাসের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ইত্যাদি নামকরণ পরবর্তী সময়ে হয়েছিল।

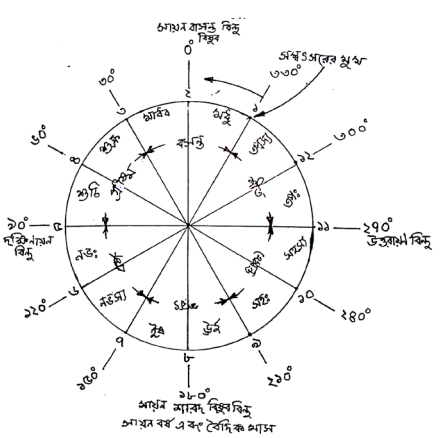

চিত্র ১ সায়ন বর্ষ ও বৈদিক মাসের রেখা চিত্র।

৩

সূর্য পথ অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের (Ecliptic) ওপর সূর্যের প্রধান চারটি অবস্থিতি (Cardinal Points) বিষুব ক্রান্তিপাত বা বাসন্ত বিষুব বিন্দু (Vernal Equinoxial point), দক্ষিণায়ন বিন্দু (Summer Solstice point), শারদ বিষুব বিন্দু
(Autumnal Equinoxial point), উত্তরায়ণ বিন্দু
(Winter Solstice point)।

এই অবস্থিতিগুলোর মধ্যে বৈদিক ঋষিদের কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল দক্ষিণায়ন দিন (Summer Solstice day) অর্থাৎ যে দিন সূর্য দক্ষিণায়ন বিন্দুতে সংক্রমণ করে তার পরবর্তী দিনটি নির্ণয় করা। সূর্যের দক্ষিণায়নের পরই বর্ষা ঋতুর আগমন হত এবং শুরু হত বর্ষায় কৃষিকাজ এবং পাওয়া যেত বেঁচে থাকার রসদ।

সূর্যোদয়ের ঠিক আগে তারার উদয় (Heliacal Rising) দ্বারা আকাশে সূর্যের অবস্থান ঠিক করা হত, এই অবস্থায় তারাটি সূর্যের পশ্চিমে থাকে। সূর্যাস্তের পরে যখন কোনো তারার অস্ত হয় (Heliacal Setting)– সেই সময় তারাটি সূর্যের পূর্বে অবস্থান করে। এছাড়াও সূর্যাস্তের পরে দিগ্‌বলয়ে তারার উদয় হতে পারে (Acronical Rising)– তারাদের এই তিনটি অবস্থানের প্রেক্ষিতে আকাশে সূর্যের অবস্থান নির্ণয় করা হত।

পর্যবেক্ষণের ফলে বৈদিক জ্যোতির্বিদ ঋষিরা বুঝতে পেরেছিলেন আকাশের তারার সাপেক্ষে সূর্যের অবস্থান (স্থানাঙ্ক) খুব ধীরে হলেও পরিবর্তনশীল। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ঋগ্বেদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তারার সাপেক্ষে দক্ষিণায়ন দিবস নির্ণীত হয়েছিল। একই কারণে বছর শুরুর সময়ও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ছিল। বছর শুরু হয় তখন, যখন সূর্য বিষুব ক্রান্তিপাত বিন্দু বা বাসন্ত বিষুব বিন্দুতে (Vernal Equinoxial point) অবস্থান করে। বাসন্ত বিষুব বিন্দু থেকে আবার একই বিন্দুতে ফিরে আসার ফলে যে সময় অতিক্রান্ত হয় সেই সময় কালকে বলা হয় সায়ন বছর (Tropical year)। প্রাচীন কালে কোনো এক সময়ে সায়ন বছরের সূচনা হত সূর্যের মৃগশিরা নক্ষত্রে অবস্থান কালে।

নক্ষত্র এবং তারকা বা তারার মধ্যে পার্থক্য আছে। একটি নক্ষত্র মানে একটি তারা নয়। একটি নক্ষত্র একাধিক তারার একটি সমাহার। কয়েকটি তারা নিয়ে একটি নক্ষত্রভাগ বা নক্ষত্র গঠিত। আকাশে ক্রান্তিবৃত্তের ১৩০২০' পরিমাণ ক্ষেত্রকে বলা হয় একটি নক্ষত্রভাগ বা সংক্ষেপে নক্ষত্র। সাধারণত নক্ষত্রভাগের উজ্জ্বলতম তারার নামে অথবা ক্রান্তিবৃত্তের (Ecliptic) নিকটতম তারার নামে নক্ষত্রভাগের বা নক্ষত্রের নামকরণ হয়। এই তারাটিকে বলা হয় যোগতারা। সূর্য পথ বা ক্রান্তিবৃত্তের ওপর একটি নক্ষত্রের ব্যাপ্তি ১৩°২°' বা ৮০°' (কৌণিক মিনিট)। একটি নক্ষত্রকে প্রয়োজনে চারটি ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রতি ভাগের কৌণিক মান ২০০' (কৌণিক মিনিট)।

৪

সূর্যের সর্বাধিক উত্তর ও সর্বাধিক দক্ষিণ অবস্থানের মধ্যবর্তী দুটি অবস্থান হয় যথাক্রমে উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন যাত্রা পথে। সূর্য যে যে দিনে এই দুই অবস্থানে থাকে সেই সেই দিবসে দিন ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয়। এই দুটি দিনকে ক্রান্তিপাত দিন বা বিষুব দিন (Equinoxial day) বলা হয়। উত্তরায়ণ পথের দিনটিকে বাসন্ত বিষুব (Vernal Equinoxial Day) এবং দক্ষিণায়ন পথের দিনটিকে শারদ বিষুব দিন (Autumnal Equinoxial Day) বলা হয়।

বাসন্ত বিষুব দিনের থেকে সায়ন বছরের শুরু ধরা হয়। স্থির তারার সাপেক্ষে আকাশের এই বিন্দুগুলি স্থির নয়, বরং চলমান। পৃথিবীর অক্ষ আকাশের একটি বিন্দুর চারদিকে ঘূর্ণায়মান। একবার এই পথ ঘুরে আসতে পৃথিবীর অক্ষের সময় লাগে প্রায় ২৫৮০০ বছর। ফলে আজ যেটি মেরু তারা, পাঁচ হাজার বছর আগে বা পরে সেটি মেরু তারা ছিল না বা থাকবে না। অর্থাৎ ধ্রুব তারা ধ্রুব নয়। একই ভাবে যে স্থির তারার সাপেক্ষে সূর্যের ক্রান্তিপাত হত বা হবে সেটিও পরিবর্তনশীল।

ঋগ্বেদের প্রারম্ভকালের শুরু হয়েছিল সূর্যের মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুব ক্রান্তিপাতের সময়ে, প্রায় ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। দক্ষিণায়ন হত উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রভাগে ও উত্তরায়ণ সংঘটিত হত পূর্বভাদ্রপদ (অজৈকপাদ) নক্ষত্রভাগে।

সাতাশ নক্ষত্রভাগ শুরু অশ্বিনী নক্ষত্রভাগ থেকে। ক্রমে ক্রমে পূর্ব দিকে আসবে ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা ইত্যাদি। নক্ষত্রভাগের শেষ নক্ষত্র রেবতী। (প্রবন্ধের শেষে নক্ষত্র সারণি দেওয়া হয়েছে) নক্ষত্রভাগের পঞ্চম নক্ষত্রভাগটি হ'ল মৃগশিরা, যার ঋগ্বেদীয় নাম যজ্ঞসোম। কালপুরুষ বা যজ্ঞপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর শীর্ষে ক্ষীণপ্রভ তিনটি তারা দেখা যায়। মৃগের ন্যায় ধাবিত কালের শিরে অবস্থিতি এই তারা তিনটির। তাই এদের নাম মৃগশিরা। হায়ণ বা বছরের অগ্রসূচক থাকায় সিদ্ধান্তজ্যোতিষে এই তারাত্রয়ের নামকরণ হয়
অগ্রহায়ণী। বালগঙ্গাধর তিলকের মতে প্রাচীন মৃগশিরা ছিল কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর নিম্নার্ধ বা কটিবন্ধ নিয়ে। অমরকোষে বলা হয়েছে
'মৃগশীর্ষে মৃগশিরস্তস্মিন্নেবাগ্রহায়ণি।

ইল্বলাস্তচ্ছিরোদেশে তারকা নিরসন্তি যাঃ।।'

অর্থাৎ মৃগশীর্ষ, মৃগশিরা বা অগ্রহায়ণী, মৃগশিরার পর্য্যায় মৃগশিরার শিরোদেশে যে তারাগুলি আছে, তাদের নাম ইল্বলা, নামান্তরে ইল্বকা বা ইল্বকা। মৃগশিরার যোগতারা Lambda / Orionis। কটিদেশের উত্তরতম তারাটি আকাশ বিষুব (Celestial Equator) স্পর্শ করায় কালপুরুষের উদয় পূর্ব বিন্দুতে ও অস্ত পশ্চিম বিন্দুতে হয়। কালপুরুষ এবং তার মাথার তিনটি তারা নিয়ে নিম্নের ঋক্-এ তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঋগবেদ ১/১১৪/৪

'ত্বেষং বয়ং রুদ্রং যজ্ঞসাধং বঙ্কুং কবিমবসে নি হ্বয়ামহে।
আরে অস্মদ্দৈব্যং হেলো অস্যতু সুমতিমিদ্বয়মস্যা বৃণীমহে।।'

অর্থ ত্বিষাম্পতি বঙ্কিমকাঠামোসংস্থিত রুদ্রনক্ষত্রের ক্রান্তদর্শী এই তারা যজ্ঞসাধনের কালপালনের নিমিত্ত আহ্বাত হয়েছে।

সূর্যসরণির বিক্ষেপসঞ্জাত বসুমতীপথের (সূর্যপথ অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষপথ) সম্পাতদ্বয়ের একতম সুদূরকালের জন্য এই দিব্যতারা কর্ত্তৃক বরণীয় হয়েছে।

প্রায় ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃগরূপী কালপুরুষ বা যজ্ঞপুরুষের শীর্ষস্থিত যজ্ঞসোম বা মৃগশিরা বিষুব ক্রান্তিপাতে ছিল এবং মৃগশিরা নক্ষত্র থেকেই যে সায়ন বৎসরের সূচনা হত, তা এই ঋক্ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে। সম্ভবত এই সময়ই ঋগ্বেদ সংহিতার আদিযুগ।

৫

ঋগ্বেদের কালে নক্ষত্রচক্রের ধারণা থাকলেও রাশিচক্রের ধারণা পরবর্তীকালে গৃহীত হয়েছে। সাতাশটি নক্ষত্রকে সমান বারোটি রাশিতে পরবর্তীকালে ভাগ করা হয়। ফলে প্রতি রাশিতে নক্ষত্রের মান ২.২৫। রাশি বিভাগ শুরু মেশ রাশি দ্বারা এবং শেষ হচ্ছে মীন রাশিতে।

বৈদিক ঋষিরা আকাশ নিরীক্ষণ করতেন নিষ্ঠা সহকারে এবং তাঁদের পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন ঋকের দ্বারা ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে রক্ষিত হত। সাধারণ মানুষের পক্ষে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জটিলতা বোঝা সম্ভব নয় বলে বিভিন্ন রূপক কাহিনির মাধ্যমে তাঁদের অর্জিত জ্ঞান রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রবন্ধে বেদ ও তার পরবর্তী কালের বৈদিক সাহিত্য ও রচনায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যবহার এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়াস থাকবে।

একটি সমাজ পরিচালনার জন্যে একটি বার্ষিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। বৈদিক যুগেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বছরের দৈর্ঘ্য নির্ণয় এবং ঋতুবিভাগ অত্যন্ত নিপুণভাবে সম্পন্ন করা হত সে যুগে। বছরের অত্যাবশ্যক চারটি দিন, দুটি বিষুব দিবস এবং দুটি অয়নান্ত দিন নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করা হত। ঋগ্বেদে বহুভাবে তা ব্যক্ত করা হয়েছে, যেমন,

ঋগ্বেদ ১/৩৫/৫ এ বলা হয়েছে

'বি জনাঞ্ছ্যাবাঃ শিতিপাদো অখ্যন্ রথং হিরণ্য প্রউগং বহন্ত।'

অর্থাৎ, সূর্যরশ্মি জনিত হিরণ্য সদৃশ উত্তরদিকের অখ্য (নাভি বা বন্ধন) ও শিশিরের (শীতঋতুর) নিম্নাখ্য, এই দুই অখ্যের মধ্যে সূর্যের সঞ্চরণ। এই দুই অখ্যের মাঝেই পৃথিবীর সবকিছুই অবস্থানরত।

হিরণ্যসদৃশ উত্তর দিক অর্থে উত্তরায়ণ পথের শেষ বিন্দু বা দক্ষিণায়ন বিন্দু, যখন সূর্যের উত্তর ক্রান্তি সর্বোচ্চ, হিরণ্যসদৃশ সূর্যকরোজ্জ্বল দিন।

আরো কয়েকটি ঋকের উল্লেখ করলে বিষয়টি বোঝা যাবে।

ঋগ্বেবদ ১/৩৫/৬

'তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থাহ একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট।
আণিং ন রথ্যম্ অমৃত অধি তস্থুরিহ ব্রবীতু য উ তচ্চিকেতৎ।।'

অর্থ তিনটি দিব্যস্থান, দুটি স্থান সবিতার সমীপবর্তী— একস্থান দূরে দক্ষিণভাগে। সবিতাদেব দূরগন্তাকে গতি সামর্থ্য দান করেন। আণি (চক্রের কেন্দ্রের নাম আণি) যেমন চক্রগতির কারক, (সূর্য) গতিরথের অমৃতকারকতার (অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নতার) অধিকারীও সবিতাদেব। যিনি তথ্যে চৈতন্যবান— তিনি এই তথ্য বিবৃত করেছেন।

ঋকে উক্ত সবিতাদেব সূর্য নিজেই। বহু নামে সূর্যকে উল্লেখ করা হয়েছে ঋকে— সবিতা, ত্বষ্টা, আদিত্য, অগ্নি, বিষ্ণু।

এই ঋকে সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এবং দুটি অয়নান্ত দিবসের বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর একটি ঋক্ ১/২২/১৮

'ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণু র্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্মাণি ধারয়ন্।।'

অর্থ অহিংস আলোর রক্ষক বিষ্ণু তিনটি পদক্ষেপে ভুবন পরিক্রমণ করেন। ইনিই সকল কর্মের ধারক।

ঋগ্বেদ ১/২২/২০, এই ঋকটি বহুল ব্যবহৃত, কিন্তু ক'জন এর সঠিক অর্থ অনুধাবনে সক্ষম!

'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।।'

অর্থ দ্যুলোকে বিস্তৃত চক্ষুস্বরূপ বিষ্ণুর পরম পদের কথা শুধু জ্ঞানীরাই জানেন।

এই দুটি ঋকে বিষ্ণু বা সূর্যের তিনটি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে, একটি উত্তরায়ণ বিন্দুতে, একটি বাসন্ত বিষুব বিন্দুতে ও তৃতীয়টি দক্ষিণায়ন বিন্দুতে। শেষের পদক্ষেপটি পরম পদ। এখান থেকেই বর্ষা ঋতু আরম্ভ।

ঋগ্বেদ ১/১৫৪/৫—

'উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎস।।'

অর্থ— উরুক্রমী (বৃহৎ পদক্ষেপ দিতে পারেন যিনি) বিষ্ণুই

আমাদের প্রকৃত বন্ধু। তাঁর পরমপদে আছে মধুর (জলের) উৎস। বিষ্ণু অর্থ ব্যাপনশীল। বিষ্ণু যেমন সূর্য, অগ্নিও সূর্য। বিষ্ণুর পরম পদের সন্ধান করতে হলে জানতে হবে দক্ষিণায়ন বিন্দুর অবস্থিতি। তারার প্রাতঃকালীন উদয়অস্ত দেখে, শঙ্কুর (সূচালো মাথা বিশিষ্ট দণ্ড বিশেষ, জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত) মধ্যাহ্নকালীন ছায়ার সঠিক পরিমাপ নিয়ে এবং রাতে পূর্ণচন্দ্রের নাক্ষত্রিক অবস্থিতির সাহায্যে জানা সম্ভব দক্ষিণায়ন বিন্দুর অবস্থিতি। সুতরাং জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পক্ষেই দক্ষিণায়ন বিন্দু বা বিষ্ণুর পরম পদের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। ঋকে এই কথাই বলা হয়েছে।

৬

বৈদিক যুগের জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ ঋষিরা অবগত ছিলেন আকাশে স্থিত বিষ্ণুর পরম পদের (Summer Solstice point) এবং পূর্বে উল্লেখিত অপর তিনটি অত্যাবশ্যক বিন্দুর (Cardinal Points) তথ্যের বিষয়ে।

সাধারণ মানুষ বিষয়টি না বুঝলেও তাঁদের জানানোর ব্যবস্থা করা হত বিভিন্ন সামাজিক ধর্মীয় উৎসবের দ্বারা। ধর্মীয় আচারের মাধ্যমে পালিত হত বিভিন্ন ঋতুর সূচনা এবং অন্যান্য সামাজিক উৎসব। দক্ষিণায়ন বা উত্তর অয়নান্ত দিবস (Summer Solstice Day) নির্ণয় ও পালন ছিল তেমনই একটি প্রয়োজনীয় বিষয়।

ভিন্ন ভিন্ন তারার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন কালে দক্ষিণায়ন সংঘটিত হয়েছিল এবং হচ্ছেও। সুদূর অতীতে সূর্যের সেই সমস্ত দক্ষিণায়ন সংক্রমণের কথা ঋকবেদে বিভিন্ন সূক্তের মাধ্যমে উল্লেখিত আছে। আকাশে প্রয়োজনীয় বিন্দুগুলির সরণের কারণ অয়নচলন (Precession of Equinox) বলে একটি মহাজাগতিক ঘটনা। পৃথিবীর অক্ষের (Polar Axis) পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে একটি ঘূর্ণন বা চলন হয়। এর ফলে ভৌগোলিক উত্তর বা দক্ষিণ মেরু আকাশের নির্দিষ্ট কোনো স্থির তারা বা দিশা নির্দেশ করে না, মেরুর দিশা সতত পরিবর্তনশীল। ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। বর্তমানে এই কৌণিক গতির হার বছরে ৫০.৩″ (কৌণিক সেকেন্ড) অর্থাৎ প্রায় প্রতি ৭২ বছরে আকাশের স্থির তারার সাপেক্ষে পৃথিবীর অক্ষের বিচলন হয় ১° (ডিগ্রি)। ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রারম্ভ কালে এই গতির মান ছিল প্রায় ৪৮.৯″ প্রতি বছরে বা আকাশে ১° অক্ষের সরণ বা অয়নচলনের জন্য সময় লাগত প্রায় ৭৩.৫ বছর। বিষয়টি সামান্য জটিল, আপাতত এইটুকু জানলেই হবে। অয়নচলন নামের মধ্যেই আছে আকাশের প্রয়োজনীয় দিনগুলোর সরণ। একটি নক্ষত্রের বিস্তার ১৩.২৫০। ঋগ্বেদের কালে ১০ সরে আসতে অয়নের সময় লাগত ৭৩.৫ বছর। সুতরাং এক নক্ষত্রের সমান কৌণিক দূরত্ব বা ১৩.২৫° সরে আসতে অয়নের সময় লাগত ১৩.২৫X৭৩.৫ বছর = ৯৭৪ বছর (প্রায়)।

সুতরাং কোনো একটি নক্ষত্রের প্রেক্ষাপটে কোনো একটি প্রাকৃতিক ঘটনাকে চিহ্নিত করলে সেই সময়ের নিরিখে সেই ঘটনার বিস্তৃতি হত ৯৭৪ বছর। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ কাল প্রায় ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ অবধি বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এই সুদীর্ঘ সময় কালে অয়নচলনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের প্রেক্ষাপটে দক্ষিণায়ন বিন্দু সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিন্দুগুলির স্থানিক পরিবর্তন হয়েছিল এবং এগুলিই বিভিন্ন ঋকে উল্লেখিত হয়েছে। এর ফলে বারবার দক্ষিণায়ন দিবস সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উৎসবের দিনগুলির পরিবর্তন হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে নতুনভাবে দক্ষিণায়ন দিবসের পরিবর্তন নতুন কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সূচিত হত, অনুষ্ঠানের নাম বদলে দক্ষিণায়ন দিবসই পালন করা হত। আমরা যদি নির্দিষ্ট কোনো তারার প্রেক্ষাপটে দক্ষিণায়ন হচ্ছে বা বছরের আরম্ভ হচ্ছে জানতে পারি, তবে সেই সময়কাল নির্ণয়ও করতে পারি।

৭

নক্ষত্রচক্রের ত্রয়োদশ ভাগে হস্তা নক্ষত্রের অবস্থান, সারণি ১ দ্রষ্টব্য। হস্তার ঋগ্বেদীয় নাম সবিতা। হস্তা নক্ষত্রভাগের পাঁচটি তারা হাতের পাঁচটি আঙুলের মতো সাজানো। সবিতা বা হস্তা নক্ষত্র কন্যারাশির প্রধান নক্ষত্র। কন্যারাশির সংস্কৃত নাম ভাগবী। লদী ভর্গোদেবের ধী মহিমা। তাই সবিতা বা লক্ষীর অপর নাম ভাগবী। এই পাঁচটি তারাকে পদ্ম বা কমল বলে কল্পনা করা হয়েছিল, তাই লক্ষীর একনাম কমলা।

এখানে লক্ষ্যণীয়, যে সমস্ত দেবদেবীর নাম পাওয়া যাচ্ছে, তাঁরা সবাই আকাশের বিভিন্ন নক্ষত্র। সেই সমস্ত নক্ষত্রে সূর্যের অবস্থান বা সূর্যের অভিক্ষেপই এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিচার্য। ভর্গ অর্থ তেজ। ভাগ্য ও চৈতন্যদায়িনী ভাগবী সবিতানক্ষত্র ধী, শ্রী, স্বাস্থ্য, শক্তিদানে জীবনের ঊষরতা দূর করেন। সূর্যের আলো ও উত্তাপই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর শক্তির এবং প্রাণধারণের উৎস। সূর্যের একনাম সবিতা, কোথাও সূর্যকে সবিতা অথবা সবিতাদেব বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের ১/৩৫/২ ঋক

‘আ কৃষ্ণেন রজোসা বর্তোমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।।’

অর্থ মর্তের জন্য দিব্যলোকের বৈভব আকর্ষণ করে অধিকন্তু মৃত্যু প্রবিষ্ট না করে চিরবর্তমান, রথাসীনা হিরন্ময়ী সবিতা ভুবনকে

অবলোকন করে যান।
এখানে স্পষ্ট দিব্যলোক অর্থাৎ আকাশে নক্ষত্রলোকের (রাশিচক্র) প্রেক্ষাপটে সূর্যের গমনের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে।
শুক্লযজুর্বেদোক্ত সবিতা সূক্তের গায়ত্রী মন্ত্রে বলা হয়েছে
'ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।'
অর্থাৎ, ভূলোক (পৃথিবী), ভুবর্লোক (অন্তরীক্ষ), স্বর্লোক (স্বর্গলোক, অর্থাৎ রাশিচক্র) সেই সবিতাময় যিনি ভর্গোদেবের ধীমহিমা— আমাদের চৈতন্যপ্রদায়িনী।
ঋগ্বেদ ১৩৬১৩ ঋকে বলা হয়েছে
'ঊর্দ্ধং ঊষুণ ঊতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা।
ঊর্দ্ধো বাজস্য সনিতা যৎ অঞ্জিভিঃ বাঘদ্ভিঃ বিহ্বয়ামহে।।'
অর্থাৎ, (হে অগ্নি বা সূর্য) আমাদের রক্ষার জন্য সবিতাদেবের মত ঊর্ধ্বে অবস্থান কর। (হে অগ্নি বা সূর্য) উন্নত হয়ে (আমাদের) অন্ন দান কর। (জীবনের) সদ্গতির জন্য যজ্ঞবহনকারী (আমরা) বিশেষরূপে (তোমাকে) আহ্বান করছি।
আকাশে অবস্থিত সূর্যকে অগ্নি বলে চিহ্নিত করা হয়। দক্ষিণায়ন সময়কালীন অগ্নিতুল্য সূর্যকে দক্ষিণায়নের পথে যাত্রা করে সবিতাদেবের কাছে আসতে আহ্বান করা হয়েছে। এই ঋকের অন্তর্নিহিত অর্থ, সূর্য যখন হস্তা নক্ষত্রভাগে অবস্থান করে তখন বর্ষাকালীন কৃষি কাজের সময়।
উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হওয়ার পরে সূর্য হস্তা নক্ষত্রভাগে প্রবেশ করে। ঋগ্বেদীয় কালে বাসন্ত বিষুব ক্রান্তিপাত মৃগশিরা নক্ষত্রে হওয়ায়, দক্ষিণায়ন বিন্দু পেরিয়ে এলেই হস্তা নক্ষত্রভাগের অবস্থান। ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল ভারতের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে। সেইখানে গ্রীষ্মের অবসানের পরই আসে বৃষ্টি। সবিতা তাই বাজসনিতা বা অন্নদাতা— জীবনের ক্রতু রক্ষয়িতা। ক্রতু শব্দের অর্থ যজ্ঞ, গতিমূলক। বৃষ্টি না হলে ফসল উৎপাদন হবে না, জীবনের গতি স্তব্ধ হবে। তাই প্রার্থনা সবিতার বা সূর্যের কাছে।

৮

বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য গায়ত্রী মন্ত্রে সূর্য ও সবিতার দু-রকম অর্থ করেছেন। তাঁর মতে সবিতা হলেন পরম ব্রহ্ম বা জগৎ স্রষ্টা। সু ধাতু থেকে সবিতৃ নিষ্পন্ন হয়েছে, এই কারণে সবিতার অর্থ এক্ষেত্রে প্রসবিতা বলে উল্লেখিত হয়েছে। নিরুক্তিকার যস্ক এর অর্থ করেছেন সর্ব্বস্য প্রসবিতা।
গায়ত্রী ধ্যানে আছে তিনি সূর্যমণ্ডলের মধ্যস্থানে অবস্থানকারিণী, বিষ্ণু বা শিবরূপা, হংসস্থিতা বা গরুড়াসনা বা বৃষবাহনা।
ঋগ্বেদ অনুসারে সূর্যকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সূর্য কখনো ব্রহ্মা, কখনও সূর্য ব্রহ্মা, আবার সূর্যই বিষ্ণু, কখনও আবার সূর্যই রুদ্র বা শিব।
আবার সূর্য গায়ত্রী এবং সবিতাও।
বিভিন্ন নক্ষত্রভাগে সূর্যের উপস্থিতি এবং ঋতুর কারকতা অনুযায়ী সূর্যের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। ভাবা হত নির্দিষ্ট নক্ষত্রভাগে উপস্থিতির কারণে সূর্যের কার্যকারিতা ভিন্ন ভিন্ন হয়।
নক্ষত্রের অধিপতি সর্বদাই একজন পুরুষবাচক দেবতা। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূর্য বিভিন্ন নামে নক্ষত্রগুলির অধিপতি। নক্ষত্রে অবস্থানের ভিত্তিতে কখনও সূর্যকে সরাসরি নক্ষত্রের নামে অভিহিত করা হত। ৩৩ দেবতার অন্তর্গত দ্বাদশ আদিত্য, ১২ মাসে সূর্যের ১২ রাশিতে অবস্থানকেই সূচিত করে।

৯

মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্য তিনটি প্রধান চরিতে বিভক্ত হয়েছে। প্রথম চরিত মধুকৈটভ বধ। দ্বিতীয় চরিত মহিষাসুর বধ এবং তৃতীয় চরিত শুম্ভনিশুম্ভ বধ।
প্রথম চরিতের মূর্তি মহাকালী, দ্বিতীয় চরিতের মূর্তি মহালদী ও তৃতীয় চরিতের মূর্তি মহাসরস্বতী।
একই মহাশক্তি তিন মূর্তিরূপে কল্পিত হয়ে থাকেন।
হস্তা নক্ষত্রকে কল্পনা করা হয়েছে মহালক্ষী হিসাবে। মহালক্ষী মহামায়া এবং চণ্ডী তথা দুর্গা, সব একই শক্তির বিভিন্ন নাম এবং রূপ।
হস্তা কন্যা রাশির মূল নক্ষত্র। সূর্য সিংহ রাশি পেরিয়ে কন্যা রাশিতে প্রবেশ করে।
সিংহ রাশির পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে তিনটি নক্ষত্র হ'ল যথাক্রমে মঘা, পূর্বফাল্গুনী ও উত্তরফাল্গুনী। উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের এক চতুর্থাংশ (৩০২০') সিংহ রাশিতে, বাকি তিন চতুর্থাংশ (১০০০০) কন্যা রাশিতে।
ঋগ্বেদের প্রারম্ভে মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুব ক্রান্তিপাত হত এবং দক্ষিণায়ন সংঘটিত হত উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে।
মনে হয় বছরের গুরুত্বপূর্ণ এই সময়টি নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন সেই যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। বর্ষা ঋতুর গুরুত্ব সবাই বোঝেন।
সাধারণ পরামর্শ বা নির্দেশে যে কাজে অনীহা দেখা যায়, সেই কাজই ধর্মীয় রূপে উপস্থাপিত হলে আপত্তির কারণ থাকে না। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যাঁদের আমরা ঋষি বলে জানি, তাঁরা ঋতু চিহ্নিতকরণ, বিশেষ করে বর্ষা ঋতুর সময় কাল নির্দেশ করতেন বিশেষ কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

বেদ এবং তার পরবর্তী সময়ে প্রকৃতির শক্তিকে বিভিন্ন ভাবে কল্পনা করা হত। মহামায়া, বিষ্ণুমায়া, যোগমায়া, মহাকালী, মহালক্ষী, মহাসরস্বতী, চণ্ডী ও দুর্গা সবই একক একটি শক্তির বিভিন্ন রূপ বা নাম। পুরুষবাচক দেবতার শক্তি অংশকে নারী রূপে কল্পনা করা হয়েছিল।

সমস্ত শক্তির উৎস সূর্য। সূর্য সারা বছর সাতাশ নক্ষত্রের মাঝে বিচরণ করে, সে কারণে সূর্যের তেজ ঋতুর ভিন্নতায় বিভিন্ন।

এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য বিভিন্ন নক্ষত্রে সূর্যের উপস্থিতিকে রূপক উপাখ্যানের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছিল।

১০

মহাভারতে ভীষ্মপর্বের ২৩ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যুদ্ধারম্ভের পূর্বে দুর্গাদেবীকে প্রণাম ও প্রার্থনা করার উপদেশ দিয়েছেন। অর্জুনকৃত দুর্গাস্তোত্রে দুর্গাকে সরস্বতী বলা হয়েছে।

মাতৃকারূপে বহু যুগ ধরে ভারতে শক্তিপুজো প্রচলিত। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ থেকে অসংখ্য মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকেই মাতৃকা চিহ্ন ও মূর্তি পাওয়া গেছে। সিংহ এবং বাঘ সহ প্রাচীন দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নানা প্রান্তে। সুতরাং শক্তি এবং দেবীপুজো সর্বত্র প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

বেদের প্রারম্ভ কালে ও তৎপরবর্তী পৌরাণিক যুগে দেবী ও শক্তি পুজোর প্রভাব পড়েছিল বৈদিক সমাজে এই ধারণা করার সঙ্গত কারণ থাকতে পারে।

ঋগ্বেদে বিশ্বদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা ও অগ্নিদুর্গার উল্লেখ আছে। ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভেদ¯ এই শাক্তসিদ্ধান্তটি সামবেদীয় কেনোপনিষদের উপাখ্যান থেকে জানা যায়।

চণ্ডী ও গায়ত্রীর অভিন্নতা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। গায়ত্রী প্রাতে ঋগ্বেদধারিণী কুমারী, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদধারিণী যুবতী এবং সায়াহ্নে সামবেদধারিণী বৃদ্ধা। কুমারীর ন্যায় মহাকালী ব্রহ্মরূপা ব্রাহ্মী, যুবতীর ন্যায় মহালদী বিষ্ণুরূপা বৈষ্ণবী এবং বৃদ্ধার ন্যায় মহাসরস্বতী শিবরূপা মাহেশ্বরী। চণ্ডী পরমাত্মময়ী, বেদমাতাই চণ্ডীরূপে প্রকটিতা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ তম থেকে ৯৩ তম— এই ১৩টি অধ্যায়কেই দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডী বলে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মতে শরৎকালেই সুরথ ও সমাধি দেবীপুজো করেন। দেবীভাগবতের মতে শরৎকালেই দুর্গাপুজোর উৎপত্তি।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল ব্রহ্ম ও তৎশক্তি এক, কিন্তু বিভিন্ন নামে ও রূপে প্রচারিত।

শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, দেবী কোটীসূর্যপ্রতীকাশ ও চন্দ্রকোটীসুশীতল অর্থাৎ দেবী কোটি সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল।

চণ্ডীর মহাসরস্বতীর ধ্যানে বলা হয়েছে,

'ওহ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা চতুর্ভির্ভুজৈঃ শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।'

'আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরণৎকাঞ্চীক্কণন্নূপুরা
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা।।'

এই স্তোত্রের অর্থ করা হয়েছে—

সিংহারূঢ়া, শশিশেখরা, মরকতমণির তুল্য প্রভাময়ী, চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র ও ধনুর্বাণধারিণী, ত্রিনয়ন দ্বারা শোভিতা, কেয়ূর, হার ও বলয় এবং মৃদুমধুর ধ্বনিযুক্তা চন্দ্রহার ও নূপুর পরিহিতা এবং রত্নোজ্জলকুণ্ডলভূষিতা দুর্গা আমাদের দুর্গতি নাশ করুন।

দেবী দুর্গার অসাধারণ এক কাব্যিক বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে এই স্তোত্রে। কিন্তু এখানে একটি বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। স্তোত্রের শুরুতে বলা হয়েছে দেবী সিংহস্থা । সিংহস্থা শব্দের অর্থ কীভাবে সিংহারূঢ়া হয়? সিংহস্থা শব্দের অর্থ করতে হবে সিংহে অবস্থিতা; যেভাবে গর্ভস্থ শব্দের অর্থ গর্ভে অবস্থানরত।

আমরা সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা শব্দকে বিশ্লেষণ করি। সিংহস্থা শব্দের প্রকৃত অর্থ সিংহরাশিতে অবস্থিতা। শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা শব্দের অর্থ শশি অর্থাৎ চাঁদ যার মাথায়, মরকত মণি তুল্য সেই ঝলমল করা সূর্য। অর্থাৎ সূর্যের মাথায় চাঁদ অবস্থান করছে এই দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এমন দৃশ্য দেখা যায় প্রতি কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথির ভোর রাতে, সূর্যোদয়ের কিছু আগে একফালি চাঁদের উদয় হয়, অর্থাৎ, Heliacal Rising of Moon। চন্দ্রোদয়ের কিছু পরেই সূর্যোদয় হয়। নরম স্নিগ্ধ কিরণ ছটায় উদ্ভাসিত সিংহরাশিস্থিত সূর্য, মাথায় চাঁদ নিয়ে উদিত হচ্ছে। অপরূপ এই দৃশ্যের কথাই বলা হয়েছে এই স্তোত্রে।

১১

নক্ষত্রচক্রের দশম নক্ষত্র মঘা থেকে শুরু হচ্ছে সিংহরাশি। এই রাশির দ্বিতীয় নক্ষত্র পূর্বফাল্গুনী ও নক্ষত্রচক্রের দ্বাদশ এবং সিংহরাশির তৃতীয় নক্ষত্র উত্তরফাল্গুনী। উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের মাত্র ৩°২০´ অংশ সিংহ রাশিতে, বাকী ১০° অংশ কন্যারাশির অংশ। উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের ৩°২০´ ক্রান্তিপথ অতিক্রম করতে সূর্যের সময় লাগে তিন দিনের সামান্য বেশি। সিংহরাশি অতিক্রম করে সূর্য কন্যারাশিতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ সৌর ভাদ্রমাসের শেষ তিন দিনের অবস্থানের পর সূর্য সৌর আশ্বিন মাসে সংক্রমণ করে। সৌর আশ্বিন মাসের প্রথম দশদিনে সূর্য উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র অতিক্রম করে ত্রয়োদশ নক্ষত্র হস্তা, অর্থাৎ বৈদিক সবিতানক্ষত্রের অংশে

প্রবেশ করে।
দক্ষিণায়ন বিন্দুতে বা দিবসে সূর্যের উত্তর ক্রান্তি হয় সর্বোচ্চ।
এই প্রবন্ধে অনেক বার দেব বা দেবতা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। দেব শব্দের অর্থ অনুধাবন না করলে বিষয় সম্পর্কে ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দেব শব্দের বৈদিক অর্থ কী?
দেব শব্দের ধাত্বর্থ প্রত্যক্ষ প্রকাশমান প্রাণের আধারজ্যোতিষ্ক। ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়ীভূত জ্যোতিষ্কলোকই বৈদিক দেবতা।
এই পরিসরে ঋষি শব্দের অর্থও জেনে নেওয়া যাক।
ঋষ্ ধাতু হতে ঋষি শব্দ নিষ্পন্ন। ঋষ্ ধাতু গত্যর্থক, গতির অর্থ গমন, জ্ঞান, প্রাপ্তি ও পূজা, এটি শ্রুতি, সত্য ও তপস্যাসূচক। এইসমস্ত গুণের আধার হচ্ছেন ঋষি। সুতরাং আকাশে অবস্থিত তারা, গ্রহ এরাও ঋষি। সৃষ্টির শুরুতে এই বিশ্বে যা কিছু গতিপ্রাপ্ত হয়েছিল তাই ঋষি। আদিতে যিনি সৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি ঋষি। তাঁর পশ্চাতে যাঁরা সৃষ্টি বা উৎপন্ন হলেন তাঁরা পরমর্ষি বা মহর্ষি। স্বয়ং গতি বা স্পন্দন থেকে যিনি উদ্ভুত তিনি স্বয়ম্ভু ঋষি। বায়ু পুরাণ মতে, পরিমাণ দ্বারা যে পুর অবগত হওয়া যায় না, সেই পুর হতে স্বয়ং উদ্ভুত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং ব্রহ্মার মানসপুত্র গ্রহগণও ঋষি নামে খ্যাত। যাহরা সর্বগুণের আধার স্বরূপ মহান্ত, তাঁরা মহর্ষি পদবাচ্য।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে এইখানে ঋষি বা মহর্ষি বলে যা সংজ্ঞায়িত হচ্ছে তা আকাশের বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক।
ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে যাহরা অহংকার ও অজ্ঞানতা পরিত্যাগ করেছেন তাঁরাও ঋষিত্ব প্রাপ্ত। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঋষি এবং তাঁদের ঔরসজাত মৈথুন দ্বারা উৎপন্ন পুত্রগণ ঋষিক নামে অভিহিত হন।
সুতরাং দেবতা এবং ঋষিগণের একটি অংশ আকাশে অবস্থিত সূর্য, গ্রহ, তারা। অপর ঋষিরা পৃথিবীর মানুষ।

চণ্ডী অনুসারে— দেবতারা তাঁদের দেহ নিঃসৃত তেজ, পুরাণপ্রসিদ্ধ ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে দিগন্তব্যাপী জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় অবস্থিত দেখলেন। এরপর দেবতাদের শরীর সঞ্জাত তেজোরাশি একত্র হয়ে নারীমূর্তি ধারণ করল।
পৌরাণিক ঋষি কাত্যায়নের আশ্রম ছিল সুউচ্চ হিমালয়ে। তাঁর আশ্রমে দেবীদুর্গা আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে আবির্ভূতা হন। শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে মহর্ষি কাত্যায়ন দেবীকে পুজো করেন। সেইজন্য দেবীর নাম কাত্যায়নী। দশমী তিথিতে দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন।
জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে বিষয়টি দেখা যাক।

১২

বৈদিক যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল তথ্যগুলোকে রাখা হত রহস্যময় পর্দার আড়ালে, সাধারণের মধ্যে তা প্রকাশ করা হত না। কারণ হয়তো প্রশাসনিক বলেই মনে হয়। প্রশাসনের মূল হাতিয়ার হয়তো ছিল আকাশের সূর্যগ্রহ নক্ষত্র বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী।
রূপক আচ্ছাদিত এই উপাখ্যানের অর্থ কী?
সুউচ্চ হিমালয় পর্বতের অবস্থান উত্তরে। অর্থাৎ হিমালয়ের অবস্থানিক অর্থ উত্তর দিক। সুউচ্চর অর্থ ক্রান্তিমার্গে সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান। এই দুটি শব্দের মিলিত অর্থ উত্তর দিকে ক্রান্তিমার্গে সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থানকেই সূচিত করছে। সূর্যের সর্বোচ্চ এই অবস্থান দক্ষিণায়ন বিন্দুকে নির্দিষ্ট করে।
দক্ষিণায়নের শুরুতে সূর্যের উত্তর ক্রান্তি সর্বোচ্চ এবং দিনমান সর্বাধিক হয়। সূর্যের বিপুল বিকিরণের শক্তি অনুভূত হয় পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে। আকাশে অবস্থিত সূর্যকে মনে করা হত সমস্ত শক্তির উৎস। সূর্যের প্রবল এই শক্তির স্ফুরণ ও সমন্বয়কেই বলা হয়েছে দেবতাদের শরীর সঞ্জাত তেজোরাশির একত্রিত হওয়া।
হিমালয়ে মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল। সুউচ্চ হিমালয়ে কাত্যায়নের আশ্রমের অর্থ রবিমার্গের সর্বোচ্চ উত্তরের বিন্দু অর্থাৎ, দক্ষিণায়ন বিন্দু। এখানে দুটি রাশি যথাক্রমে সিংহ ও কন্যা এবং এই দুই রাশির সাধারণ (Common) নক্ষত্র উত্তর ফাল্গুনী।
উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে সৌর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে দক্ষিণায়ন সংঘটিত হয়েছিল।
দক্ষিণায়ন বা উত্তরায়ণ বিন্দুতে পৌঁছানোর আগে এবং পরে মোট প্রায় ২০দিন সূর্যের ক্রান্তি পরিবর্তন খুব সামান্য হয়। ফলে মনে হয় সূর্য প্রায় থেমে আছে। এই সময় শঙ্কু নামের যন্ত্রের সাহায্যে মধ্যাহ্ন সূর্যের ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপা হয়। কর্কটক্রান্তি রেখার ওপর অবস্থিত শঙ্কুর ছায়ার দৈর্ঘ্য যে দিন ক্ষুদ্রতম হয়, সেই দিনটি দক্ষিণায়ন দিবস হিসাবে চিহ্নিত হয়। ঘটনাক্রমে এই দক্ষিণায়ন দিনটি ছিল সৌরভাদ্র মাসের অন্তীম প্রান্তে।
কৃষ্ণাচতুর্দশী থেকে অষ্টম দিনে সৌরআশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমী। আকাশের নক্ষত্র বিন্যাস অনুসারে সূর্য উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের অন্তিম ভাগে উপস্থিত হয়। উপাখ্যান অনুযায়ী শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে কাত্যায়ন দেবীপূজা করেন এবং দশমী তিথিতে দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন। কৃষ্ণাচতুর্দশী থেকে শুক্লাদশমী পর্যন্ত এগারো দিন বা বারো দিন হয়। আগেই বলা হয়েছে দক্ষিণায়ন বিন্দুতে পৌঁছানোর আগে এবং পরে মোট ২১ দিন সূর্যের ক্রান্তি পরিবর্তনের হার খুবই সামান্য থাকে। মধ্যের সাতদিন শঙ্কুর ছায়া প্রায় তার পায়ের কাছে নিশ্চল হয়ে থাকে। ক্রান্তিবৃত্ত বরাবর সূর্যের

চলন মনে হয় যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। দক্ষিণায়ন বিন্দুর পরবর্তী ১১ দিন এই কৃষ্ণাচতুর্দশী থেকে শুক্লা নবমী/দশমী অবধি সময়।

দক্ষিণায়ন দিবসের পর থেকেই বর্ষা ঋতুর শুরু। সুতরাং আশ্বিন মাস সেই কালে বর্ষা ঋতুর শুরু হত। শুক্লা দশমীর পর সূর্য উত্ত রফাল্গুনী থেকে নক্ষত্র বিভাগের ত্রয়োদশ নক্ষত্র হস্তা বা সবিতাতে প্রবিষ্ট হয়, যার কথা আগে বলা হয়েছে।

দেবী দুর্গা সূর্য হলে মহিষাসুর কে?

জল জীবনের ধারা। ঋগ্বেদ রচনার স্থান উত্তর-পশ্চিম ভারতের তীব্র দহন থেকে মুক্তি দিত বর্ষার জলের ধারা। সেই প্রাণ স্বরূপ রুদ্ধ জলধারার মুক্তি হত বর্ষায়। বর্ষাঋতুর শুরুতেই সর্বদা বৃষ্টি শুরু হয় না। বৃষ্টি কখনো আগে বা কখনো পরে আসে। বর্ষার মেঘের ঘনঘোর রূপকেই মহিষাসুর রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তার ইঙ্গিত রয়েছে দেবীপুরাণে। দেবীপুরাণের বিংশতি অধ্যায়ে ২২ থেকে ৩১ শ্লোকে মহিষাসুরের বর্ণনা মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে— অনন্তর সে বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় কাল নীলপ্রভো, ভৈরবাকার মহিষ মূর্তি ধারণ করিল। মহিষাসুর বধের মাধ্যমে বর্ষার আগমন সূচিত হয়।

দেবীপুরাণের বিংশ, একবিংশ এবং দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দেবীর সঙ্গে ঘোর-মহাঘোরের যুদ্ধের বর্ণনা এবং সময়ের উল্লেখ আছে।

একবিংশ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলছেন— বর্ষাপ্রভাতে আশ্বিনমাসে অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে দেবী পূজা করিয়া যাহারা মহিষ ও ছাগ ছেদন করেন, তাঁহারা মহাবল সম্পন্ন হইয়া থাকেন। সর্বোপদ্রববিনাশক সেই বলি যাঁহারা দেবীকে উৎসর্গ করিয়াছেন, দেবী তাঁহাদের প্রতি এক দৈবকল্প সন্তুষ্ট থাকেন।

দেখা যাচ্ছে বর্ষাকালে আশ্বিন মাসের অষ্টমীর রাতের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এই ঘটনাক্রম সেই প্রাচীন কালের, যখন সৌর আশ্বিন মাস বর্ষা ঋতুর অন্তর্গত ছিল।

দেবীপুরাণের একবিংশ অধ্যায়ের পরবর্তী ১২ থেকে ১৪ শ্লোকে ব্রহ্মা পুনরায় ইন্দ্রকে বলছেন— পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র এবং অপর গ্রহগণ যাবৎ বর্তমান, তাবৎকাল পৃথিবীতে চণ্ডীকাপূজা হইবেই। শরৎকালে আশ্বিনমাসের গৌরাবান্বিত অষ্টমী এবং নবমী মহাষ্টমী ও মহানবমী নামে বিশেষতঃ খ্যাত হইবে। হে দেবরাজ এই উপাখ্যান স্বর্গ বা সুফলপ্রদ। এই ক্রিয়াযোগানুসারে পরাপর বিভাগ কীর্তিত হইল।

দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মার বক্তব্য অনুযায়ী প্রথমে আশ্বিন মাস বর্ষা ঋতুর অন্তর্গত ছিল এবং পরে শরৎ ঋতুর অন্তর্গত হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

বেদ এবং অন্যান্য পুরাণ বর্ণিত নানা উপাখ্যানের বৃহৎ অংশ রূপকে আবৃত। এই সমস্ত আখ্যান থেকে মূল কাহিনি বা বক্তব্য অথবা বার্তা থেকে কী প্রাপ্তি তা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। এর মধ্যে থেকে যে অল্প অংশ উদ্ধার করা যায় তা অত্যন্ত চমকপ্রদ। দেবী দুর্গার আখ্যান অবশ্যই তার মধ্যে অন্যতম।

সুদূর আকাশের বিভিন্ন তারা জ্যোতিষ্কই আমাদের কল্পিত দেবতা, এই সত্য প্রকাশ পেলে প্রশাসনিক সমস্যা হতে পারে অথবা সাধারণ মানুষকে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বোঝানো আরো জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে এই সমস্ত ভাবনা থেকেই হয়তো মর্তে দেবতা এবং ঋষির বাস্তব উপস্তিতির কথা ভাবা হয়েছিল এবং বিভিন্ন পার্থিব রক্তমাংসের দেবতা ও ঋষির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল।

পূজ্যপাদ যাঁরা এই সমস্ত পদে আসীন হতেন সেই যুগে তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং অবশ্যই শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানীও।

ফলে স্বর্গের ঋষি ও দেবদেবী মর্তে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।

সমস্ত শক্তির উৎস সূর্য তাই বিভিন্ন নামে এবং সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত হয়েছিল সূর্য। সূর্যের বিভিন্ন কার্যকরী প্রভাবের কারণে কখনো সূর্য নিজেই ব্রহ্ম, আবার সূর্য ব্রহ্মা বা বিষ্ণু বা রুদ্র, আবার স্থান বিশেষে ইন্দ্র।

সেই যুগের জ্ঞানী মানুষরা তাঁদের অজানা সত্যকে মায়া বা প্রকৃতি শক্তির প্রকাশ বলে ভাবতেন। আর তার থেকেই মহামায়া, বিষ্ণুমায়া, মহালদী, মহাকালী, মহাসরস্বতী, চণ্ডী বা দেবীদুর্গার মতো দেবীর উৎপত্তি বা আবির্ভাব বলে মনে হয়।

দুর্গা এবং মহিষাসুর বধ আখ্যানে প্রকৃতির একটি বার্ষিক পরিঘটনাকে বিবৃত করা হয়েছে।

বর্ষা ঋতুর সঠিক সময় হয়তো নিরূপণ করেছিলেন মহর্ষি কাত্যায়ন এবং দুর্গাকে জনমানসে স্থান দিয়েছিলেন তিনি। নিবিড় পর্যবেক্ষণ দ্বারা বর্ষা ঋতুর সময় নির্ণয় তাঁর দ্বারাই হয়েছিল বলে মনে হয়। সে যুগেও আবিষ্কারকে স্মরণীয় করে রাখা হত আবিষ্কারকের নাম দিয়ে। তাই দুর্গা হয়েছিলেন কাত্যায়নী।

উপাখ্যানের মূল অংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সহ সমস্ত দেবতা (কয়েকজন ব্যতিক্রমে এঁরা প্রত্যেকেই মূলত সূর্যের প্রতিরূপ, কিন্তু বিভিন্ন নামে ব্যক্ত) ছিলেন স্বর্গীয় অর্থাৎ আকাশের জ্যোতিষ্ক, যাঁদের তেজ পুঞ্জীভূত হয়ে মহাশক্তি দুর্গার উৎপত্তি। অতি প্রাচীন কালে মনে করা হত সমস্ত জ্যোতিষ্কেরই শক্তির উৎস সূর্য।

বর্ষার মেঘের ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন থেকে ঐন্দ্রজালিক মহিষাসুরের কাল্পনিক উৎপত্তি ও বিনাশ। বর্ষার জলে কৃষিকাজ করা

এবং তখন দেবীর কৃপা প্রার্থনা করা হয়েছে চণ্ডীর বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে। সূর্য এই সময়ে হস্তা নক্ষত্রভাগে অবস্থান করছে, যা বৈদিক নক্ষত্রভাগ অনুসারে সবিতা বা সবিতা দেবী এবং মহালদী। তাঁর কৃপাপ্রার্থী মর্তের মানুষ।

দেবরাজ ইন্দ্রকে ব্রহ্মা বলছেন এই মহাঘোর মহিষাসুর নিধনের কাহিনি, আগেই বলেছি দেবীপুরাণে এই আখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে। দেবীপুরাণের বর্ণনা থেকে জানা যায় যখন দেবীপুরাণ রচিত হয়েছিল তখন কৃত্তিকা নক্ষত্রভাগে বিষুব ক্রান্তিপাত সংঘটিত হত। এই পুরাণের ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র মর্ত্যের বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন সমাজের সর্বোচ্চ পদাধিকারী। তাঁরা নির্দেশ দিচ্ছেন ঋতুকালীন কর্তব্যের।

মহর্ষি কাত্যায়ন যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন বর্ষাঋতু সমাগমের, তা ছিল আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের। তাই কাহিনিতে বলি প্রদানের কথা প্রথমে বলা হয়েছে বর্ষাঋতুর আশ্বিন মাসে। আবার কয়েকটি শ্লোক পরেই মর্তের ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে বলছেন শরৎঋতুর আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী এবং নবমী তিথি যথাক্রমে মহাষ্টমী ও মহানবমী বলে খ্যাত হবে। দুই তিথি পালন এবং তৎসংক্রান্ত উৎসব পালনের নির্দেশও দিচ্ছেন তাঁর উবাচের মাধ্যমে। অয়নচলনের কারণে দক্ষিণায়ন বিন্দুর পশ্চিম দিকে সরণ হয়, ফলে বর্ষা ঋতু এগিয়ে আসে এবং আশ্বিন মাস শরৎ ঋতুর অন্তর্গত হয়। আকাশ পথে এই পার্থক্যের কৌণিক মান কমপক্ষে ২৩°২০′। সেই সময়ে অয়নচলনের মান ছিল ৭৩.৫ বছর প্রতি ডিগ্রী। সুতরাং বর্ষার আশ্বিন এবং শরতের আশ্বিনের মধ্যবর্তী সময়ের পার্থক্য ছিল কমপক্ষে ২৩০২০′ অ ৭৩.৫ বছর ১৭১৫ বছর।

মহর্ষি কাত্যায়ন যে সময়ে দুর্গার আগমনের কথা বলেছিলেন তখনো আকাশের রাশির ধারণা তৈরি হয়নি, ফলে সৌরমাসও গঠিত হয়নি সেই সময়। কিন্তু দেবীপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ যখন রচিত হয়েছিল তখন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে সৌরমাস ও রাশির ধারণার অন্তর্ভুক্তি হয়ে গেছে। ফলে পুরাণের শ্লোকে রাশি ও সৌরমাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

সুদূর কোন অতীতে মহর্ষি কাত্যায়ন নির্দেশিত সিংহরাশির উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন সংঘটিত হয়েছিল?

(যে সমস্ত পাঠক অঙ্ক পছন্দ করেন না, তাঁরা গণনার এই অংশটি এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র গণনার ফলাফলটি দেখতে পারেন। এর জন্য বিষয়বস্তুর বিশেষ পরিবর্তন হবে না)

আমরা আগে দেখেছি এক একটি নক্ষত্রভাগের বিস্তৃতি ১৩°২০′। দক্ষিণায়ন শুরু হচ্ছে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের শুরু বা পশ্চিম বিন্দুতে, অর্থাৎ পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র যেখানে শেষ হচ্ছে, তার পূর্ব বিন্দুতে। (চিত্র ২ দ্রষ্টব্য)

কম্পিউটারে (ky Map Pro Software এ পাওয়া যাচ্ছে ৩৮৩৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ২৪ জুলাই সূর্যের দক্ষিণায়ন সংঘটিত হয়েছিল (চিত্র ৩)।

আকাশে দক্ষিণায়ন বিন্দুর ৯০° পশ্চিমে বিষুব ক্রান্তিপাত বিন্দু অবস্থিত। হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে সেই সময় বিষুব ক্রান্তিপাত বিন্দুর অবস্থান ছিল মৃগশিরা নক্ষত্রে।

অশ্বিনী নক্ষত্রের পশ্চিম প্রান্তের বিন্দুতে ২৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিষুব

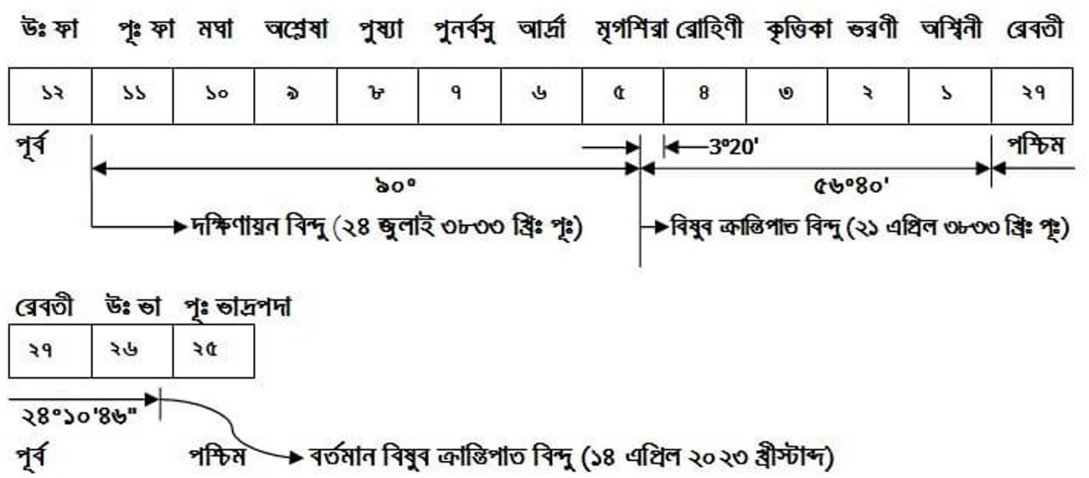

চিত্র ২ : ৩৮৩৩ খ্রিঃ পূর্বাব্দে আকাশে নক্ষত্রচক্রে দক্ষিণায়ন ও বিষুব ক্রান্তিপাত বিন্দুর অবস্থানের রেখাচিত্র।

ক্রান্তিপাত হত। এই বিন্দুটিকে ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানে নিরয়ণ মেষাদি বিন্দু বলা হয়ে থাকে, মেষরাশির শুরু হয় এই বিন্দু থেকে। বর্তমান ভারতীয় নিরয়ণ বছর শুরু হয় (নিরয়ণ পয়লা বৈশাখ) সূর্য যখন মেষরাশির আদি বিন্দুতে সংক্রমণ করে। এই দিনটি পয়লা বৈশাখ।

এখন ক্রান্তিবৃত্ত ধরে অশ্বিনী নক্ষত্রের পশ্চিম বিন্দু থেকে পূর্ব ফাল্গুনী ও উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রের সংযোগ বিন্দু অবধি মোট ১১ নক্ষত্র। ডিগ্রিতে এই মান ১১X১৩°২০′ = ১৪৬°৪০′। পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রের পূর্ব প্রান্ত থেকে ৯০< দূরে বিষুব ক্রান্তিপাত বিন্দুর অবস্থান। সুতরাং তৎকালীন বিষুব বিন্দু থেকে অশ্বিনী নক্ষত্রের দূরত্ব ছিল (১৪৬°৪০′, ৯০০) ৫৬°৪০′।

অয়নচলনের কারণে বর্তমান বিষুব ক্রান্তিপাত বিন্দু ক্রান্তিবৃত্ত ধরে আরও পশ্চিম দিকে সরে এসে বর্তমান নক্ষত্রভাগের ২৬ তম বিভাগ উত্তরভাদ্রপদা নক্ষত্রে অবস্থান করছে।

মেষাদি বিন্দু হতে বর্তমান সময়ে (নিরয়ণ ১ বৈশাখ ১৪৩০, ইংরেজি ১৪ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ) বিষুব ক্রান্তিপাত বিন্দুর কৌণিক দূরত্ব ২৪০১০′৪৬। এই দূরত্বকে অয়নাংশ বলা হয়।

অতএব, আগের বলা মৃগশিরা নক্ষত্রের বিষুব ক্রান্তিপাত বিন্দু হতে বর্তমান ক্রান্তিপাত বিন্দুর কৌণিক দূরত্ব (৫৬°৪০′, ২৪°১০′৪৬) বা ৮০°৫০′৪৬″।

অয়নচলনের কারণে বিষুব ক্রান্তিপাত বিন্দু এই ৮০°৫০′৪৬ কৌণিক দূরত্ব ক্রান্তিবৃত্তীয় পথ বরাবর অতিক্রম করতে যত বর্ষ সময় নিয়েছে, অতীত কালের তত বর্ষ আগে বিষুব ক্রান্তিপাত বিন্দু স্থিত ছিল মৃগশিরা নক্ষত্রের বিশেষ সেই বিন্দুতে, যা ছিল মহর্ষি কাত্যায়নের সময়।

অয়নচলনের গতি নির্দিষ্ট নয়, বর্তমান সময়ে অয়নচলনের হার প্রায় ৫০.২৭৯ কৌণিক সেকেন্ড/প্রতি সৌর বছরে, ২০০০ খ্রিস্টাব্দের মান, এই বার্ষিক হারও পরিবর্তনশীল, পরিবর্তনশীলতার হার ০.০০০২২২ প্রতি বছরের বর্গে।

কম্পিউটারে (ky Map Pro Software-এ পাওয়া যাচ্ছে ৩৮৩৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ২১ এপ্রিল ওপরে বর্ণিত মৃগশিরা নক্ষত্রের বিশেষ একটি বিন্দুতে বিষুব ক্রান্তিপাত সংঘটিত হত। ওকম্পিউটার থেকে পাওয়া ছবি (চিত্র ৪) দ্রষ্টব্য]

যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তখন ঋগ্বেদের প্রারম্ভ কাল। আকাশে নক্ষত্রের সীমা বা ভাগ হয়তো আজকের মতো ছিল না। নক্ষত্রের সীমা নির্ধারণে এক ডিগ্রি এদিকওদিক হলে প্রায় ৭৩ বছরের হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই হিসাবও স্থূল।

আকাশে পৃথিবীর গতি অত্যন্ত জটিল। সূর্য সমেত অন্যান্য ভারি গ্রহ এবং পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের প্রভাবে পৃথিবীর গতিপথ এবং কক্ষপথ সদা পরিবর্তনশীল, সঠিক ভাবে এই গতির মান নির্ণয় করে সময় নির্ধারণ করা এই প্রবন্ধে অসম্ভব। তবে এই মান সঠিক মানের কাছাকাছি।

চিত্র ৩ ২৪ জুলাই ৩৮৩৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে সূর্যের দক্ষিণায়ন বিন্দুতে (Summer Solstice Point) অবস্থান।

সূর্যের Right Ascension 6h 1m 44.60s & Declination + ২৪০৫′ ১৬.৪″. এখানে লক্ষণীয় পৃথিবীর অক্ষের নতি ২৪০ র সামান্য বেশি ছিল।

মাঝের সাদা তীর চিহ্ন দিয়ে সূর্যকে দেখানো হয়েছে। ছবির

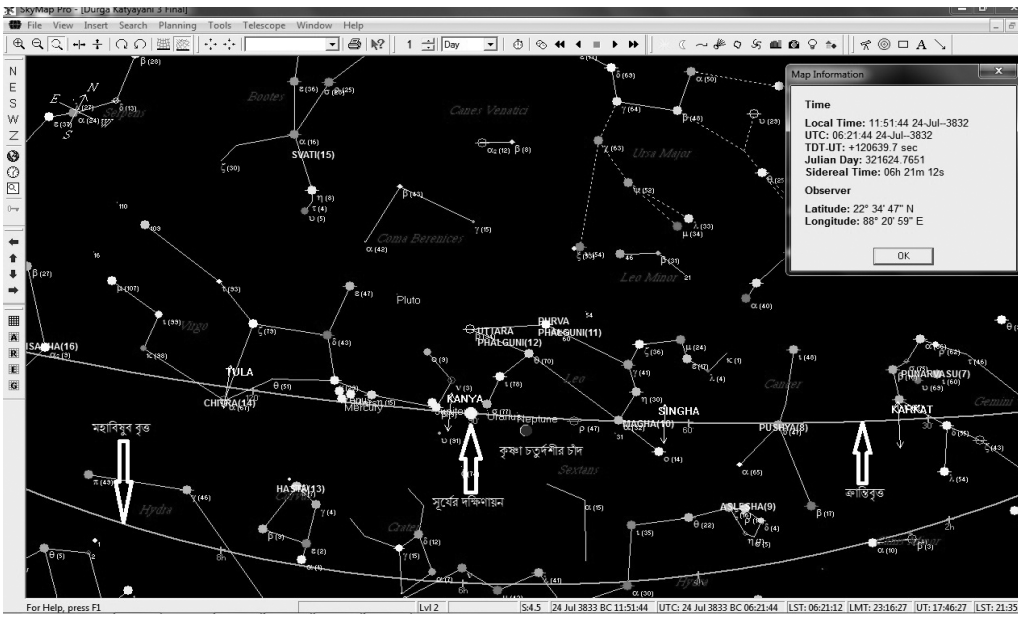

মাঝামাঝি বাঁকা সাদা রেখাটি ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic)। ছবির নীচের দিকের বাঁকা সাদা রেখাটি মহাবিষুব রেখা (Celestial Equator)। দক্ষিণায়ন বিন্দুটির কিছুটা ওপর দিকে দেখা যাচ্ছে উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র। উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রের পশ্চিমে (ছবির ডানদিকে) পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রকে দেখা যাচ্ছে। কম্পিউটারের ছবির নীচের স্ট্যাটাস লাইনে সময় দেখা যাচ্ছে ২৪ জুলাই ৩৮৩৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। ছবির সৌজন্য (ky Map Pro software

চিত্র ৪ ২১ এপ্রিল ৩৮৩৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সূর্য বিষুব ক্রান্তিপাত বিন্দুতে (Vernal Equinoxial Point) অবস্থিত ছিল, মাঝের সাদা তীর চিহ্ন দিয়ে ছবিতে দেখানো হয়েছে সূর্যকে। ছবির সাদা অংশে Map Information,এ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য জানানো হয়েছে। সূর্যের নীচে ছবির মাঝামাঝি অংশে কালপুরুষ নক্ষত্র মণ্ডলের মাথার অংশে মৃগশিরা নক্ষত্রকে দেখা যাচ্ছে।
ছবির সৌজন্য (ky Map Pro software

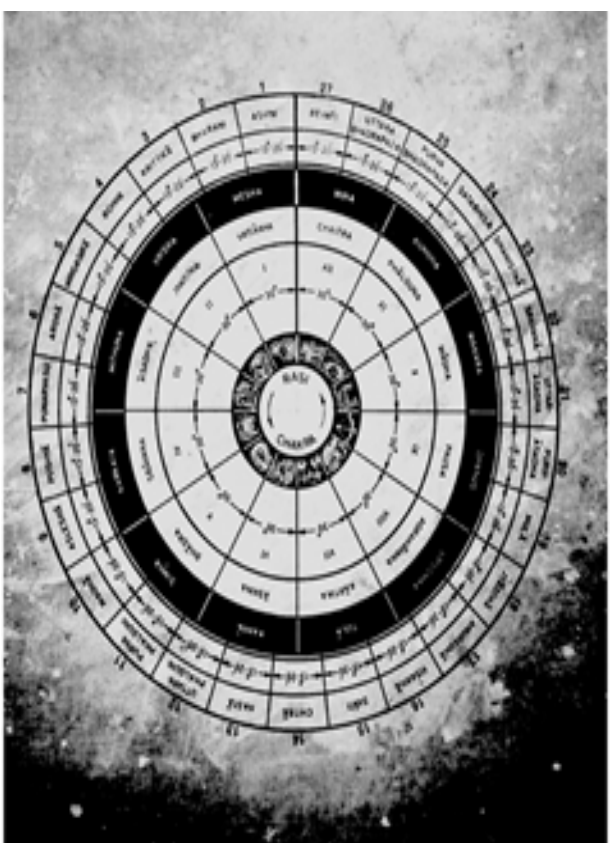

চিত্র ৫ ভারতীয় মাস, রাশি ও নক্ষত্র (ছবি সৌজন্য Indian Calendric System)

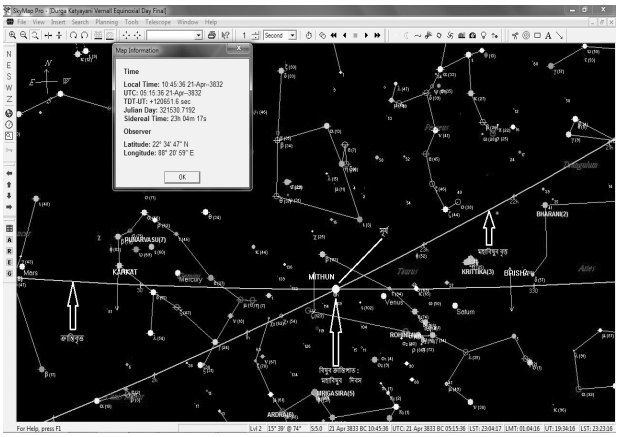

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে একটি সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে যার সাহায্যে বলা যায় প্রায় ৫৮৫৬ বছর আগে বা ৩৮৩৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (২৪ July ৩৮৩৩ B.C. at about ১১৫১৪৪ IST) নাগাদ সূর্যের দক্ষিণায়ন সংঘটিত হত সিংহরাশির উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে (চিত্র ৩)।

In computer it has been checked and found that– it was Krshna Chaturdashi Tithi on 23 July 3833 BC– when the Sun was in UttarìiFalguni Nakshtra of Simha Rashi– and 24 July 3833 BC was Amabasya Tithi and it was the Summer Solstice day– hence the day which was fixed by Maharshi Katyayan was probably the Krishna Chaturdashi Tithi on 23 July 3833 BC– the Pauranik time when Debi Durga (The Sun) was appeared in the Ashram of Rishi Katyayan Sat the HimalayaV. See the attached Fig. from Sky Map Pro Software.

সম্ভবত মহর্ষি কাত্যায়ন এবং সেই যুগে মর্ত্যের অন্যান্য ঋষি ও দেবতা সম্মিলিতভাবে এই কাল নির্ধারণের কাজটি করেছিলেন। সাধারণত মানুষকে বছরের নির্দিষ্ট ঋতু সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করার উদ্দেশ্যে এবং সুষ্ঠু ভাবে প্রশাসন পরিচালনা করার স্বার্থে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনাকে নানা সময়ে নানা পৌরাণিক উপাখ্যানের মাধ্যমে বিবৃত করা হত। বৈদিক যুগের প্রায় সমস্ত সামাজিক উৎসবের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অঙ্গাঙ্গী যোগ ছিল। ভারতবর্ষ এক মিশ্র সংস্কৃতির দেশ। বহু দেশের কৃষ্টি ও সামাজিক রীতি রেওয়াজ মিশে গিয়ে এই দেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সমৃদ্ধ হয়েছে।

সুদূর মিশর, আরব ভূখণ্ড, ইন্দোনেশিয়, দক্ষিণ আমেরিকার

বিভিন্ন দেশে এবং ভারতের হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় মাতৃকার পুজো বা আরাধনা হত।

কাত্যায়ন নির্ধারিত সময় কালে আশ্বিন মাসে বর্ষার সমাগম হত। সুতরাং আশ্বিন ও কার্তিক মাস বর্ষা ঋতুর অন্তর্গত ছিল।

পরবর্তীকালে ব্রহ্মা যখন ইন্দ্রকে দেবীপূজার নিদান দিচ্ছেন, তখন পশ্চিম দিশায় অয়নচলনের কারণে শরৎ ঋতুর সরে এসেছিল এবং আশ্বিন মাস শরৎ ঋতুর অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী এই সময়কালে বাসন্ত বিষুব বা বিষুব ক্রান্তিপাত হত কৃত্তিকায় এবং দক্ষিণায়ন হত মঘা নক্ষত্রে। এই সময়টি ছিল ঋগ্বেদের সংকলন কাল।

অর্থাৎ সুদীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরে আনুষ্ঠানিক ভাবে দেবীপূজার প্রচলন হয়েছিল শারদীয় আশ্বিন মাসে।

নাক্ষত্র মাস এবং রাশিচক্রের প্রচলন প্রারম্ভিক বৈদিক যুগে শুরু হয়নি। পরবর্তী সময়ে সৌরমাসের প্রচলন হয় সূর্যের রাশি সংক্রমণের মাধ্যমে। নাক্ষত্রিক চান্দ্রমাসের নামানুসারে সৌরমাসের নামকরণ করা হয়েছিল। দেবীপুরাণ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ বৈদিক যুগের প্রারম্ভকালে রচিত হয়নি , তা হয়েছিল পরবর্তী কোনো সময়ে।

বৈদিক কালের আবিষ্কৃত কোনো তথ্য বা সত্যই পরিত্যক্ত হত না, তা সযত্নে রক্ষিত রয়েছে পৌরাণিক কাহিনি ও বিভিন্ন শ্লোকে তবে অনেক ক্ষেত্রেই রূপক আখ্যানের মাধ্যমে।

আজ আমরা বিজ্ঞান বলতে যা বুঝি সুদূর অতীতে বিজ্ঞানের স্বরূপ নিশ্চিত ভাবেই এমন ছিল না। তাঁরা যেমন দেখেছেন ও অভিজ্ঞতা লব্ধ ফল যেমন ছিল তেমন ভাবেই ঘটনা বিবৃত করতেন সঙ্গে যুক্ত হত অতিকথন। বৈদিককালের বহু উপাখ্যানে মিথের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি অতি প্রাচীন প্রারম্ভিক কাল ছিল, যখন ভৌত এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ সূত্রগুলিকে মিথের বা অতিকথনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হত এবং দেশীয় পদ্ধতি অনুসারে তা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হত। সেই অতীতকালে বিজ্ঞান নিশ্চিত ভাবেই অঙ্কের ভাষায় বিবৃত হত না। প্রাকৃতিক ও ভৌত ঘটনা সমূহ বলা হত রূপক এবং মিথের মাধ্যমে। সেই প্রচেষ্টাই ছিল বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রাথমিক পদক্ষেপ।

গ্রন্থ ঋণ ও অন্যান্য সূত্র

(১) ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র—বেলাবাসিনী গুহ ও অহনা গুহ।

(২) Indian Calendric System – Commodore S.K.Chatterjee

(৩) দেবীপুরাণ

(৪) মার্কণ্ডেয় পুরাণ

(৫) শ্রীশ্রীচণ্ডী

(৬) দেব–দেবী ও ঋষি বংশাবলী–শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়

(৭) Sky Map Pro software

গ্রীক অক্ষর

গ্রীক অক্ষর		নাম			গ্রীক অক্ষর		নাম	
A	α	আলফা	Alpha		M	μ	মিউ	Mu
B	β	বিটা	Beta		N	ν	নিউ	Nu
Ψ	ψ	সাই	Sai		O	ο	ওমিক্রন	Omicron
Δ	δ	ডেলটা	Delta		Π	π	পাই	Pi
E	ε	এপসিলন	Epsilon		P	ρ	রো	Rho
Φ	φ	ফাই	Phi		Σ	σ	সিগমা	Sigma
Γ	γ	গামা	Gamma		T	τ	টাউ	Tau
H	η	ইটা	Eta		Θ	θ	থিটা	Theta
I	ι	আয়োটা	Iota		Ω	ω	ওমেগা	Omega
Ξ	ξ	জাই	Xi		X	χ	কাই	Chi
K	κ	কাপ্পা	Kappa		Y	υ	উপসিলন	Upsilon
Λ	λ	ল্যাম্বডা	Lambda		Z	ζ	জিটা	Zeta

অথর্ববেদ এবং যজুর্বেদ থেকে প্রাপ্ত নক্ষত্রের নাম এবং বর্তমান সময়ে নক্ষত্রের যোগতারাদের নাম সমেত খগোলীও স্থানাঙ্ক

ক া	নক্ষত্রের নাম	ঋগ্বেদীয় অধিপতি	প্রধান তারা	যোগতারাদের পাশ্চাত্য নাম	রাইট অ্যাসেনশন (আর.এ)	ডেক্লিনেশন (ডেক)
	অশ্বিনী	নাসত্য ও দস্র	β অ্যারিটিস	Sheratan and (Hamal α Arietis)	01h 54m 38s	+20° 48' 29"
	ভরণী	যম, বিবস্বান	৪১ অ্যারিটিস	-	02h 50m	+27° 15' 38"
	কৃত্তিকা	অগ্নি, দহন	η টাউরি	Alcyone	03h 47m 29s	+24° 06' 18"
	রোহিণী	প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিধাতা	α টাউরি	Aldebaran	04h 35m 55s	+16° 30' 33"
	মৃগশিরা	সোম	λ ওরাওনিস	Betelgeuse	05h 35m 08s	+9° 56' 03"
	আর্দ্রা	রুদ্র	α ওরাওনিস	-	05h 55m 10s	+7° 24' 25"
	পুনর্বসু	অদিতি	β জেমিনোরাম	Pollux and Castor	07h 45m 19s	+28° 1' 34"
	পুষ্যা	বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি	δ ক্যাংক্রি	-	08h 44m 41s	+18° 09' 15"
	অশ্লেষা	অহি	ε হাইড্রা	-	08h 46m 47s	+6° 25' 08"
	মঘা	পিতৃ	α লিওনিস	Regulus	10h 08m 22s	+11° 58' 02"
	পূর্ব ফাল্গুনী	ভগ	δ লিওনিস	Zosma	11h 14m 06s	+20° 31' 25"
	উত্তর ফাল্গুনী	অর্যমা	β লিওনিস	Denebola	11h 49m 03s	+14° 34' 19"
	হস্তা	সবিতা	δ কর্ভি	-	12h 29m 52s	-16° 30' 56"
	চিত্রা	ত্বষ্টা	α ভার্জিনিস	Spica	13h 25m 11s	-11° 09' 41"
	স্বাতী	বায়ু, মরুত্মান্	α বুটিস	Arcturus	14h 15m 40s	+19° 10' 57"
	বিশাখা	ইন্দ্রাগ্নী	α ২ লিব্রি	Zubenelgenubi	14h 50m 53s	-16° 02' 30"
	অনুরাধা	মিত্র	δ স্করপী	Dschubba	16h 00m 20s	-22° 37' 18"
	জ্যেষ্ঠা	ইন্দ্র	α স্করপী	Antares	16h 29m 24s	-26° 25' 55"
	মূলা	নির্ঋতি	λ স্করপী	Shaula	17h 33m 37s	-37° 06' 14"
	পূর্ব আষাঢ়া	আপঃ	δ স্যাজিটারী	-	18h 20m 60s	-29° 49' 41"
	উত্তর আষাঢ়া	বিশ্বদেব	σ স্যাজিটারী	Nunki	18h 55m 16s	-26° 17' 48"
	শ্রবণা	বিষ্ণু	α অ্যাকুইলী	Altair	19h 50m 47s	+08° 52' 06"
	ধনিষ্ঠা	বসুগণ, অষ্টবসু	β ডেলফিনি	-	20h 37m 33s	+14° 35' 43"
	শতভিষা	বরুণ	λ অ্যাকুয়ারী	-	22h 52m 37s	-07° 34' 47"
	পূর্ব ভাদ্রপদা	অজৈকপাদ	β পেগাসি	Markab	23h 03m 47s	+28° 04' 58"
	উত্তর ভাদ্রপদা	অহির্বুধ্ন	γ পেগাসি	Algenib	00h 13m 14s	+15° 11' 01"

সবই অভিনয় নয়

অর্পিতা ঘোষ পালিত

অমিত আর গুঞ্জা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। অথচ দুজনের বাড়িতে ওদের সম্পর্ককে কোনোদিন মেনে নেবে না বলেছে। তাই সবার অমত থাকা সত্বেও মাত্র দু'মাস হল নিজেরাই বিয়ে করেছে। বিয়েতে উপস্থিত ছিল অমিতের দুই বন্ধু। গুঞ্জার বাড়ি থেকে আপত্তি করেছিল, অমিত গ্রামের গরিবের ছেলে বলে। তাছাড়া অমিত ভালো কাজ করে না। ওরকম ছেলের সঙ্গে গুঞ্জার বিয়ে হলে ওদের স্ট্যাটাস ধুলোয় মিশে যাবে। অমিতের বাড়ি থেকে আপত্তি করেছিল, গুঞ্জা বড়লোকের একমাত্র মেয়ে বলে। ওরা ভেবেছিল, গরিব ঘরে এসে ওই মেয়ে মানিয়ে নিতে পারবে না।

অমিত শহরে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে সামান্য টাকার চাকরি করে, আর মেসে থাকে। দেখতে সুপুরুষ, স্মার্ট, আর ভদ্র,

তাতেই গুঞ্জা কাহিল হয়েছে। অমিত অনেক বুঝিয়েছে গুঞ্জাকে, ‘তুমি বিলাসিতায় মানুষ, গাড়ি ছাড়া রাস্তায় বের হওনা। আর আমার একটা বাইকও নেই, আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখী হতে পারবে না। গুঞ্জা অমিতের প্রেমে এতটাই বিভোর ছিল যে কোনো কথায় আমল দেয়নি।

গুঞ্জা— তুমি শিক্ষিত, চেষ্টা করলে ঠিক একটা ভালো জব পেয়ে যাবে। আমি ততদিন মানিয়ে নেব। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। তোমার স্ট্যাটাস দেখে আমি তোমায় ভালোবাসিনি।

বিয়ের পর কদিন এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করার পর ওরা দুজনে একটা ঘর ভাড়া নিল। সেদিন থেকেই গুঞ্জা উপলব্ধি করল অভাব কী! কোনো কিছু কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছিল না। ছোট্ট স্যাঁতসেঁতে ঘর, শক্ত বিছানা, ছোট্ট টয়লেট। একেবারে হাঁপিয়ে উঠল। দমবন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। সবসময় কথায় কথায় অমিতের সঙ্গে ঝগড়া হতে থাকল। অমিত কী করবে বুঝতে পারছে না। একটা ভালো মাইনের চাকরি খুঁজছে। অনেক জায়গায় ইন্টারভিউ দিচ্ছে। কিন্তু সেরকম কিছু পাচ্ছে না। সারাদিন কাজের জায়গায় অমিতের কোনোরকম ভাবে কেটে যায়। বাড়ি ফেরার সময় হলেই, ভয়ে কুঁকড়ে যায়। ঘরে গিয়ে কী জানি আবার কী হবে, এই ভেবে।

সেদিন অমিত অফিসে ঢোকার পর ওর বস আগরওয়াল স্যার ওকে ডেকে পাঠালেন। আগরওয়াল স্যার ভালো মানুষ, গুণীর সম্মান দিতে জানেন। অমিত কেবিনে যেতেই ওকে বললেন, তোমার কাজ দেখে খুব খুশি হয়েছি। সামনের মাস থেকে তোমার প্রমোশন, তার সঙ্গে তোমার মাইনেও অনেকটা বাড়বে। কিন্তু তোমাকে অন্য ব্রাঞ্চে ট্র্যান্সফার করা হচ্ছে। এখন থেকে সেখানেই তুমি কাজ করবে।

খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল অমিত, আগরওয়াল স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাল। ছুটি হতেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। ফেরার পথে গুঞ্জার জন্য হলুদ গোলাপের তোড়া কিনল, গুঞ্জা হলুদ গোলাপ ভালোবাসে। গোলাপ পেলে ও খুব খুশি হবে।

অমিত ঘরের সামনে গিয়ে দেখে দরজায় তালা ঝুলছে। ওর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি ছিল তা দিয়ে ঘর খুলল। ভাবল, গুঞ্জা হয়তো কাছাকাছি কোথাও গেছে, এখুনি এসে পড়বে। ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখে ঘর অগোছালো হয়ে আছে। হোটেল থেকে কিনে আনা খাবারের প্যাকেট, এঁটো প্লেট, কোল্ডড্রিংকসের খালি বোতল, চারিদিকে ছড়ানো-ছেটানো।

অমিত ভাবল হয়তো কেউ এসেছিল, গুঞ্জা তাকে রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেছে। কিন্তু ওর সঙ্গে তো অমিতের দেখা হল না। ওই রাস্তা দিয়ে এসেই তো ওদের ভাড়া বাড়ির গলি। গুঞ্জা যেখানেই যাক একটু পরে চলে আসবে, এই ভেবে অমিত ঘর পরিস্কার করল। তারপর ফ্রেশ হয়ে গুঞ্জার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। রাত হয়ে এল তবুও গুঞ্জা ফিরল না। ওর ফোন সুইচ অফ বলছে। অমিতের মনে কু ডাকছে— গুঞ্জার কোনো বিপদ হল না তো? কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরের বৌদিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল।

বৌদি বলল, দুপুরবেলা গাড়ি করে তিনজন এসেছিল, ঘন্টা খানেক পর দেখলাম গুঞ্জা হাসতে হাসতে, কথা বলতে বলতে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। তারপরে আর দেখিনি ওকে।

অমিত— গুঞ্জার সঙ্গে যারা ছিল তাদের দেখতে কেমন?

উত্তরে, বৌদির কথা শুনে গুঞ্জার মা-বাবার চেহারার মিল পেল অমিত। তারপর বৌদি বলল, তোমাকে কিছু বলেনি গুঞ্জা? এতো রাত হল এখনো ফিরল না, চিন্তা হওয়াটাতো স্বাভাবিক।

অমিত— আমার মোবাইলে চার্জ ছিল না, তাই হয়তো ফোনে পায়নি। আর আপনি যা বর্ণনা দিলেন তাতে বোঝা যাচ্ছে ওনারা গুঞ্জার মা বাবা। গুঞ্জা মনে হয় ওনাদের সঙ্গে বাড়ি গেছে।

সেদিনটা কোনোরকমে কাটাল অমিত, রাত হয়ে গেছে বলে আর গুঞ্জাদের বাড়ি গেল না। পরদিন অফিসে যেতেই হবে; তাড়াতাড়ি ফিরে গুঞ্জাদের বাড়ি যাবে। তাই তাড়াতাড়ি অফিসে গেল।

অফিস থেকে বেরিয়ে গুঞ্জার জন্য একটা বড়ো গোলাপের তোড়া কিনল অমিত, সঙ্গে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে বলে মিষ্টির প্যাকেট নিল। কলিংবেলে চাপ দিতে ওদের বাড়ির কাজের মাসি দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলবেন?

অমিত— গুঞ্জা আছে? ওকে ডেকে দিন না!

মাসি— দিদিমণির বন্ধুরা এসেছে, ওদের সঙ্গে গল্প করছে।

ভেতর থেকে গুঞ্জার বাবা এগিয়ে এলেন, মাসিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এসেছে রমা?

তারপর অমিতকে দেখে বললেন, ও তুমি, এতক্ষণে তোমার গুঞ্জার কথা মনে পড়ল? এই বুঝি তোমার ভালোবাসা? খুব তো একটা মেয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলে, মেয়েটা কোথায় গেল, কোনো খোঁজ পর্যন্ত নিলে না? এখন এখানে কী করতে

এসেছ? গুঞ্জা আর তোমার সঙ্গে যাবে না, ও এখানেই থাকবে।
অমিত— আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিলাম গুঞ্জা এ-বাড়িতে এসেছে। তাছাড়া গুঞ্জাকে অনেকবার ফোন করেছি, ওর ফোন সুইচ অফ বলছে। আর আপনি যে কথা বলছেন সেটা ওর মুখ থেকে শুনতে চাই।

গুঞ্জার বাবা গুঞ্জাকে ডাকলেন। এক বন্ধুকে নিয়ে হাসতে হাসতে নেমে এল ও, অমিতকে দেখে বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি এখানে কী করতে এসেছ, এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও। আর কোনোদিন এ বাড়িতে আসবে না। আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে ভুল করেছিলাম, আমার ভুল ভেঙেছে। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই, তুমি তোমার জগতে থাকো আর আমি আমার জগতে থাকি।

অমিত হতভম্ব হয়ে গেল! এই গুঞ্জাই একদিন জোর করে তার হাত ধরে শপথ নিয়েছিল ঘর বাঁধার, আর আজ সেই তাকে চিনতে পারছে না। মন শক্ত করল ও। ভাবল এবার ও এই শহর থেকে দূরে কাজের জগতে আরো বেশি করে ডুবে থাকবে, তাহলে কিছুটা হলেও গুঞ্জাকে ভুলে থাকতে পারবে।

টলমল পায়ে অমিত পেছন ফিরে দরজার দিকে এগোল। আরে, আমার গোলাপগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? ওগুলো যখন এনেই ফেলেছো তখন আমাকে দিয়ে যাও।

হোঁচট খেল অমিত, গুঞ্জার গলার স্বরের পরিবর্তন শুনে। আস্তে আস্তে পেছন ফিরল। দেখল দু-হাত প্রসারিত করে গুঞ্জা দাড়িয়ে, মুখে মিটিমিটি হাসি। ওর দুপাশে মা-বাবা, আর সব বন্ধুবান্ধবী।

গুঞ্জা– তুমি ভাবলে কী করে, এত সহজেই আমার হাত থেকে তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে? তুমি কি ভুলে গেছ, আমিই তোমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছি— কেননা আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি মানছি, তোমার সঙ্গে আমি অশান্তি করি। তাই বলে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা কমেনি, বরং দ্বিগুণ হয়েছে। আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না।

অমিত— তাহলে একটু আগে যা বললে তা সবই কি মিথ্যে?

গুঞ্জা— মিথ্যেই তো। গতকাল মা বাপি আমাদের বিয়ে মেনে নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিল। তখন আমি তোমার প্রমোশনের কথা মা বাপিকে বললাম। আজকের এসব ছিল আমাদের সবার প্ল্যান। তুমি প্রমোশন পেয়েছো বলে ছোটো করে একটা পার্টি দেওয়া হচ্ছে আজ রাতে।

অমিত—আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। আমি প্রমোশন পেয়েছি তুমি জানলে কী করে?

গতকাল অফিস যাওয়ার আগে যখন টয়লেটে ছিলে, তখন তোমাকে তোমার বস ফোন করেছিল। আমি ফোন রিসিভ করতে, আমাকে উনিই এ সুখবর দেন। উনি তক্ষুনি তোমাকে জানাতে চাইছিলেন। আমিই ওঁকে তখন বলতে বারণ করি। কেননা আমি ভাবলাম, ফোনের থেকে, অফিসে গিয়ে ওঁর মুখ থেকে তুমি একথা শুনলে বেশি আনন্দ পাবে।'

গুঞ্জার বাবা বললেন, একথা শোনার আগেই, আমরা তোমার সম্বন্ধে সব জেনে দেখলাম সত্যিই তুমি ভালো ছেলে। সেজন্যই তো তোমাদের দুজনকে বাড়িতে নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম। কিন্তু গুঞ্জার কথায়, তার আগে একটু মজা করলাম। এক্ষুনি সব অতিথিরা চলে আসবে, তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে তৈরি হও।'

তারপর গুঞ্জাকে বললেন, গুঞ্জা, অমিতকে তোর ঘরে নিয়ে যা। গুঞ্জার মা কাজের মাসিকে বললেন, রমা, অমিতের জন্য তুমি জুস আর কিছু টিফিন ওপরের ঘরে দিয়ে এসো। ছেলেটা সারাদিন কি খেয়েছে কে জানে।

গুঞ্জা অমিতের হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

মায়াজাল

রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

মল্লিকা ,আমি গয়নাগুলো এখানে রেখে গেলাম। তুমি সব দেখে শুনে নাও।

একটু থেমে মল্লিকার হাতে চাবির গোছাটা তুলে দিলেন সৌদামিনী।

শুধু গয়নাই বা কেন? আজ থেকে এই সবই তো তোমার।

মল্লিকা সৌদামিনীর হাতদুটো জড়িয়ে ধরল। কী বলবে ভেবে পেল না। কী বলার থাকে এই অবস্থায়। সে শুধু নীচু হল প্রণাম করবার জন্যে।

না, না মল্লিকা। এসবের দরকার নেই।

মল্লিকা পা ছোঁয়ার আগেই সৌদামিনী ধরে ফেললেন।

কিন্তু আমার যে এইটুকুই শুধু দরকার। স্মিত হাসি মল্লিকার মুখে।

জানি তো। তাই তো নিজেই দাঁড়িয়ে সব ব্যবস্থা করলাম। তোমার প্রয়োজন না থাকলেও এইটা তোমায় নিতেই হবে।

মল্লিকা আর কিছু বলতে পারল না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

তুমি রেডি হয়ে নাও। আমি একটু এবার ওদিকটা দেখি।
ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সৌদামিনী।
আস্তে আস্তে গয়নার বাক্সটা খুলল মল্লিকা।
উফফ! কতদিনের সাধনার ফল।
আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে হাসল।
নিখুঁত অভিনয়।
তপুর সঙ্গে মল্লিকার সেই কতদিনের প্রেম, কিন্তু তপুর বাবা কিছুতেই মানলেন না। তপুও একটা স্পাইনলেস। বাবার কথায় বিয়ে করে নিল। তারপর কীভাবে আস্তে আস্তে তপুর বৌকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে এই পরিবারের সবার চোখের মণি হয়ে উঠল তা মনে করে ওর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল।
আচ্ছা, তপুর বৌকে সরিয়েই কি শুধু এই দিন দেখা সম্ভব হত যদি না তপুর বাবাকে সিঁড়ি থেকে ঠেলে শয্যাশায়ী করে দিত? তারপর নিজেই ছোটাছুটি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। তপুর ব্যবসার পাশে দাঁড়ানো। সব, সবটা নিজেই করেছে। যাকে বলে সাপ হয়ে কাটা আবার ওঝা হয়ে ঝাড়া। সব এই দিনটার জন্য।
ওর চোখ দুটোর মতোই চকচক করছে চন্দ্রহারটা। না, আর অপেক্ষা নয়। ক্ষিপ্রগতিতে হারটা হাতে তুলে নিল মল্লিকা। কত দিনের শখ। গলায় দিয়ে আয়নার দিকে তাকাল।
সুন্দর। বড়ো সুন্দর লাগছে।
আঃ!
আহহ!
হারটা কেমন যেন চেপে বসছে।
হাঁসফাঁস করে উঠছে প্রাণটা। মল্লিকা টেনে খুলে ফেলতে গেল। নাঃ, এ যে আরো চেপে বসছে। দমবন্ধ হয়ে আসছে। চিৎকার করতে চাইছে, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না কেন? ভয়ে আতঙ্কে পিছন ফিরতেই ও দেখতে পেল গয়নার বাক্স থেকে একটা হাত বেরিয়ে ওর গলার দিকেই এগিয়ে আসছে। না, তারপর চোখের সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি ও।
.....

আপনার আর কী করার আছে কবরেজমশাই। সবই আমার ভাগ্যদোষ।
আজ তাহলে আসি বৌঠান।
দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন সৌদামিনী। গোলাপে কুঁড়ি এসেছে। সৌদামিনী একটু জল দিয়ে দিলেন ওতে। জয়ীর লাগানো গাছ। জয়ী তপুর বৌ। হতভাগী বড়ো ফুল ভালোবাসত। সংসার করতে ভালোবাসত। সৌদামিনীকে ভালোবাসত। তপুকে ভালোবাসত।
সেই তপু। সেই তপু মল্লিকার সঙ্গে ষড় করে দিনের পর দিন ভুল ওষুধ খাইয়ে খুন করল জয়ীকে। হ্যাঁ, কেউ কিছু বুঝল না বটে। সবাই জানল জয়ী অসুস্থ। সৌদামিনী যখন বুঝতে পারলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। জয়ী তাঁকে মা ডেকেছিল। তিনি কী করতেন? তাছাড়া শুধু তো জয়ী নয়। সৌদামিনীর সঙ্গেও চরম প্রতারণা করেছে ওরা। ঐ দেবতার মতো মানুষটাকে মল্লিকা...তাই ছুটে গিয়েছিলেন এক ভীষণ তান্ত্রিকের কাছে। কাজ হয়েছিল। কেউ কিচ্ছু বোঝেনি। সবাই জেনেছে মল্লিকার মৃত্যু হয়েছে আকস্মিক হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে। মা হয়ে নিজের সন্তানের ক্ষতি অবশ্য করতে পারেননি। এই মায়াজাল ছিন্ন করতে এখনো হয়তো পারেননি। তপু হয়তো শাস্তি পেল না, কিন্তু এই যে ভালোবাসাহীন মরুভূমির মতো একা একা তপুর বেঁচে থাকা, এই যে অপরাধবোধ, এই যে নির্ঘুম রাত। সব শাস্তি কী মানুষই দেয়? উপরে কি কেউ নেই ? আকাশের দিকে তাকালেন সৌদামিনী। সেখানে তখন অজস্র তারা ফুটে উঠছে একটা-একটা করে।

ফেরা

পূর্ণেন্দুশেখর মিত্র

ঘরের মধ্যে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন এক বৃদ্ধা। জীবনযুদ্ধে তীব্র ঝঞ্ঝা পেরিয়ে এসেছেন তিনি। এখন সুখের সময়। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় সমুদ্রতীরে এক ছোট্ট সুন্দর বাংলোয় বাস করেন। বাংলোর সামনে বাগান। শরীরের সঙ্গে এঁটে থাকা দারিদ্র্যের বর্ম খসে পড়েছে। খসে পড়ার আগে কেবল পুরানো মানসিক ব্যাধিটুকু রেখে গেছে। মানসিক বিপর্যয় তাঁকে এখনও সঙ্কটে ফেলে। বিপর্যস্ত করে। তাঁর পুত্রেরা সাবধানে রাখে তাঁকে। যত্নে রাখে। তাহলেও পুরানো ব্যাধির লক্ষণ দেখা দেয় মাঝে মধ্যে।

বৃদ্ধার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইতস্তত করছিল প্রায় তিরিশ বছরের এক যুবক। চৌকাঠে ক্ষণিক জড়তার রাশ, কয়েক লহমা, তা কাটিয়ে ধীর

পায়ে বৃদ্ধার সামনে গিয়ে দাঁড়াল যুবক। শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল,
চিনতে পারছেন আমাকে?
নিশ্চয়ই। পারছি। তুমি আমার ছেলে। এসো। বোসো আমার কাছে। আমার সঙ্গে এক কাপ চা খাও।

উনত্রিশ বছর বাদে নিজের কনিষ্ঠ পুত্রকে দেখলেন মহিলা। কাঁথায় মোড়া ছয় মাসের শিশু আজ যুবক। বিহ্বল হয়েছিলেন কি না সে খবর লেখেনি কেউ। মানসিক অবসাদে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন কি না তাও জানা নেই। দীর্ঘ তিন দশক পর শিশু পুত্র আজ এসেছে জননী সন্দর্শনে। এক ঘন আবেগময় নাটকীয় মিলন দৃশ্য রচনা করাই যেতে পারত। কিন্তু কোনো রসদ হাতে নেই, কেবল উপোরোক্ত সংলাপ ছাড়া।

এই সাদামাটা পুত্রটির মা হলেন হানা হ্যারিয়েট পেডিলংহাম হিল। হানার নাচগানের শখ ছিল।

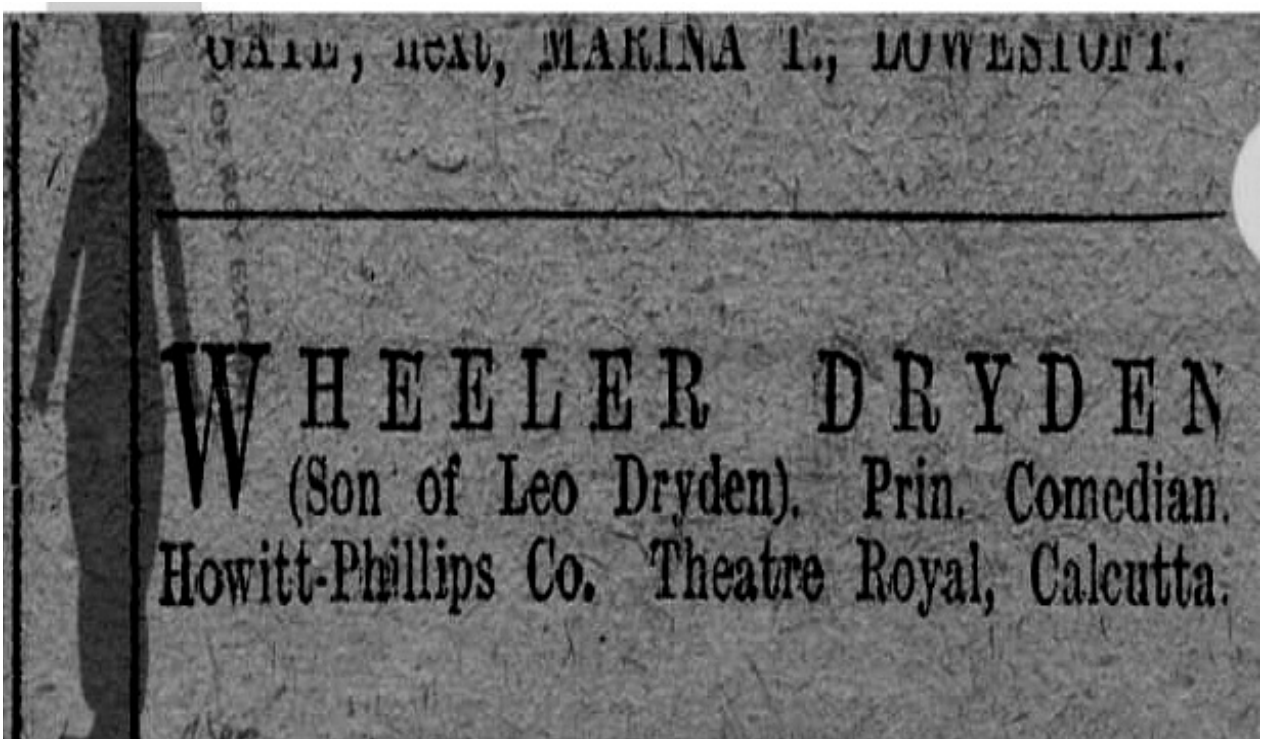

নাচগানের টানেই ষোলো বছর বয়েসে ঘর থেকে পালিয়ে যান। তারপর তাঁর দেখা পাওয়া গেল উনিশ বছর বয়েসে দক্ষিণ লন্ডনের ব্রিক্সটনের পানশালায়। পানশালায় তিনি নাচতেন ও গান গাইতেন। পোষাকি নাম ছেড়ে নতুন নাম নিয়েছেন লিলি হার্লে, এবং সুখ্যাতি পেয়েছেন স্থানীয় পানশালায়। তাঁর গান শুনে উল্লাসে পয়সা ছুঁড়ে দেয় শ্রোতারা। তখনই তিনি একটি পুত্র সন্তানের জননী। পুত্রের নাম সিডনি। তাঁর বাবার নামও সিডনি---সিডনি হক। যার পিতৃত্ব নিয়ে অবশ্য এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। আসলে লিলি হার্লে সিডনির বাবাকে প্রথাগত সামাজিক বিয়ে করেননি। তাঁকে তিনি ছেড়ে চলে আসেন আর-এক দয়িতের কাছে, সদ্যোজাত শিশুপুত্রসহ। তাঁকেই প্রথাগতভাবে সামাজিক বিয়ে করেছিলেন লিলি। একই পানশালার এক সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন তাঁর বর। বিয়ে হয়েছিল ১৮৮৫ সালে, সিডনি তখন তিন মাসের শিশু। লিলির বয়স কুড়ি। লিলি হার্লে বিয়ে করলেন গায়ক চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন সিনিয়রকে। বিয়ে করে লিলি হলেন হানা চ্যাপলিন আর সিডনি পেল সামাজিক মান্যতা, পরিচিত হল সিডনি চ্যাপলিন নামে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে বৃদ্ধা আর কেউ নন, সর্বকালের সেরা অভিনেতাদের একজন চার্লি চ্যাপলিনের মা। চ্যাপলিন তাঁর আত্মজীবনীতে মমতা, স্নেহে ও শ্রদ্ধায় মায়ের কথা লিখেছেন। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে সিডনি ও চার্লিকে নিয়ে মায়ের মরণপণ জীবনসংগ্রাম বর্ণনা করেছেন তিনি। মৃণাল সেন তাঁর একটি লেখায় চ্যাপলিন পরিবারের একটুকরো ছবি তুলে ধরেছেন--- 'লন্ডন শহরের কোনো বস্তিতে চার্লি চ্যাপলিনের জন্ম। মা ছিলেন একটি নাচিয়ে দলের নাচিয়ে, বাবা সেই দলের এক গাইয়ে। বাপ-মা দুজনেই নাচগান ক'রে, একদল ছেড়ে আর একদলে চাকরি ক'রে সংসার চালাতেন। সংসারটা পুরোদস্তুর আগোছালো হয়েই থাকত, বিশৃঙ্খলার সীমা ছিল না। স্বভাবতই চ্যাপলিনের ছেলেবেলাটাও কেটেছিল নিতান্তই অনাদরে আর অবহেলায়, ছেলেবেলার একটি মূল্যবান সময় ওঁর কেটেছিল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, আড্ডা মেরে আর বাউণ্ডুলেগিরি করে।'

হানা আর চার্লস চ্যাপলিনের বিয়ে অবশ্য বেশিদিন টেঁকেনি। অত্যন্ত মদ্যপানে আসক্ত বা অ্যালকোহলিক ছিলেন চ্যাপলিন সিনিয়র। আর হানা তখন পড়েছিলেন আর এক সুদর্শন গায়কের প্রেমে। প্রতিদিন অশান্তি লেগেই থাকত। চরম অবনিবনায় চ্যাপলিন সিনিয়র ১৮৯১ সালে হানাকে ছেড়ে চলে যান এবং সমস্ত আর্থিক সাহায্যও বন্ধ করে দেন। তখন চার্লি চ্যাপলিন মাত্র এক বছরের শিশু। নিজের ছেলের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না সিনিয়র চ্যাপলিনের। কিন্তু আইনত বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি তাঁদের। ১৯০১ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত হানা কাগজেকলমে ছিলেন চ্যাপলিন সিনিয়রের স্ত্রী।

হানার সেই নবীন প্রেমিক গায়কের নাম জর্জ ড্রাইডেন হুইলার। যিনি লিও ড্রাইডেন নামে ইংল্যান্ডে একসময় বিখ

ঢ্যাত গায়ক ছিলেন। তাঁর লেখা ও সুর করা গান 'দি মাইনারস ড্রিম অফ হোম' তখন ইংল্যান্ডে প্রবল জনপ্রিয়। এখনো অনেকে সেই গান করেন। লিওর রোজগার তখন ইর্ষা করার মতো। হানার সংসারের ভার অনেকটা মেটান লিও। হানার জীবনে তখন ক্ষণিক সুখ ও স্বাচ্ছ্যন্দের সময়। চার্লি চ্যাপলিন তাঁর আত্মজীবনীতে সেই সুখের দিনের ছবি একেঁছেন--- 'প্রতিরাত্রে মা থিয়েটারে যাওয়ার আগে সিডনি আর আমাকে উষ্ণ তুলতুলে আরামদায়ক বিছানার মধ্যে শুইয়ে দিয়ে এক আয়ার তত্বাবধানে রেখে দিয়ে যেতেন।' তিন কামরার সাজানো ফ্ল্যাট এবং আয়ার খরচ বহন করতেন লিও ড্রাইডেন। আয়া শুধু সিডনি ও চার্লিকে দেখা শোনা করত না, ততদিনে ১৯৯২ সালে হানা ও লিওর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তাঁরও দেখা শোনাও করত আয়া। যদিও সেই শিশু সৎভাইয়ের উল্লেখ চার্লি তাঁর আত্মজীবনীর কোথাও করেননি।

হানার শিরায় বইত জিপসীধারার রক্ত। এক তাঁবুর তলায় থাকা তাঁর ধাতে ছিল না। জীবনযাপনে ছিল শৃঙ্খলার অভাব। নাচগান হৈচৈ ছিল তাঁর পেশা। অসংযত জীবনধারণের ফলে ধীরে ধীরে যৌন ও মানসিক ব্যাধি তাঁকে গ্রাস করছিল। লিও মনে করলেন অসংযত হানা তাঁর ছেলের দেখাশোনা ঠিকমতো করতে পারবে না। তিনি ভরসা করতে পারলেন না হানাকে। শিশুটির ছয় মাস বয়েসেই, তাকে নিয়ে তিনি হানাকে ছেড়ে চলে গেলেন। লিওর আরো নামডাক হল। হানা ও তাঁর অন্য দুই পুত্রের সঙ্গে তাঁর আর কোনো সম্পর্ক রইল না। লিওর আর্থিক সাহায্যও বন্ধ হয়ে গেল। হানা নিমজ্জিত হলেন চরম আর্থিক দুর্দশায়। ইতিমধ্যে হানার গলার স্বর যায় ভেঙে। গান গাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল হানার। হানা তাঁর দুই পুত্রকে নিয়ে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিলেন। ডুবে যাচ্ছিলেন চরম দারিদ্র্যের ঘূর্ণাবর্তে। দু'বেলা অন্ন যোগানো হয়ে উঠেছিল কঠিন সংগ্রামের। হানার দুই কিশোর পুত্রর কাঁধে তখন সংসারের জোয়াল। তারাই সংসারের নৌকো ভাসিয়ে রেখেছিল কোনোরকমে। সেইসব দিনের কথা চার্লি চ্যাপলিন লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে।

কিন্তু আজকের গল্প চার্লিকে নিয়ে, নয় হানার তৃতীয় শিশু পুত্রকে নিয়ে যাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল তার বাবা। সেই শিশু পুত্রই আজ মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে।

এই সাক্ষাৎও এত মসৃণ ছিল না। তার পিছনেও অল্প হলেও গল্প আছে। লুকিয়ে আছে এক মনোরম কাহিনি। লিও ডাইড্রেন হানাকে ছেড়ে যাওয়ার পর বিয়ে করেছিলেন ১৮৯৭ সালে। আর কোনো সন্তান হয়নি তাঁর। জুনিয়র লিও ডাইড্রেনই তাঁর একমাত্র সন্তান। সন্তানও জানে পিতার বর্তমান স্ত্রীই তার গর্ভধারিণী মা। তাঁকে লিও ড্রাইডেন নিজের মতো করেই মানুষ করেছিলেন। লিও জুনিয়র নিজেই জানিয়েছেন তাঁর শিশুকাল কেটেছিল আদরে আমোদে ও দস্যিপনায়। তিনবার জলে ডোবার এবং একবার বিষ খেয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে জুনিয়র লিও।

যখন তাঁর বয়স উনিশকুড়ি তাঁর বাবা সিনিয়র ড্রাইডেন একটি নাচগানের অপেরার দল তৈরি করলেন ইংল্যান্ডে। সেই দল নিয়ে ১৯১২ সালে ভারতে গেলেন বিনোদন সফরে। কলকাতা শহরে খুলে ফেললেন 'দি গ্র্যান্ড অপেরা হাউস' নামে অপেরা কোম্পানি। সঙ্গে নিলেন পুত্রকে। পুত্রের পরিচয় হল লিও জর্জ নামে। অপেরা দলটি কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে ভারত সফর ও দক্ষিণ এশিয়া সফর করতে লাগল। চার্লস ডিকেন্সের নভেল থেকে নানা চরিত্রে ঐ অপেরায় অভিনয় করত লিও জর্জ। পরের দিকে কমিক রোলে খ্যাতি হলেও সেই সব দিনের অভিনয় ছিল বেশ 'সিরিয়াস'। বাবা লিও ডাইড্রেন ছিলেন উল্টো পথের পথিক, প্রথমদিকে কমিক

রোল করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করলেও শেষে একজন সিরিয়াস অভিনেতা হয়ে উঠেছিলেন। বাবা দু'বছর বাদে ১৯১৪-য় ইংল্যান্ড ফিরে গেলেন। পুত্র ফিরল না। আগ্রার তাজমহল, লখনৌ-এর রেসিডেন্সি না দেখে সে ফিরবে না এরকম ইচ্ছে তার। সুতরাং সে রয়ে গেল কলকাতায়। একজায়গায় সে জানাচ্ছে— কলকাতার নাট্যমোদীরা বেশ বুঝদার। আমাকে তারা গ্রহণ করেছে সমাদরে। সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে একটি বিয়ের আসরে লিও জর্জ যে উপস্থিত ছিল তার সাক্ষ্য দিয়েছেন একজন তাঁর লেখায়।

সুখেই দিন কাটছিল ছেলে লিও জর্জের। ইতি মধ্যে ১৯১৪-র অক্টোবরে হিউয়েট ফিলিপ্স কোম্পানি কলকাতায় এল। লিও জর্জ তাদের দলে মুখ্য কমেডিয়ান হিসেবে যোগদান করল। করেই 'লিও জর্জ' নাম ছেড়ে হুইলার ড্রাইডেন নাম নিল। যা তার পারিবারিক নাম। পরবর্তী গোটা জীবনে সে হুইলার ড্রাইডেন নামেই পরিচিত। হিউয়েটফিলিপ্স দলের সঙ্গে হুইলার ড্রাইডেন বার্মা, মালয় উপদ্বীপ, চীন, জাপান আর ফিলিপাইনের দ্বীপগুলিতে ঘুরে ঘুরে নাটক করে বেড়াতে লাগল।

জীবনের বড়ো চমকটি তখনো তার জন্য অপেক্ষা করছে। ১৯১৫ সালে বাবার এক চিঠিতে লুকিয়েছিল সেই চমক। বাবা লিখেছেন, যার মর্মার্থ হল— ইংল্যান্ডের একটি ছেলে আমেরিকার সিনেমাজগতে বেশ নাম করেছে। গোটা আমেরিকা তার কমিক অভিনয়ে মাতোয়ারা। ছেলেটির নাম চার্লি চ্যাপলিন। সে তোমার সৎভাই। হুইলার ড্রাইডেনের জীবনের স্বচ্ছন্দ গতি এই চিঠির এক অভিঘাতে চরম বাঁক নিল। তেইশ বছর বয়েসে সে প্রথম জানতে পারল সে তার বাবার বিবাহিত স্ত্রীর সন্তান নয়। তার পরিচয় আইন ও সমাজের চোখে লিও জর্জের 'অবৈধ' সন্তান রূপে। তখনো লিও ড্রাইডেনের বাবা বেঁচেছিলেন, সেই ঠাকুর্দা ও পিসিদের কাছে জানতে চাইলেন বাবা তাঁকে চিঠিতে যা লিখেছে তা কতদূর সত্য। তাঁরা সবাই তাকে জানালেন লিও ড্রাইডেন চিঠিতে যা লিখেছেন তা সত্য। তাঁরা জানেন লিও ড্রাইডেন ১৮৯২-৯৩ সালে হানা চ্যাপলিন নামের মহিলার সঙ্গে বসবাস করতেন। এবং তখনই জন্ম হুইলার ড্রাইডেনের।

একমুখী জীবন পাল্টে গেল হুইলারের। এক চরমসত্য জীবনের মুখ ঘুড়িয়ে দিল অন্য পানে। সে একের পর এক চিঠি লিখে পাঠাতে লাগল চার্লি চ্যাপলিনকে। অপেক্ষা করতে লাগল কলকাতা শহরে, একদিন হয়ত তাঁর চিঠির উত্তর আসবে চার্লির কাছ থেকে। ডাকের পথ চেয়ে দিন যায়। চিঠির উত্তর আসে না। নিরুপায় হয়ে এবার সে একাধিক চিঠি লিখল তাঁর আর এক বড়ভাই সিডনি চ্যাপলিনকে। একই ফলাফল। উত্তর এল না। যদিও সে এক বন্ধুর মুখে পরে শুনেছিল সিডনি তাঁর ছোটোবেলায় বিচ্ছিন্ন শিশুভাইয়ের খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করত মাঝে মাঝে। ঔৎসুক্য ছিল তাঁর, সেই ভাই কোথায় তা জানবার।

আমেরিকায় উঠতি অভিনেতা হিসেবে চার্লি চ্যাপলিন তখন রীতিমতো পরিচিত। কিস্টোন কোম্পানির সঙ্গে প্রথম চুক্তি করেন ও অভিনয় জীবন শুরু করেন। তাঁর প্রথম ছবি 'মেকিং এ লিভিং' মুক্তি পায় ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। পরে আরো কোম্পানি। ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সালের মাঝে ছোটো ছোটো দুই রিলের অনেক ছবি মুক্তি পায় যেমন— প্রথম ছবি 'মেকিং এ লিভিং', 'এ নাইট আউট', 'দি চ্যাম্পিয়ন', 'দি ট্রাম্প', 'পুলিস', 'দি ভ্যাগাবন্ড', 'দি পানশপ', 'দি ইমিগ্রান্ট' প্রভৃতি। সব ছবি হিট। দর্শকরা অপেক্ষা করত চার্লির ছবির জন্য। হেসে লুটোপুটি খেত সিনেমাহলে। সেই সব ছবির প্রায় প্রত্যেকটিতে মুখ্য মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেন এডনা পারভিয়েন্স। ব্যাক্তিগত জীবনেও এডনা ছিলেন চার্লির নিকট বন্ধু। চার্লি ও সিডনিকে চিঠি লিখে লিখে হতাশ হুইলার এবার নিরুপায় হয়ে এডনা পারভিয়েন্সকে তাঁর আবেদন জানিয়ে ভারত থেকেই ৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সালে লিখলেন তিনপাতার এক দীর্ঘ চিঠি। তিনি যেন চার্লিকে বুঝিয়ে বলেন তাঁর 'সহোদর' ছোটো ভাই তাঁর সঙ্গে একটি বার দেখা করতে চায়। প্রতিষ্ঠা নয়, অর্থ নয় কেবল চার্লি চ্যাপলিনের সৎভাই হিসেবে মর্যাদা পেতে চায়।

সেই দীর্ঘপত্র জুড়ে ছিল চার্লির সঙ্গে দেখা করার আকুতি। অনেক কথা লিখেছিল হুইলার ড্রাইডেন। বাবার চিঠি পাওয়ার পর কীভাবে সে আচমকা মানসিক দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। নিজেও যে একটু আধটু অভিনয় জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে তাও জানায়। কলকাতার নাট্যমোদীদের কাছে বেশ গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে সে কথাও লিখেছিল চিঠিতে। এমন কি নিজের চিঠির সঙ্গে নিজের ফটোগ্রাফ জুড়ে লেখে— 'দ্যাখো আমাদের ছবিতে কত পারিবারিক মিল। যদিও আমার নাকটা চার্লির থেকে লম্বা। আমার সঙ্গে মিল বেশি সিডনির কিন্তু আমি সিডনির মতো গাট্টাগোট্টা নই বরঞ্চ চার্লির মতো দুবলা।' অভিমান করে লিখেছে সে তার মায়ের 'অবৈধ' সন্তান বলে যদি চার্লির আপত্তি থাকে তাহলে সিডনিও তো তাই! তাকে তো সে সম্মান করে। সে অসময়ে তার পাশে দাঁড়াতে পারেনি বলে যদি চার্লির অভিমান থাকে, তাহলে তাকে বোলো ১৯১৫ তে বাবার চিঠি পাওয়ার আগে সে তো জানতই না সে চার্লির ভাই।

এডনা এই চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন কি না জানা নেই; কিন্তু চিঠিটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এডনা। চার্লির সেই প্রথম খ্যাতির জীবনে এডনা জানতেন, চার্লির মেজাজ সময়ে সময়ে রগচটা, ব্যবহার কিছুটা বুনো হয়ে উঠত। ১৯২৬ সালে 'পিকচার প্লে' পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় একবার লেখা হয়েছিল— সেই সময় চার্লি আর এডনার প্রায় প্রতিদিন 'গ্রাহাম কনফেকশনারি'- তে

দেখা হত। আজকের মতো মার্জিত তখন ছিল না চার্লি। বলতে গেলে কিছুটা রগচটা, আর যখন তখন মাথাগরম করত। আঙ্মা মার মনে আছে একদিন বিশাল জোরে বিকট চিৎকারে একজন মহিলা ওয়েট্রেসকে প্রায় মেরেই ফেলছিল— 'আমি সার্ভিস চাই। আমার সময়ের মূল্য আছে। হয় আমায় সার্ভিস দাও নয় আমি চললাম। আমি সারাদিন এখানে মুখ দেখাতে আসিনি!' এখন চার্লি একেবারে অন্য মানুষ।

তাই সুসময়ের অপেক্ষায় থাকতেন এডনা। একদিন অনুকুল আবহাওয়ায়, হাসিখুশির দিনে এডনা হুইলারের দীর্ঘ চিঠিটি পড়ে শোনান চার্লিকে। হুইলারের হয়ে চার্লির কাছে ওকালতি করেন। একজন কাছের মানুষের সামান্য আকাঙ্খাকে অবজ্ঞা করা ঠিক নয় বোঝান। চার্লি হুইলারের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হন।

এরপরে তো ইতিহাস। চার্লির সঙ্গে হুইলারের ১৯১৮ সালে আমেরিকায় দেখা হয়। হুইলার চার্লির সিনেমা কোম্পানির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে ওঠে। জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সবই করে সে। চার্লির নানা ছবিতে পরিচালনায় অংশ নেয় এবং অভিনয় করে। বিশেষ করে চার্লির বিখ্যাত ছবি 'গ্রেট ডিক্টেটর' ও 'মঁসিয়ে ভের্দু'র সহ পরিচালক ছিল হুইলার ড্রাইডেন। 'লাইমলাইট'-এ অভিনয় করে। চার্লির উপর আমেরিকায় ফিরে আসার উপর যখন প্রতিবন্ধকতা ঘোষণা করে আমেরিকার সরকার এবং চার্লি সুইজারল্যান্ডে বসবাস শুরু করেন। তখন তাঁর আমেরিকার সম্পত্তির দেখাশোনা ও বিলিবন্দোবস্ত করার ভার তিনি দিয়েছিলেন তাঁর এই ভাইকে। এমনকি চক্কজ্জ দপ্তরে গিয়ে, চার্লির অবর্তমানে, তাঁর মামলা নিষ্পত্তি করার ভারও চার্লি দিয়েছিলেন এই ভাইকে। ১৯৫৪ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিল হুইলার ড্রাইড্রেন।

কিন্তু সে তো পরের কথা, তার আগে ছিল অসুস্থ মা'কে ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা। তাঁর পুত্রেরা চেষ্টা করে সাধ্যমতো। কারণ আমেরিকা সরকার একজন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মহিলাকে ভিসা দিতে গড়িমসি করতে থাকে। অবশেষে ১৯২১ সালে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মাকে আমেরিকায় নিয়ে আসেন তাঁরা। দক্ষিণ কালিফোর্নিয়ার সান ফার্নিন্দো উপত্যকায় গ্লেন্ডেলে সমুদ্রের দিকে মুখকরা বাগান শুদ্ধ একটি বাংলোয়, এক পরিবার ও সর্বক্ষণ দেখাশোনার জন্য একজন নার্সের ব্যবস্থা করেন চার্লি।

সেই বাড়ি। তার একটি ঘরের দরজার চৌকাঠ পেরোতেই ইতস্তত করেছিল প্রায় তিরিশের যুবক হুইলার ড্রাইডেন। গর্ভধারিনী মানসিক বিকারগ্রস্ত মা কিন্তু তাকে একবার দেখেই চিনেছিলেন। মায়ের কাছে ফেরা সম্পূর্ণ হল ছেলের।

কায়ার ছায়া

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

‘আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা , এসো হে গোপনে আমার স্বপন লোকের দিশাহারা...’

হঠাৎ ঝম্‌ঝম্‌ করে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে মুহুর্মুহু বজ্রপাত। আর তেমনি বিদ্যুতের ঝলকানি । মনে হচ্ছে চরাচর যেন ফেটে চৌচির হয়ে পড়ছে। বাড়ি ফেরার পথে আচমকা এই ঝড়-তুফান আন্দাজ করতে পারিনি। আড্ডার মাশুল হয়তো আজ গুণতে হবে দিকশূণ্যপুরের মাঠে। শুরু হল ঝড়ের তাণ্ডব। মুষলধারে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। যাহ্‌! এর মধ্যে কারেন্টও চলে গেল! এখানে হাওয়া দিলেই বিদ্যুৎ চলে যায় আচমকা। অপ্রস্তুতে পড়ে যায় জনপদ, জনজীবন। এ ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা দফতরের। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মাটি আঁকড়ে শেকড় শুদ্ধু ভূপতিত হয়ে যাচ্ছে বনসৃজনে লাগানো গাছগুলো। কোনো রকমে ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করে সময় দেখে নিলাম।

কল্ লগ্ বলছে সাতটা মিসড্ কল্ উঠে আছে। মুহূর্তের মধ্যে সামনের তাল গাছটায় বাজ পড়তেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য। ঘনঘোর বৃষ্টি আর ঝড়ের দাপটে আগুনের লেলিহান শিখা আরও বেশি জ্বলে উঠছে। লোভ সামলাতে পারলাম না। মোবাইল চালু করে ভিডিও করতে শুরু করে দিলাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম বিদ্যুতের খুঁটি সহ হাইটেনশন তার ছিঁড়ে পড়েছে রাস্তায়। দু'ধারে ঘন বন। বসতিহীন স্থানে দাঁড়িয়ে কি ভুল করলাম? নিজের মনেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম। সিক্সথ সেন্স বলে উঠল ভুল তো করেইছ! নিজের ঠেলা নিজেই সামলাও! সঙ্গে সঙ্গে মনকে একটু শক্ত করলাম। হাঁচি দিতেই কোনো দ্বিতীয় পক্ষের জীব বা প্রাণীর উপস্থিতি টের পেলাম। প্রকৃতির আলোয় ঠাহর করলাম দুটো কুকুর বসে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। মনে একটুখানি বল-ভরসা পেলাম। দু'চার মিনিট ভাবছি—এরকম বিপর্যয়ে ক'বার পড়েছি আমি! ক্রমশ উতলা হয়ে পড়ছি। প্রকৃতি ততই ভয়ঙ্করতম হয়ে উঠছে। সবসময়ই হঠকারী স্বভাবের আমি। ছাতা, রেইনকোট আমার ধাতে সয় না। বাড়িতে এই নিয়ে ঝামেলাও কম হয় না।

অগত্যা অপেক্ষা ছাড়া কোনো গতি নেই। এ হে! বলতেই তো ভুলে গেছি, ঠিক কোন্ জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি আমি! মোড়গ্রাম-বালাশোরগামী জাতীয় সড়কের ধারে। নির্জন বন-পাহাড় আর টিলা-ডুংরিতে ঘেরা। বাইপাস রোড এখান থেকে আড়াই কি.মি.। তারপর সোজা চলে গেছে ওড়িশার দিকে। জঙ্গলের পাশেই মূল সড়কের ধারে রয়েছে একটা ফাঁকা শেড। আর ঠিক তার পাশেই আছে 'মুক্তমন' নামের বৃদ্ধাশ্রমের সীমানা পাঁচিল। একটু তফাতে আছে আশ্রমের মূল ফটক। গেট থেকেই দেখা যায় উত্তরের খোলামেলা ব্যালকনি আর দীঘল ঝুল বারান্দা । জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখা গেল এক মহিলাকে । মনে হচ্ছে তিনি যেন বিধ্বস্ত । শতচ্ছিন্ন । লম্বা বারান্দায় ঝড়ের তাণ্ডব টেনে হিঁচড়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাঁর দেহখানি । এই ছায়া আর কায়া'কে আরো মোহময়ী করে তুলেছে বিদ্যুতের তীব্রতর আলো। ভেসে আসছে গানের সুর----আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা....। ভরা শ্রাবণে বর্ষা তেমনভাবে স্বমূর্তি ধারণ করেনি এখনো। তবুও মন মাতানো জল গায়ে মেখে মাতোয়ারা ব্যাঙের বংশ। সামান্য দূরে হায়েনা কিম্বা নেকড়ের ভয়ার্ত ডাক শুনতে পেলাম স্পষ্ট। এই এলাকাটি ওড়িশার সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুধু কাজু'র বাগান। জাতীয় সড়কের দু'ধারে বর্ষার দূত কদম গাছে গাছে ভরা যৌবন। ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে ডালপালা। পাতা পড়ে চলেছে টুপটাপ করে। ফুরফুরে গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। অবিরাম ঝরে চলেছে বারিধারা। কোথাও জনপ্রাণী নেই। কোলাহল নেই। বহুদূরে চড়াই উতরাই মাড়িয়ে মালবাহী বড়ো বড়ো যান চলাচল করার ক্ষীণ দৃশ্য নজরে পড়ে। যেটুকু ঠাহর করা যায় সেটাও ঝাপসা ঠেকছে চোখে। কখন সুরেলা গলার গান থেমে গেছে খেয়াল করিনি। জানালায় চোখ পড়তেই দেখি চারিদিক ঘনঘোর অন্ধকার। পরিত্যক্ত বৃদ্ধাশ্রমকে গ্রাস করেছে শূণ্যতা। অমূলক ভাবনাকে ঠেলে দিল ভৌতিক খাদের কিনারায়। তখনি, ঠিক তখনই মহিলা কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ আর সমস্বরে ডুকরে ডুকরে ওঠা কান্নার আওয়াজ ভয়ার্ত করে তুলল। মুহূর্তের মধ্যে খেলে যাওয়া বিদ্যুতের ঝলকানিতে দেখ লাম দরজা-জানলাহীন বৃদ্ধাশ্রমে চলছে ঝড়ের তাণ্ডব। সঙ্গে ভয় ধরানো শন্ শন্ শব্দের দামামা। জনমনিষ্যিহীন প্রান্তরে বর্ষণমুখর রাতে আমি একা। নিজের ছায়াটাকেও আর বিশ্বাস করার দম কিম্বা সাহস কোনোটাই আমার নেই। কখন চোয়ালে চোয়াল চেপে বসেছে তাও জানি না! সেই চেনা ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, এলোচুলে লুটিয়ে পড়া আঁচল মাটিতে ঘসটাতে ঘসটাতে বহু কষ্ট করে হেঁটে চলেছেন মিসেস উইলো। বেদনায় নীল হয়ে গেছে শ্রীময়ী মুখখানি। কেঁদে চলেছেন অবিরাম। একবার করে বেতের মতো মাটিতে বেঁকে পড়ছেন। আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে চলেছেন। শিক ও পাল্লাহীন জানালা দিয়ে তাঁর পদ্মের মৃণালের মতো হাত দু'খানি বাড়িয়ে স্নেহঝরা গলায় ডাকছেন, ওয়েলকাম মাই সন্! ওয়েলকাম! ঠিক আগে যেমনভাবে ডাকতেন সেইরকমই সন্তান স্নেহে ডেকে চলেছেন। এ কী শুনছি আমি! নাকি মনের ভ্রম? হতভম্ভ হয়ে পড়লাম।

আমরা এই মাঝবয়সী মহিলাকে ছোটোবেলা থেকেই উইলো আন্টি বলেই ডাকতাম। কী ভালোটাই না বাসতেন আমাদের সবাইকে! মাদার হাউসে গেলেই শুকনো বিলিতি দুধ, রকমারি বিস্কুট আর লজেন্স দিতেন। হাসিমুখে কত কী গল্প শোনাতেন। বাবার ছিল বদলির চাকরি। এই মিশনারি আশ্রমের কয়েক কিলোমিটার দূরে কোম্পানির কলোনি। তাই আমরা কলোনির ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে সাইকেলে কিম্বা পায়ে হেঁটে চলে আসতাম। মিশনের অতবড়ো ফল আর ফুলের বাগান জুড়ে ছিল আমাদের দাপট। সমবয়সীদের তাণ্ডব চলত লাগাতার। আমাদের সমস্ত অত্যাচার সামলাতেন উইলো আন্টি আর সরলা

পিসি। দুজনেই মায়ের বয়সী। সরলা পিসি ছিলেন সাঁওতাল পরিবারের মেয়ে। এই সাহেব বাগান ছিল আমাদের খে লাধুলার খুবই প্রিয় জায়গা। স্থানীয় মানুষ বলেন আশ্রম। অনেকেই সাহেব বাগানও বলেন। সপ্তাহে দুটো দিন আসতাম এখানে। রবিবার ছিল বিশেষ দিন। ওই দিন আবার সারাদিনের জন্য হাট বসত। বহু মানুষ আসত হাটে। দোকান পসরা সাজিয়ে বসতো বেচাকেনার জন্য। শাকসবজি, মাছ, মাংস ও বনজ সম্পদ, ফলমূ লও পাওয়া যেত সস্তায়। হাটে আসা বহু মানুষ আশ্রমে ঢুকত। জল খাওয়া থেকে বিশ্রাম সবই হত আগন্তুকদের। সেদিন সকলের জন্য দরজা খোলা থাকত। ভিতরে ছিল অতি মনোরম ও পবিত্র চার্চ। ও-রা বলেন সন্ত পিটারের চার্চ। রবিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত থাকত মানুষের ভিড়। এই ভাবেই চলছিল বেশ। আঙ্কু মরা যখন কলেজে পড়ি তখনি শুরু হয়ে গেল গণ্ডগোল। প্রথমে আশ্রমের জমিকে ঘিরে অশান্তি শুরু হয়। আশ্রমের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে একশ্রেণির মহাজন, সুদখোর , সমাজের মোড়ল, মদ ব্যবসায়ী থেকে ওঝা, জানগুরুদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। লোককে ক্ষেপিয়ে তুলতে কেউ কেউ বলে উঠল—ধর্মান্তরিত করছে গরিবি আর দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে। আবার কেউ কেউ প্রচার করে দিল আশ্রমের নামে নারী, শিশু পাচার করে বিদেশে। ধর্মের জিগির তুলে অসহায় করে তুলল আবাসিক ও এখানে ভরণপোষণ পাওয়া অসহায় নির্যাতিতা মহিলার দলকে। এখানে নিয়মিত সেবা দান করা হত পথবাসী, ভিক্ষুক ও অগণিত কুষ্ঠ রোগীদের। সুকৌশলে নানান কুৎসা এবং অপপ্রচার চাউর করে দিল একদল কায়েমী স্বার্থান্বেষী মানুষ। বিদেশি টাকার রমরমা বলেও কুৎসার ফানুস ওড়ানো হল।

তারপর আচমকা একদিন ঘরভাঙা ঝড় উঠল। একদল শয়তানের সৃষ্ট কালবৈশাখী ঝড়ে তাদের স্বপ্নের, সাধনার-মুক্তমন ও মাদার হাউস তছনছ হয়ে গেল। একদিন গভীর রাতে রহস্যজনকভাবে আগুন ধরে যায় মাদার হাউসে। আবাসিকদের বাসভবনে এই আগুনের শিকার হলেন উইলো আন্টি সহ চার-পাঁচজন আবাসিক ও পরিচালক। আশ্রমে থাকা অন্যান্য আবাসিকরা আগুনের হাত থেকে বাঁচতে মরণপণ দৌড় লাগায়। যে যেদিকে পেরেছে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যায়। এই নির্মম প্রাণঘাতী চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। ক্ষোভ-বিক্ষোভ আর ঘৃণা বর্ষিত হল এই জঘন্য, অমানবিক কাণ্ডের জন্য। যথারীতি আইন-আদালত ও প্রশাসনিক স্তরে শুরু হয়েছিল তদন্ত। মামলা-মোকদ্দমা চলতে লাগল স্বাভাবিক নিয়মেই। মাস বছর গড়িয়ে গেল।

তারপর একদিন সব থিতিয়ে গেল। থেমে গেল প্রতিবাদী ঝড়। মা মেরী'র দেশের উইলো আন্টিও বলেছিল, হে প্রভু ! ওদের তুমি ক্ষমা করো ! ওরা জানে না, ওরা কী করল ! কয়েকটি বছর গড়িয়ে গেল আমাদের জীবন থেকে। আমরা নিজেরা একদিনও যাইনি পোড়ো মাদার হাউসে। এখন আর আগের মতো সাহেববাগান মুখো হইনি। খোঁজ নিইনি সন্ত পিটারের পবিত্র চার্চের। যেখানে দেওয়া হত মানবতার পাঠ। মানুষ হয়ে ওঠার গল্প শুনতাম চুপচাপ সেই মা মেরির মন্দিরেও যাই না আগের মতো। শুধু উইলো আন্টি, সরলা পিসিদের মুক্তোঝরা হাসিমাখা মুখগুলো ভেসে ওঠে বুকের ভিতর। তাদের দেওয়া শান্তি ও মানবমুক্তির পাঠ রয়ে গেছে হৃদয়ের মণিকোঠায়।

এখন ঝড় থেমে গেছে। বৃষ্টিও কখন উধাও হয়েছে বুঝতে পারিনি। রেসকিউ টিম এসেছে রাস্তা ক্লিয়ার করতে। ধীরে সুস্থে গাড়ি চালিয়ে চলে এলাম বড়ো গির্জার কাছাকাছি। আমাদের কলোনিতে বিদ্যুৎ এসেছে অন্ধকারের মুখ মুছিয়ে। আরো কয়েক মিনিট পর ঢুকলাম কোয়ার্টারের সদর দরজায়। আমার জন্য মা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে উৎকণ্ঠা নিয়ে। কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? কিছু না বলেই আধভেজা পোশাক খুলে সোজা কলতলায় চলে এলাম। রাতের সব ধাপ শেষ করে যখন বিছানায় গড়িয়ে দিলাম শরীরটাকে তখনও ঘোর কাটেনি মাদার হাউসের অবর্ণনীয় সেই কাহিনির। যখন পৈশাচিক উল্লাসের বীভৎসতার ঘটনা ঘটে সেদিনের সাক্ষী বহু মানুষ। অমানবিকতার নির্লজ্জ প্রয়াস নাড়া দিয়েছিল দেশজুড়ে। সমস্ত রাগ,ক্রোধ, ঘৃণা স্তিমিত হয়ে যায়। তারপর থেকে ত্রিসীমানায় কেউ পা মাড়ায় না। পোড়ো আশ্রমকে ঘিরে শুরু হয়ে যায় নানান ভৌতিক আখ্যান। শুধু আমি নই অনেকেই নাকি মাঝে মধ্যে অনুভব করেন কায়া'র ছায়া কাহিনি। এরকম ভুতুড়ে কিম্বা আজগুবি কাণ্ড এলাকার মানুষের মনেও ঘুরপাক খায় অহরহ। একদল সামন্ত মানসিকতার জমি হাঙ্গর শুধু শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সাহেব বাগানের শান্ত নিরিবিলি চৌহদ্দির দিকে। রাত হয়ে গেছে অনেক। প্রভু যিশুর নাম স্মরণ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

শুধু তোমারই জন্য

প্রণব দত্ত

বিপ্রদাস নিতান্তই ছাপোষা মানুষ। ছোট্ট একটা মনিহারি দোকান। দোকানের এক সময় বেশ রমরমা ছিল। এলাকায় বিপ্রদার দোকান বললেই যে কেউ এক বাক্যে চিনিয়ে দিত। দোকানটা ছোটো কিন্তু তাতে কি থাকত না ! ছোট্ট রুমি থেকে পাড়ার রতন জেঠুর চাহিদা মতো সব হাজির। জিনিসপত্রের ভিড়ে অনেক সময় বিপ্রদাকে দেখাই যেত না। ছোট্ট রোহন এসে যখন চেঁচাত, ও বিপ্রজেঠু , তুমি কোথায় ? আমাকে দুটো লজেন্স দাও না ---- বস্তার পিছন থেকে বিপ্রদা মাথা বার করে বলত, কিগো রোহন বাবু এত সকাল সকাল ! ইস্কুলে যাওয়া হয়নি বুঝি ?

নাগো জেঠু, আজ আমাদের স্কুল ছুটি।

তাই বুঝি তুমি লজেন্স চাইলে, তাই না ? এই নাও বলে বয়ম থেকে চারটে লজেন্স বার করে রোহনের হাতে দিল বিপ্র।

না না, আমাকে দুটো দাও, মা তো আমাকে দুটোর মাত্র পয়সা দিয়েছে।

আহা, তাতে কী হয়েছে, কিন্তু তোমার মায়ের দেওয়া আর বাকি দুটো আমার।

ফিক করে হেসে ফেলে রোহন। হাসলে গালে কী সুন্দর টোল পড়ে।

বিপ্র জেঠু তুমি কী ভালো গো ... বলেই লজেন্স চারটে নিয়ে ছুট লাগায় রোহন।

কী রে সুজি, আজ কলেজ যাসনি বুঝি !

জেঠু , তুমি মোটেই আমাকে কখনো সুজি বলে ডাকবে না ।তোমার দেখাদেখি আমার বন্ধুরাও আমায় সুজি বলে ডাকতে আরম্ভ করেছে।

তা , আমি কি ভুল করেছি বল দেখি ।তোর নাম সুজাতা। ছোটো করে বলেছি সুজি। আর শোন মেম সাহেবরা এরকম ছোটো নামেই পরিচিত হয়।

আমি তো বাপু মেম সাহেব নই।

না মা, তুমি মেম সাহেবই। সেই কতটুকু সুজাতা আজ কত বড়ো হয়ে গেল ! এরপর আর আমার মতো বুড়ো জেঠুকে চিনতেও পারবে না।

এ কথা বোলো না জেঠু, তুমি হলে এই পাড়ার সবথেকে ইয়ংম্যান।

এইরকম কথাবার্তার মধ্যেই বিপ্রদাসের দোকান দিব্যি চলছিল।

বিপত্নীক বিপ্রদাসের একমাত্র অবলম্বন ছেলে রোহিতাশ্ব । ছোটো থেকেই পড়াশোনায় তুখোড়। ইসকুলের পরীক্ষায় বরাবর ভালো রেজাল্ট করে আসছে। মাঝেমাঝে তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিপ্রদাস নিজেই অবাক হয়। সে তো বেশিদূর লেখাপড়া করেনি, কিন্তু তারই ছেলে কী করে পড়াশোনায় এত ভালো হল! ছেলেকে তো সে ভালো করে টিউশনও দিতে পারেনি।মাধবী ই ছেলের দেখাশোনা করত। মাঝেমাঝে মা ছেলের রকম দেখে বিপ্রদাসের হিংসেই হত। কিন্তু ছেলেটা ভারী মা ন্যাওটা। হিংসে হত ঠিকই আবার ভালোও লাগত। রোহিত যখন ক্লাস নাইনে উঠল ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে তখন মায়ের কী আনন্দ! যেন সেই ফার্স্ট হয়েছে।

একদিন হঠাৎ পাড়ার দুতিনটে ছেলে এসে খবর দিল, তুমি এখুনি বাড়ি যাও, কাকিমার শরীর খারাপ। রোহিত মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছে।

দোকানটা খোলা রেখেই বিপ্রদাস তার বাড়ির দিকে হাটা দেয়। শুধু পাশের দোকানের রবিকে একটু নজর রাখতে বলে যায়। বাড়ি থেকে একটু আগেই ডাক্তারবাবুর চেম্বার। পাড়ার বৃদ্ধ ডাক্তার। ভদ্রলোকের ডিগ্রি কী তা কেউ জানে না। শুধু জানে ওর ওষুধ খেয়ে জ্বরজারি রোগ সেরে যায়।

---- কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু? বিপ্র জিজ্ঞেস করে।

চশমাটা মাথার উপর তুলে ডাক্তারবাবু বলেন, আমি ঠিক ভালো বুঝছি না। আর মাধবীকে আমি না বুঝে কোনো ওষুধ দিতে চাই না। ওকে কোনো বড়ো ডাক্তার দেখাও।

বিপ্রর বুক ছাৎ করে ওঠে। ডাক্তারবাবু তো এমন কথা বলেন না। ঠিক আছে

বলে মাধবীর হাতটা ধরে বাইরে বেরিয়ে আসে বিপ্র। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা রোহিত উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করে, বাবা, ডাক্তারবাবু কী বললেন ?

বিপ্রতে ছেলেকে ডাক্তার বাবু যা বলেছেন সবই বলল। মাধবী বিপ্রদাসের হাতটা চেপে ধরে বলে , আমার কিছু হয়নি। ওসব ডাক্তার ফাক্তার দেখাতে হবে না। একটু বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক আছে, তোমাকে ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না । আমি দেখছি , বলে রোহিতকে তার মাকে সাবধানে বাড়ি নিয়ে যেতে বলে নিজের দোকানের দিকে হাটা দেয় বিপ্রদাস। সারাক্ষণ একটা চিন্তা তার মাথায় ঘুরতেই থাকে। মাধবীর এমন কী হল যে ডাক্তারবাবু বড়ো ডাক্তার দেখাতে বললেন !

দোকানে বসেও মনটাকে স্থির করতে পারছিল না বিপ্রদাস। বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছিল। এক সময় দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে আসে সে। ছেলে রোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে কালই শহরে নিয়ে গিয়ে বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবে। ঘরে একটাই চৌকি। বেশ বড়ো। তিনজন এক চৌকিতে শোয় তারা। ছেলেটা এত বড়ো হল , তাও মাকে জড়িয়ে না ধরে ঘুম আসে না। পাশে মাধবী আর রোহিত ঘুমে কাদা। ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে বিপ্রদাস। চিন্তা করতে করতে চোখ বুজে আসে তার। পরদিন সকাল সকাল উঠতে হবে। সকাল বেলাতেই মাধবীকে নিয়ে শহরে যেতে হবে। রোহিত যাবে স্কুলে। সে স্কুল থেকে ফেরার আগেই ওরাও ফিরে আসবে। মাধবীর অবশ্য খুব ভোরে ওঠার অভ্যেস। বিপ্র আশা করেছিল ঘুম থেকে উঠে দেখবে মাধবীর স্নান সারা হয়ে গেছে।জানলার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো চোখে পড়তেই ধড়মড় করে উঠে পড়ে বিপ্র। এত বেলা হয়ে গেল। পাশে তাকিয়ে দেখে মাধবী তখনো নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। রোহিতও পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছিল।

মাধবী এত বেলা অব্দি ঘুমোচ্ছে কেন ! এ তো হবার নয়। আবার ভাবল হয়তো শরীরটা ভালো নেই বলেই ঘুম এখনো ভাঙেনি। বিপ্র দাস মাধবীকে আস্তে করে একটা ঠেলা মারে। না , কোনো সাড় নেই। এবার হাতটা ধরে জোরে নাড়া দেয়। এত ঠান্ডা কেন হাতটা ! এবার হাতটা আরো জোরে চেপে ধরে। মাথার মধ্যে বিদ্যুতের চমক খেলে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে বিপ্র, রোহিত তাড়াতাড়ি ওঠ, তোর মায়ের শরীর এত ঠান্ডা হয়ে গেছে কেন দেখ তো বাবা !

ধড়মড়িয়ে ওঠে রোহিত। উঠে দেখে বাবার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না। তার মায়ের সারা শরীরে পাগলের মতো হাত বোলাচ্ছে আর বলে চলেছে, রোহিত তোর মা বোধহয় আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তুই বাবা তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।

সব কাজ সেরে বাড়ির উঠোনে এসে বসে তারা। সঙ্গে আরো কিছু প্রতিবেশী। সবার চোখে মুখেই স্বজন হারানোর বেদনা। বিপ্রদা , তোমাদের দুঃখ কষ্টের ভাগ আমরা নিতে পারব না তবে আমরা তোমাদের পাশে থাকব এইটুকু কথা দিতে পারি--- নয়নের দিকে তাকায় বিপ্র। বয়সে অনেকটা ছোটো। কিন্তু কাল থেকে তাদের সঙ্গে একেবারে আত্মীয়ের মতো সঙ্গ দিয়েছে। ছেলে রোহিতাশ্বর দিকে তাকায় বিপ্র। এখান থেকে কখন যে চোখের জল শুকিয়ে গেছে কে জানে ! ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে রাখাল। ছোটবেলাতেই ওর বাবা মা দুজনেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছে। রাখাল তার মাসির কাছেই বড়ো হয়েছে। আর ওর মাসি, যার ডাকনাম ফুলি, সে তো রাখালকে চোখের মনির মতো আগলে রাখে। ফুলির কোনো সন্তান

নেই , তাই রাখালকে কিছুতেই কাছ ছাড়া করতে চায় না। রাখাল আর রোহিতাশ্ব এক ক্লাসেই পড়ে। স্কুলে স্যারেরা বলেন হরিহর আত্মা। রোহিত চিরদিনই পড়াশুনায় ভালো, আর রাখল মোটামুটি। এবার রাখাল যখন পা ভেঙে বিছানা থেকে উঠতে পারছিল না, অথচ ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে না পারলে ক্লাসে ওঠা যাবে না, তখন রোহিতই বন্ধুকে ধরে ধরে রিক্সায় করে স্কুলে পরীক্ষা দিতে নিয়ে গিয়েছিল। বিপ্র তার স্ত্রী বিয়োগের পর কেমন যেন উদাসীন হয়ে যায়। দোকানে বসে বটে, কিন্তু যেন ঠিকমতো মন দিতে পারছিল না। সমবয়সী বন্ধুরা মাঝেমধ্যে এসে গল্প গুজব করত যখন তখন মনটা কিছুটা হালকা হত।

অনন্ত স্থানীয় স্কুলের টিচার। বিপ্রর অনেক দিনের বন্ধু। সে বলে, দেখবি তো মানুষের দিন কখনো একরকম যায় না বৌদির মতো ভালো মানুষকে আমরা রাখতে পারলাম না। একটা কথা আছে না যাই হোক না কেন শো মাস্ট গো অন ! জীবনটা তো থমকে যাবে না। তোর ছেলে রোহিত কত ভালো ছেলে, ওকে ওর মা-বাবা দুজনের ভালোবাসা তো তোকেই দিতে হবে। মাথা নাড়ে বিপ্র। হঠাৎ মনে পড়ে রোহিতের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবে আজই তো ! কই, এখনো তো এল না সাত পাঁচ ভাবতে বসে বিপ্র। যদিও ছেলের উপর তার অগাধ বিশ্বাস। ওইটুকু ছেলে কিভাবে তার মা চলে যাবার পর নিজের কষ্টকে বুকে চেপে রেখে বাবার চোখের জল মুছে দিয়েছে। এভাবেই বিপ্রর দিন কেটে যায় । মনিহারি দোকানের এক চিলতে ঘরেই তার দিন কাটে। রুহিত মাঝে মাঝে বলে, বাবা তুমি ঘরে বিশ্রাম নাও। ততক্ষণ আমি দোকানটা দেখি ...

না না, তোকে দোকানে বসতে হবে না ,তোর নিজের পড়া কর বাবা। বিপ্রর নিজের কথা মনে পড়ে। বাবা মারা যাবার পর বাবার তৈরি এই দোকানটাই তাদের সংসারকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সংসার বেঁচেছিল , কিন্তু অনেক স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছিল সেই দিন। এলাকার সেরা ফুটবল খেলোয়াড় , সবাই বলত বিপ্র কলকাতা ময়দানে বড়ো দলে চান্স পাবেই। গেম টিচার তো বিপ্র বলতে অজ্ঞান। খেলার মাঠে বিপ্র যখন বল পায়ে ক্ষিপ্র গতিতে বিপক্ষ দলের এলাকায় ঢুকত দর্শক অবাধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত। সেই যে বিপ্র সংসার বাঁচাতে দোকানে বসল ,স্বপ্নের অকাল মৃত্যু ঘটল সবার চোখের সামনে, তার থেকে আর মুক্তি পাওয়া গেল না। সে কথা মনে পড়তেই বিপ্রর এক গো, না কিছুতেই ছেলেকে দোকানে বসতে দেবে না। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা কতটা দুর্বিষহ তা সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। তারপর প্রতিবেশী বন্ধুদের অনেক অনুরোধে বিপ্র মাধুরীকে বিয়ে করে। মাধবী কেন এ সংসারে বিশুদ্ধ একটা হাওয়ার মতো এসেছিল। বিপ্রর বাউন্ডুলে জীবনটাকে একটা শৃংখলার মধ্যে এনেছিল সে। অনেক হারানোর বেদনা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছিল। তখন রোহিতের জন্ম হল। আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল বিপ্র। বন্ধুদের ডেকে বলেছিল আমার মতো সুখী আজ আর কেউ নেই। মাধবী তাদের সব বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেল ! দুঃখের সাগরে ভাসতে ভাসতেও মাধবীকে স্বার্থপর বলতে পিছপা হয় না বিপ্র। বাবা ছেলের দিন একরকম কেটে যাচ্ছিল। বিপ্রর যেমন খেলাধূলার প্রতি আকর্ষণ ছিল তেমনি তার ছেলের পড়াশোনার উপরে। সারাটা দিন বইপত্র নিয়ে কি যে বসে থাকে বিপ্রর মাথায় আসে না। বিপ্র রোহিতের বন্ধুদের মুখ থেকে শুনতে পায় ও শুধু নিজের জন্য নয়, তার বাবাকেও ভবিষ্যতে ভালো রাখার জন্য এত চেষ্টা করছে।

চোখের কোণ চিকচিক করে বিপ্রর। যথার সময় রোহিত স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে কলেজে ঢোকে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় দারুন রেজাল্ট করে। রেজাল্টের দিন বিপ্র দেখল রোহিতকে কাঁধে করে কয়েকটা ছেলে তার দোকানের সামনে এসে উপস্থিত হল। কাঁধে তোলার মূল পান্ডা ঐ রাখাল।

কাকু , রোহিত আমাদের স্কুলের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে। আমরা খুব খুশি।

বিপ্র রাখালকে জিজ্ঞাসা করে, তা তো বুঝলাম, তোরও তো রেজাল্ট বেরিয়েছে । তোর কি খবর ? সে তোমার জেনে কাজ নেই। কোনোরকমে টেনেটুনে সেকেন্ড ডিভিশন । আমার তো আর পড়া হবে না।

কেন ?

আমার মেসো বলেছে আর পড়াশোনায় কাজ নেই ওঁর অফিসে আমাকে ঢুকিয়ে দেবেন।

এই বয়সে, সে কী রে ?

তাতে কি হয়েছে , আমার বন্ধু তো অনেক পড়াশোনা করে কত বড়ো চাকরি করবে। আমার গর্ব হবে না ? আমি সবাইকে বলব আমি রোহিতের বন্ধু। কী বন্ধু, মনে রাখবি তো ?

রোহিত রাখালকে জড়িয়ে ধরে।

ইতিমধ্যে রোহিত কলকাতার এক নামকরা কলেজে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়ে গেছে। রেজাল্ট খুব ভালো থাকায় কলেজে ভর্তি হতে তেমন অসুবিধা হয়নি। বিপ্রর আনন্দ দেখে কে ! কিন্তু তার মনে একটা খটকা লেগে থাকে , ওখানে তো পড়াশোনার অনেক খরচ, সে কি সামলাতে পারবে ?

মুশকিল আসান করে রোহিতাশ্ব। বাবা চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, বাবা তোমাকে আমার পড়া নিয়ে এত চিন্তা করতে হবে না । আমি একটা স্টাইপেন্ড পেয়েছি। সেটা দিয়েই আমার পড়ার খরচ ঠিক মিটে যাবে।

সেই পুরনো দিনের মতো দোকান চলতে থাকে ছোটো ছোটো

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এসে জোটে তার বন্ধুরাও।
দোকানের সামনে কয়েকটা টুল পেতে রেখেছিল বিপ্র। সেখানে অনন্ত ,বাবাই ,সুদীপ, শুনু , বিলাস , মলয় , বাবুরা চুটিয়ে গল্প করতে থাকে। মাঝে মাঝে খদ্দের না থাকলে বিপ্রও এসে যোগ দেয়।
বিপ্র, তোমার তো কোনো চিন্তাই রইল না। তোমার ছেলে এত বড়ো কলেজে ভর্তি হয়েছে । পাস করলে নিশ্চয়ই কোনো বড়ো চাকরি পাবে। মলয়দা , আশীর্বাদ করো আমার ছেলেটা যেন ভালো চাকরি পাক না পাক ,অন্তত ভালো মানুষ হয়।
আর তুমি এত ভালো মানুষ, তোমার ছেলে ভালো না হয়ে পারে ! তুমি দেখো রোহিতাশ্ব শুধু তোমার নয় , এলাকার মানুষের গর্বের কারণ হবে।কলেজে রোহিতাশ্বর বন্ধু-বান্ধবরা, তার বড়ো ফ্যান হয়ে গিয়েছিল। কারণ, আন্ত কলেজ ডিবেট কম্পিটিশনে ওর পারফরমেন্স। ওর ফাটাফাটি পারফরম্যান্স ওকে রাতারাতি সবার হিরো করে তুলেছিল। অধ্যাপকেরাও ওকে খুব ভালবাসতেন। অনুপমা ব্যানার্জি কলকাতার এক নামকরা বিজনেসম্যানের একমাত্র কন্যা। নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে কলেজে আসত। সেও ইংরেজি অনার্সের ছাত্রী। প্রচন্ড নাকউচু স্বভাবের মেয়ে। প্রথম থেকেই সবাই এই যে রোহিতের এত প্রশংসা করছে এটা ও একদম পছন্দ করত না। রোহিতের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল ভালো করে পাশ করে বাবার পাশে দাঁড়ানো। মানে একটা চাকরি পেলে বাবাকে ভালো রাখা যাবে। অনুপমা সমাজে এলিট শ্রেণির। ওর চাহিদা ভালো ডিগ্রি। কলেজের সোশ্যাল। ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তেজিত। গত দু'বছর সোশ্যাল করা যায়নি। এবার সব উসুল করতে হবে। কালচারাল কমিটির সিদ্ধান্ত হল এবার কোনো স্থানীয় বা প্রতিষ্ঠিত শিল্পীকে আনা হবে না। অনুষ্ঠানে অংশ নেবে ছাত্র-ছাত্রীরাই। একে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠবে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য শাপমোচন হবে। কিন্তু সেই নাটকের নাচের দিকটা কে দেখবে? সেকেন্ড ইয়ারের সিদ্ধার্থ বলল তোমরা এত চিন্তা করছ কেন ? আমাদের এত বড়ো নাচের এক্সপার্ট থাকতে তোমাদের চিন্তা কিসের ! সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কে, কার নাম বলছে !
আরে বাবা ,আমাদের নতুন ছাত্রী অনুপমা। বাংলার বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে। সবাই চুপ করে যায়। এসব তো জানা ছিল না! অনেকেই কলেজে আসতে দেখেছে ঠিকই, কিন্তু কথা তোবলা হয়নি। বড় শিল্পীর মেয়ে যে তাও তো অজানা ছিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর হরিশ বলল, কিন্তু ও তো খুব ডাটিয়াল , ও কি করতে রাজি হবে?
কেন হবে না, কলেজের ফাংশন, আমরা আগে ওকে ডেকে বলি তো তারপর না হয় ডিসিশন নেয়া যাবে ! নয়তো আমাদের সবার পরিচিত ইন্দ্রনাথ সেন বরাট তো রইলই।
অরূপ , তোর সঙ্গে তো ভালো বন্ধুত্বই আছে, যা , গিয়ে বল না জরুরি দরকার আছে , সে যেন একবার এখানে আসে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই অরূপ অনুপমাকে নিয়ে ফেরত এল।
তোমরা আমাকে ডাকছিলে ? অনুপমা জানতে চায়।
হ্যাঁ, মানে তুমি যদি একটু বসো ----- সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাজীব খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, তোমার নাম অনুপমা আমরা জানতাম। কিন্তু তুমি যে এত বড়ো একজন শিল্পীর মেয়ে তা আমাদের জানা ছিল না। তুমি যে আমাদের কলেজে ভর্তি হয়েছ এতে তো আমাদেরও গর্ব হচ্ছে ...
আমার মা একজন বড়ো শিল্পী তাতে তোমাদের এত গর্ব করার কী আছে ?
চুপ করে গিয়েছিল রাজীব, তারপর আস্তে আস্তে বলেছিল, না, তোমাকে ডাকার সঙ্গে আমাদের কলেজের একটা স্বার্থ আছে।
আরে বলোই না আমাকে কী জন্য তোমাদের দরকার ?
আসলে আমরা সবাই ডিশিয়ান নিয়েছি, এবার কলেজ সোশ্যালে রবীন্দ্রনাথের ' শাপমোচন' নাটক করা হবে।
--- তাই বুঝি ? তা আমাকে কি করতে হবে বলো না !
---পরিচালনা । এই নাটকের পরিচালনার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে।
পরিচালনা ? বলো কি ? আমি তো কোনোদিন এইসব পরিচালনা - টরিচলনা করিইনি। আমি কী করে করব ? তবে শাপমোচন নৃত্যনাট্যতে অংশ নিয়েছি। তাও আবার মায়ের পরিচালনায়।
আলোচনা পর ঠিক হলো অনুপমাই নাচের দিকটা দেখবে গানের দিকটা দীপঙ্কর দেখবে আর মাত্র ১০ দিন বাকি। অংশগ্রহণকারীরা উঠে পড়ে লেগেছে প্রোগ্রাম সাকসেসফুল করার জন্য। কলেজের পরে রিহার্সাল চলছে পুরোদমে ।একদিকে নাচের রিহার্সাল অন্যদিকে গানের।
--- কী বলিস রাজীব, এবার মনে হয় সোশ্যালটা জমে যাবে বল। কবে বলতো এইরকম স্টুডেন্ট পার্টিসিপেশন হয়েছে? প্রত্যেকবার তো বাইরে থেকে আর্টিস্ট নিয়ে এসে প্রোগ্রাম করা হয়েছে।
--- এবার এটা একদম আলাদা, আর অনুপমাকে দেখ ভেবেছিলাম নাক উচুঁ বড়লোকের মেয়ে। কিন্তু কী পরিশ্রমই না করছে বল দেখি।
----ও হচ্ছে গিয়ে একজন শিল্পীর মেয়ে ! ওর মধ্যে তো শিল্প থাকবেই।
---- চল কমন রুমের দিকে যাই ! আজ আবার একটা মিটিং আছে।

কমন রুমের দিকে দুই বন্ধু এগিয়ে যায়।
ঠিক হল, অনুষ্ঠানটা পুরো সঞ্চালনা করবে রোহিত। প্রথমে রাজি না হলেও সবার অনুরোধে শেষমেষ রাজি হতেই হল।
রিহার্সাল রুমে হাপাতে হাপাতে এসে পৌঁছয় চৈতালি।
---- কী হল, এত হাঁপাচ্ছিস কেন বলতো !
--- আর বলিস না এইমাত্র মিটিং সেরে এলাম। আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে !
---- কেন , এত আনন্দের কী হল ?
--- আরে রোহিত রাজি হয়েছে। প্রথমে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না ! বারবার বলছিল অনুপমার মতো এত ভালো শিল্পী যেখানে অনুষ্ঠান করছে সেখানে তার মতো একজন সাধারণ ছেলে কথা কে শুনবে ? কেনইবা শুনবে ?
শুনে সামনে এসে দাঁড়ায় অনুপমা, ' কেন ভাই , আমি বাঘ না ভাল্লুক ? এইসব ন্যাকা ছেলেদের আমি একদম পছন্দ করি না।
সবাই হা করে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। রোহিত ন্যাকা ? আকাশ থেকে পড়ে তারা ।রোহিতের মত এত ভদ্র, সভ্য ছেলে হয় না, আর এই মেয়ে ওকে বলছে ও নাকি ন্যাকা!
---- না রে অনুপমা। তুই কি ওর সঙ্গে কথা বলেছিস ?
--- আমার কথা বলার দরকার নেই । তবে ওকে প্রায়ই লাইব্রেরিতে বসে থাকতে দেখি। কী এত পড়ে কে জানে !
--- আরে লাইব্রেরিতে বসবে না কেন, ও যে আমাদের কলেজের অ্যাসেট।
--- অ্যাসেট ! কেন ?
বন্ধুরা বুঝতে পারে যেকোনো কারণেই হোক অনুপমা রোহিতের উপর রেগে আছে। তারা আর কথা বাড়ায় না, সবাই আবার রিহার্সালে চলে যায়। আসলে সবাই যে এত রোহিত রোহিত করে এটা সত্যিই অনুপমার একদম না পসন্দ। রোহিতের মতো একটা অর্ডিনারি ক্যাটাগরির ছেলেকে কেন সবাই এত মাথায় তুলবে এটাই তার প্রশ্ন।
কলেজের অডিটোরিয়াম আজ খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। স্টেজটা তো ফুলে ফুলে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা উত্তেজনা। একজন বসে আলোচনা করছে কীভাবে অতিথিদের অভ্যর্থনার করা হবে তাই নিয়ে। মিতালী, বিশাখা , পায়েল আর সুরঞ্জনা থাকবে স্টেজের ওপরে। অর্থাৎ স্টেজ ম্যানেজমেন্ট। অতিথিদের অবর্তনের জন্য থাকবে আকাশ সুস্মিতা সুবর্ণ আর মেঘমালা। সবাই যে যার কাজ বুঝে নিতে উদগ্রীব। সংস্কৃতিক সম্পাদক রাজীবের আজ খুব ব্যস্ততা। ওরই তো সবটা পরিচালনার দায়িত্ব। প্রফেসর সুশান্ত বাবু অবশ্য প্রতি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন। সেইমতো সব কাজ চলছে। কলেজের প্রিন্সিপাল একবার উকি মেরে গেছেন। একে একে দর্শক অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন । শিল্পীরাও যে যার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। সুশান্ত স্যার এসবি রোহিতের খোঁজ করছেন। কিন্তু কেউ রোহিতের খোঁজ দিতে পারছিল না। অথচ তাকে শেষ মুহূর্তে কতকগুলো পরামর্শ দেবার আছে। রাজীব উদ্বিগ্নমুখে এসবির কাছে এসে দাঁড়ায়, 'স্যার , রোহিত তো এখনো এল না। অতিথিরা সব এসে যাচ্ছেন। সময়ও হয়ে গেছে। এবার তো শুরু না করলে খুব অসুবিধা হবে। কিন্তু রোহিত না এলে তো ...
কথাগুলো কোনো ভাবে অনুপমার কানে পৌঁছয়। বুঝতে পারে আর কিছুক্ষণ পরে অনুষ্ঠান শুরু হবে আর এখনো রোহিত বেপাত্তা। সে মনে মনে ভাবে, হ্যাঁ আমি তো জানতাম। এইসব ছেলেকে বেশি পাত্তা দেওয়া ঠিক নয়। মাথা ঘুরে গেলে যা নয় তাই করে ফেলতে পারে। এবার কী হবে ! যার কোন সময় জ্ঞান নেই তাকে এত দায়িত্ব দেওয়ার কোনো মানে হয় !

সবাই চিন্তায় পড়ে গেছে। রোহিত এখনো এল না কেন ? এমন অবিবেচক তো ও নয় ! সবাই যখন রোহিতের এই ব্যবহারে মনক্ষুণ্ণ হতে শুরু করেছে তখন রোহিত অনুষ্ঠানের জায়গায় এসে উপস্থিত হয়। চুল উসকো খুস্কো। যেন অনেক ঝড় ঝাপটা ওর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে।
রাজীব ছুটে আসে, কি ব্যাপার , এত চিন্তায় ফেলে দিলি কেন , আমরা তো বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না তুই এরকম ঝোলাবি । ব্যাপারটা কী?
--- পরে সব বলছি। এখন মুখ টুখ ধুয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে আসি, বলে ও ওয়াশরুমের দিকে চলে যায়।
কিছুক্ষণ বাদেই ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে আসে। রোহিতকে দেখে যেন প্রাণ ফিরে পান এস বি। ওকে নিয়ে বসে যান অনুষ্ঠানের সবদিকটা নিয়ে শেষ মুহূর্তের সাজেশন দেবার জন্য। অতিথিরা সব এসে গেছেন । শুধু প্রধান অতিথি শহরের পুলিশ সুপার অনিরুদ্ধ সান্যাল এসে পৌঁছেন নি। উনি এলেই অনুষ্ঠান শুরু হবে। ঠিক হয় অনুষ্ঠান শুরু করে দেয়া হবে। পরে প্রধান অতিথি এলে সেই মতো তাকে বরণ করা হবে। রোহিতের সুললিত কণ্ঠের বক্তব্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। একে একে প্রিন্সিপাল এবং অন্যান্য অতিথিরা তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার মধ্যেই প্রধান অতিথি অনিরুদ্ধ সান্যালও এসে পড়েন। ছাত্ররা অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকে স্টেজে তুলে নিয়ে আসে। বক্তব্য রাখার জন্য প্রধান অতিথিকে অনুরোধ করা হলে প্রথমেই তিনি তার বিলম্বের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন। তারপর তার বক্তব্য রাখতে শুরু করেন, আজ আমাকে এখানে আসতেই হত। কারন এই কলেজের সঙ্গে আমার কৃতজ্ঞতা বোধ জড়িয়ে আছে। শহরে পুলিশের একজন

কর্তা হিসেবে আমি আপনাদের কলেজকে অভিনন্দন জানাই। সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করতে থাকেন। কি এমন ঘটনা ঘটেছে যার জন্য কমিশনার সাহেব আমাদের কলেজের উপর এত কৃতজ্ঞ ? পুলিশ প্রধান বলতে থাকেন, আজ শহরের বুকে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এটা একজনের মৃত্যু হয়েছে আর একটি শিশু গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। সকাল ১১ টা নাগাদ একটি প্রাইভেট গাড়ির সঙ্গে একটি লরির ধাক্কা লাগে প্রাইভেট গাড়ির সামনের দিকটা দুমড়ে মুচরে যায় । অনেক লোক জড়ো হয়। স্থানীয় থানাতেও খবর যায় পুলিশ এসে মৃতদেহ দেখ তে পায় কিন্তু শিশুটির কোনো খোঁজ পায় না। স্থানীয় উপস্থিত লোকেদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানা যায় একটি অল্প বয়স্ক ছেলে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নাকি স্থানীয় কোন হাসপাতালে নিয়ে গেছে। পুলিশ খোঁজ করে সেই হাসপাতালে পৌঁছে গিয়ে দেখে বাচ্চা ঠিক চিকিৎসা চলছে ডাক্তারদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল সময়মতো বাচ্চাটিকে হাসপাতালে আনা না হলে তার প্রাণ সংশয় হত।

-----কিন্তু সেই ছেলেটি কোথায় ?

---- কেন, এখানেই তো ছিল। অনেকটা রক্ত দিতে হয়েছে তো । বাচচাটি ভালো আছে জেনে হয়তো বাইরে বসে আছে। দুর্ঘটনা খবর শুনে আমিও তখন সেখানে গিয়েছিলাম। স্থানীয় অফিসারদের কাছে সব শুনে হাসপাতালে গিয়ে সেই ছেলেটির খোঁজ পাই। সে আর কেউ নয় আপনাকে কলেজে ছাত্র রোহিতাশ্ব। এমন ছেলে যে হাসপাতালের নার্সদের পর্যন্ত অনুরোধ করেছে তারা যেন তার নাম কাউকে না বলে। তার মতে সে এমন কিছু করেনি যার জন্য সবাই তাকে নিয়ে হৈচৈ করবে। সবাই হাঁ করে রহিতের দিকে তখন তাকিয়ে ছিল ও যখন স্টেজে বক্তব্য রাখছিল তখন সে যে এতক্ষণ হাসপাতালে থাকার , রক্ত দেওয়ার ধকল সামলে এসেছে তার কোনো চিহ্নই ছিল না।

রোহিতের মত ছেলে আপনাদের কলেজের ছাত্র এতে আপনাদের গর্ব হওয়া উচিত। বাচ্চা কি বাবা-মার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তারাও রোহিতের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

পুলিশ কমিশনার যখন এইসব বলছিলেন তখন রোহিত যে কোথায় লুকিয়ে পড়েছিল কে জানে। সবশেষে নিজে যখন রোহিতের নাম ধরে ডাকলেন তখন আর সেই ডাক উপেক্ষা করার মতো স্পর্ধা তার ছিল না। মঞ্চের রোহিত এলে একটা ফুলের স্তবক তার হাতে তুলে দিয়ে তার কাঁধে একটা হাত রেখে প্রধান অতিথি বললেন, তোমাকে সংবর্ধনা দিতে পেরে আমিও গর্বিত।

রোহিত তখন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অনিরুদ্ধ বাবু আর প্রিন্সিপালকে প্রণাম করে সে স্টেজ থেকে নেমে এল। ওই মুহূর্তে হাততালি যেন আর থামতে চায় না। শুধু অনুপমা সাজঘরে একা বসে আছে। সবার অজান্তে তার চোখে কয়েক ফোটা জল। ‘ কী হলো রাজমহিষির ! কোন রাতজাগা পাখি নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে হু হু করে উড়ে যায় তার পাখার শব্দে ঘুমন্ত পাখির পাখা উৎসুক হয়ে ওঠে যে !’

হাততালির শব্দ তার কানে বীণার শব্দের মতো ভেসে আসে , রোহিত দা ,আমায় ক্ষমা কোরো। আমি তোমার সম্পর্কে কত কী ভেবেছি , কত কী মনে মনে বলেছি।

মঞ্চে তখন নৃত্য ভঙ্গিমার সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে, জাগরণে যায় বিভাবরী / আঁখি হতে ঘুম নিল কাড়ি ...

এই ডাকটা তার কানে বীণার তারের স্পর্শের রিমঝিমএর মতো শোনায়। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে সামনে দাড়িয়ে রোহিতাশ্ব।

তুমি কাঁদছো কেন ?

যেন কতকালের পরিচয়।

চোখের জল চেটো দিয়ে মুছে নিয়ে বলে অনুপমা, চোখে কী যেন একটা পড়েছে ...

তাই বুঝি ?আমাকে আমার বন্ধুরা তোমার কাছে পাঠাল তোমাকে একটা কথা জানাতে আর তোমার পারমিশন নিতে।

--- পারমিশন ? কিসের পারমিশন?

--- তোমাদের নাটকের সুমি ত, অরুনেশ্বরের চরিত্রে গান গাইবার কথা ছিল যার, তার গান গাইবার অবস্থা নেই। ঠান্ডা লেগে গলা বসে গেছে বন্ধুরা আর বিশেষ করে প্রফেসর এসবি আমাকে সেই জায়গায় প্রক্সি দিতে আদেশ করেছেন।

অনুপমা উত্তর দেয় না। সে যেন তার সামনে বাস্তবের অরুনেশ্বরকে দেখতে পাচ্ছে। তার মুখ দিয়ে কথা সরে না। শুধু রোহিতের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ সম্বিৎ ফেরে বন্ধু সহশিল্পীদের ডাকে।

অনু এবার তোকে স্টেজে যেতে হবে।

হ্যাঁ যাচ্ছি ধীর পায়ে কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে সেই স্থান ত্যাগ করে অনুপমা।

বাড়ি ফিরে আসে অনুপমা। আগের অনুপমা আর আজকের অনুপমায় যেন হাজার যোজন তফাৎ । শুধু কানে বেজে যাচ্ছে তখন, বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে/ কোথা হতে এলে তুমি হৃদিমাঝারে...

রুমি

জ্বলন্ত এই পৃথিবীতে এক মরূদ্যান

ভূমিকা ও ভাষান্তর— শোভন ভট্টাচার্য

এই লেখা যখন লিখছি, প্রায় সারা বিশ্ব জ্বলছে বিবিধ হিংসার ছুতোয়। গত এক বছর যাবত রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ। বছরের পর বছর যাবত প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল-সিরিরা-লেবাননের যুদ্ধপরিস্থিতি। আফগানিস্তান-পাকিস্তানে কট্টরপন্থী তালিবানের উত্থান। ভারতে হিন্দুত্বের নামে ইসলামপন্থী সহ দলিত হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান হিংসার ঘটনাবলী। সর্বকালের সমস্ত সরকারের সঙ্গেই মূলবাসী মানুষের ভূমিরক্ষার লড়াই। এমনকী 'সুসভ্য' ইউরোপের 'শরণার্থীবন্ধু' ফ্রান্সে পুলিশের গুলিতে এক আলজিরিয় বালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শরণার্থী-বিক্ষোভের ভয়াবহ আগুন। সুইডেনের স্টকহোম মসজিদের সামনে সরকারি উৎসাহে কোরান-পোড়ানোর মতো উস্কানিমূলক ঘটনা। আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে স্বাভাবিক হয়ে আসা গৃহযুদ্ধ আর মাফিয়ারাজ। অস্ট্রেলিয়ায় একের পর এক বর্ণবিদ্বেষের ঘটনার কদর্য নজির। আর এইসব হিংসার অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেঘের আড়াল থেকে ইন্দ্রজিৎ-এর মতো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৃশংস ব্যবসায়িক ভূমিকা। সব মিলিয়ে পৃথিবীর কোথাও কোনো শান্তি নেই, স্থৈর্য নেই, ভালোবাসার লেশমাত্র নেই। এই জ্বলন্ত পৃথিবীতে সৃষ্টিশীল মন বৃথাই ছায়া খুঁজে খুঁজে মরে। আর মরতে মরতেই তার আত্মায় হঠাৎ একদিন পুনরুজ্জীবন লাভ করেন ৮০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন এক ফার্সি কবি। খেজুরবনের ঠান্ডা ছায়ায় তার আত্মা শীতল হয়ে ওঠে। সেই কবি আর কেউ নন, স্বয়ং জালাল আলদীন মুহাম্মদ রুমি। ১২০৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বর্তমান আফগানিস্তানের বলখ্ প্রদেশে মওলানা রুমি জন্মগ্রহণ করেন। ১২১৮ সাল নাগাদ তাঁর

পিতা বাহা আলদীন সপরিবারে বর্তমান তুরস্কের আনাতোলিয়ায় স্থানান্তরিত হন। এই অঞ্চলটির অপর নাম ছিল 'রুম', আর সেখান থেকেই পরবর্তী সময় তাঁর 'রুমি' পদবী লাভ। ১২২৮ সালে তাঁরা চলে আসেন রাজধানী কোনিয়া শহরে। ১২৪৪ সালের ১৫ নভেম্বর দরবেশ শামসই তাবরিজির্ সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎই রুমির জীবনকে পুরোপুরি বদলে দেয়। একজন দক্ষ শিক্ষক এবং আঞ্জুমান ইনজ্ঞ থেকে রুমি একজন তপস্বীতে রূপান্তরিত হন।

রুমির কবিতা গত আট শতাব্দী যাবত এই হিংসামুখর পৃথিবীর কোনো কোনো শান্তিকামী মানবহৃদয়ে মরূদ্যান হয়ে দেখা দিচ্ছে। তাঁর কবিতায় যে অপার প্রেমের ঐশ্বর্য রয়েছে, তাকে আজ আবার জনসমক্ষে তুলে ধরার তাগিদ অনুভূত হচ্ছে। রুমির কবিতা প্রথম পড়ি আজ থেকে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে। তার কিছুদিন পর আমার তৎকালীন প্রেমিকা তথা আমার স্ত্রীর দেওয়া প্রথম উপহার স্বরূপ আমার হাতে আসে কোলেম্যান বার্কস্ অনূদিত 'দ্য এশেনশিয়াল রুমি' বইটি। সেই বই এতদিনে যখন যেমন পড়তে ইচ্ছে হয়েছে পড়েছি। সঙ্গে আরও কিছু কিছু অনুবাদে পড়ার চেষ্টা করেছি রুমির কবিতা। কিন্তু তাঁকে নিজভাষায় অনুবাদের তাগিদ এমন করে আগে অনুভব করিনি। আজ মনে হচ্ছে, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যদি রুমির অনুবাদ ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে হয়তো এই অস্থির পৃথিবী একটু হলেও শান্তির খোঁজ পেতে পারে। রুমির কবিতা সেই শাশ্বত প্রেমের হদিশ দেয়, যার কাছে দেশকাল, জাতিধর্ম, নারীপুরুষ, উচ্চনীচ, ধনীদরিদ্র, সমস্তই তুচ্ছ। এই জগতের স্রষ্টাকে তিনি দয়িতের মতো আকুল হয়ে ডেকেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর নৃত্যে যে নক্ষত্রঘূর্ণির টান, সেই টান আমাদের নাড়ীর মধ্যে আমরা টের পাই আজীবন।

'সারাংশেরও তুমি সারকথা
আকুল প্রেমের মাদকতা
কত যে তোমার গুণ গেয়ে উঠতে চাই
তবু চুপ করে চেয়ে থাকি
হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়েই চেপে রাখি!'

আসুন কবি জালালুদ্দিন রুমির কয়েকটা কবিতা পড়া যাক। মূল ফার্সি ভাষা থেকে অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি, বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে বিভিন্ন ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে।

কীভাবে ভালোবাসব, আমি তোমার আলোয় শিখি

কীভাবে ভালোবাসব, আমি তোমার আলোয় শিখি।
তোমার সৌন্দর্য শেখায় আমাকে কবিতা লেখা।
আমার বুকের ভিতরে তুমি নাচো,
দেখতে পায় না কেউই, তুমি যে আছ,
কিন্তু মাঝেমধ্যে আমি দেখি তোমায় একা,
আর এমনই নান্দনিক হয়ে ওঠে সেই দেখা।

মাথনভি ৬

প্রেম যতটা উদ্ধত, নয় তত যুক্তিশীল।
যুক্তিবুদ্ধি সাধারণত মুনাফা-প্রত্যাশী।

বরং প্রেম ঝড়ের বেগে আসে,
নিজেকে গ্রাস করে, নির্বিকার।
এমনকী, শতকষ্টের মধ্যেও,
প্রেম এগোয় জাঁতাকলের মতো,
বাহ্যত কঠিন, শিরদাঁড়া সোজা।
যে নিহত নিজ স্বার্থেরই সন্ত্রাসে,
সর্বস্ব পণ করেও কিছুই চায় না সে।
আল্লার দেওয়া যত নাজরানা
জুয়ায় উড়িয়ে দেয়।
আল্লা দেয় অকারণেই জীবন আমাদের;
অকারণেই আবার ফিরিয়ে নেয়।

দিভানি সামস্ই তাবরিজ, ৩৪

জনৈক ভাস্কর আমি, একজন দক্ষ
রূপকার।

প্রত্যেক মুহূর্তে আমি মূর্তি গড়ে চলি।
অথচ, তোমার সামনে, ভেঙে ফেলি সব;
আমি গড়ে তুলতে পারি এমনই শতেক অবয়ব
ভরে দিতে পারি তাতে প্রাণও,
তোমার মুখের দিকে তবু আমি যখন তাকাই,
আমার সকল কীর্তি আগুনে নিক্ষেপ করতে চাই।
আমার অস্তিত্বটুকু মিশে যায় তোমার ভেতর।
কারণ আমার সত্তা টের পায় তোমার সুঘ্রাণ,
সযত্নে বুকের মধ্যে তাকে পুষে রাখি।
আমার প্রত্যেক ফোঁটা রক্ত এই জগৎকে জানায়
যখনই ভালোবাসার মধ্যে আমি থাকি
প্রিয়সঙ্গে মিশে থাকি কানায় কানায়।
এই কাদাজলের সংসারে, প্রিয়তম,
জর্জরিত অস্তিত্ব আমার যদি চাও
এ ঘরেই এসো, নয়তো আমাকে বিদায় নিতে দাও।

মাথনবী ১, ২৩-৩১

গোলাপ যখন ফুরিয়ে গেছে, বাগান হয়েছে ম্লান

তখন তুমি শুনতে পাবে না আর পাপিয়ার গান।
প্রিয়তমই সর্বস্ব, প্রেমিক শুধু একটি আবরণ।
প্রিয়তমই প্রাণস্বরূপ, প্রেমিক মৃত এবং অচেতন।
যদি প্রেম তার সেবাযত্নের হাত গুটিয়ে রাখে,
যত্নবিহীন পাখির মতো প্রেমিক পড়ে থাকে,
ডানাবিহীন পাখির মতো হয়ে থাকে সে চিৎ।
প্রিয়তমের আলোই যদি থাকে অনুপস্থিত
কীভাবে আমি সজাগ হব কিংবা সচেতন?
প্রেম চায় এই কথা প্রকাশ্যে হোক উত্থাপন।

যে আমাকে এনেছে এইখানে

সারাদিন আমি ভাবি এই নিয়ে, তারপর রাতে বলি।
কোথা থেকে আমি এলাম এবং কী আমার কর্তব্য?
ধারণা নেই আমার।
আত্মা আমার ভিন্‌দেশ থেকে আগত,
আর সেব্যাপারে আমি নিশ্চিত,
আমার লক্ষ্য সেখানেই গিয়ে থামা।

এই মাতলামো শুরু হয়েছিল অন্য সরাইখানায়।
যখন আবার ফিরে যাব সেইখানে
আমি হয়ে যাব পাক্কা ভদ্রলোক, আর ততদিন
অন্য কোনও মহাদেশের পাখি যেন আমি এক
বসে আছি এই পক্ষিশালায়, বিষণ্ণ, পরাধীন।
দ্যাখো সেইদিন আসন্ন, আমি উড়ে যাব মহাসুখে,
কিন্তু সে কোন সত্তা, এখন দিচ্ছে সে কার সাক্ষ্য?
কে শোনে আমার কানের ভেতর থেকেই আমার বাক্য?
শব্দ বসায় কে তবে আমার মুখে?

কে দ্যাখে দৃশ্য আমার দু'চোখ দিয়ে? আত্মাই বা কী?
প্রশ্ন আমার থামে না কিছুতেই।
যদি আমি কোনো উত্তরের একফোঁটা স্বাদ পাই
এই মাতালের কারাগার ভেঙে তাহলে বেরিয়ে যাই।
আমি তো আসিনি এইখানে স্বেচ্ছায়,
সেভাবে কি আর আমি ছেড়ে যেতে পারি?
যে আমার হাত ধরে নিয়ে এল এইখানে, এতদূর,
সেই তো বাধ্য ফেরাতে আমায় বাড়ি।

এই যে কবিতা। কখনোই আমি জানি না লিখবটা কী।
আমি প্রশ্রয় দিই না কৃত্রিমতা।
যখন আমি লেখার বাইরে থাকি,
শান্ত হয়ে যাই আমি অত্যন্ত - কদাচিত বলি কথা।

বাংলা থিয়েটারের পটপরিবর্তন

প্রাথমিক পর্ব

দীপঙ্কর সেন

পিছিয়ে যাওয়া যাক ১৯৯১ সালে। সাড়ম্বরে উদযাপিত হল কলকাতা মহানগরীর তিনশ বছর। সে তো এক দীর্ঘ ইতিহাস। এই তিনশ বছরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক বিরাট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যে ঐতিহ্যের প্রবহমানতার অন্যতম বিশেষ দিক বাঙালির নাট্যচর্চা। নয়নয় করে বাংলা থিয়েটারের বয়সও দুশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এই থিয়েটারের ইতিহাস গড়ে উঠেছে এক নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে, কিছু মানুষের ঐকান্তিক ও নিরলস সাধনার মধ্য দিয়ে, যার প্রতিটি পর্বের সঙ্গে যুক্ত সামাজিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের কণ্ঠস্বর। বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য যাত্রা পালাগান। তবে এই যাত্রাও নতুনতর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালির সাংস্কৃতিক প্রগতির অভিযানে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল সে কথা অবশ্যই বলা যেতে

পারে। যে উৎসব ছিল একান্তই বাংলার গ্রামকেন্দ্রিক তা ক্রমশ আকৃষ্ট করল কলকাতার বাবুদের। সূচনা হল নতুন আঙ্গিকে নতুন প্রয়াসের। লক্ষ্য করা গেল প্রেক্ষিতের আমূল পরিবর্তন। ধীরে ধীরে সামগ্রিকভাবে নাট্যচর্চা, এই নবতম প্রয়াস, হয়ে উঠল বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে যেমন তার নিবিড় বন্ধন, তেমনই শৈল্পিক পরীক্ষানিরীক্ষায় সে প্রতিনিয়ত আত্মমগ্ন। কলকাতার তিনশ বছরের মতোই তাই কলকাতার নাট্যচর্চারও এক স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে, যার সঙ্গে জড়িত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, যার সঙ্গে অবশ্যই জড়িত অসংখ্য নাট্যকর্মীর সারা জীবনের সাধনা।

১.

কিন্তু কলকাতার সংস্কৃতি চর্চা তো কেবল দুশ বছরের থিয়েটার নিয়েই নয়, তারও তো রয়েছে এক ইতিহাস, এক অবিচ্ছেদ্য চলমানতা। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যা বেশ কয়েক শতাব্দীর পুরোনো, তারই বহতা ধারার থেকে জন্ম এই নব্য থিয়েটারের। আমরা দেখি, একসময় বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা নিয়ে গানের আসর ছিল বাংলার অন্যতম সাংস্কৃতিক পরিচয়। উৎসবে পূজাপার্বণে দেখা যেত নানা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সেই শোভাযাত্রায় গীত গানের সঙ্গে এল নাচ ও অভিনয়। আরো পরে এল ঢপ, খেউড়, পাঁচালী, আখড়াই কবিগান। এই ভাবে শুরু হল আসরকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষের মিলিত প্রয়াসে শুরু হল 'যাত্রা'। চর্যাপদে আমরা পাই বুদ্ধনাটকের উল্লেখ। জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দকেও' কেউ কেউ বলেছেন বাংলা নাটকের আদিরূপ। চৈতন্যদেবের সময়ে আপামর জনসাধারণ মুগ্ধ হয়েছে নাটগীতিতে, বিষয় তার কৃষ্ণলীলা। আবার, কখনো যাত্রায় আসে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদও। ক্রমে পালাগানে মুগ্ধ হয় বাঙালি। এই কলকাতায় হরুঠাকুর, রাসুঠাকুর, ভোলাময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি, গোপাল উড়ের নাম ছড়িয়ে পড়ে। তারপর যাত্রার বিন্যাস, সংস্কৃত নাটকের রীতি আর ইংরেজি থিয়েটারের মিশ্রণে সৃষ্টি হল 'কলকাতা থিয়েটার'। ১৭৬৫ সালে ইংরেজদের অধীনে আসে বাংলার দেওয়ানি। এমন কি ততদিনে ১৭৫৩ সালে দ্য প্লে হাউস নাম একটি নাট্যশালাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এর পর ১৭৭৫ সালে তৈরি হয় আরো একটি নাট্যশালা— ক্যালকাটা থিয়েটার। এমনই এক সময়ে রুশ সংস্কৃতিকর্মী গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদফের কলকাতায় আগমন এবং ১৭৯৫ সালে ওঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা পায় বেঙ্গলি থিয়েটার, যেখানে ওই বছরেই মঞ্চস্থ হয় 'কাল্পনিক সংবদল' (দ্য ডিসগাইজ),

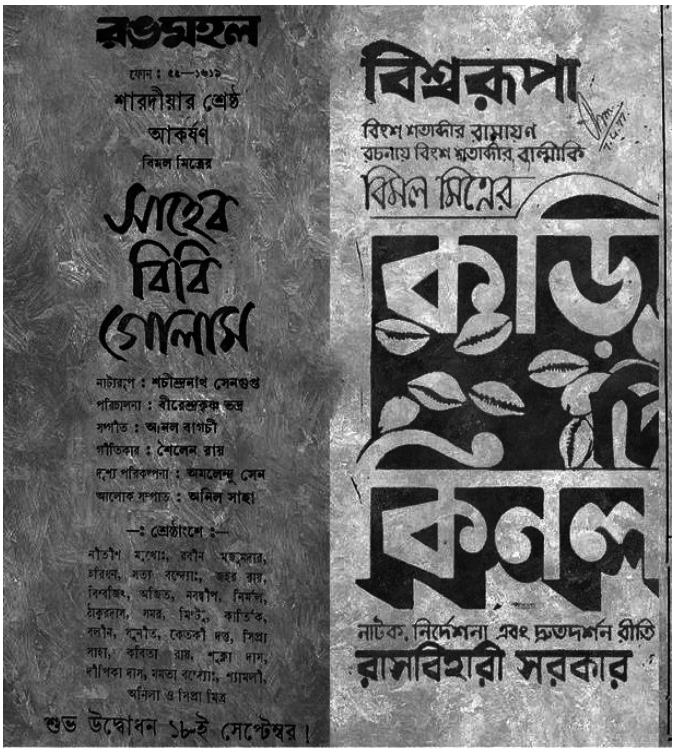

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই ছিলেন বাঙালি। জন্ম হল বাংলা নাটকের, বাংলা থিয়েটারের। মনে রাখতে হবে আমাদের, এই সেই সময় যখন পশ্চিমের জানলা দিয়ে বয়ে আসছিল ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির হাওয়া, যা এক তুমুল ঢেউ তুলল এদেশের সমাজজীবনেও। প্রথাগত ধ্যানধারণার বিপরীতমুখী ঝড় তুললেন রামমোহন রায়, ডিরোজিওর মতো মনীষীরা। একে একে প্রতিষ্ঠিত হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, হিন্দু কলেজ; ১৮১৮ সালে বাংলা সাময়িকপত্রের আবির্ভাব সূচিত করল এক নতুন যুগের—নবজাগরণ বা নবচেতনার যুগ। আবার অন্যদিকে, এই নব্য বাণিজ্যকেন্দ্র কলকাতায় তখন হঠাৎ হয়ে ওঠা বড়লোকদের রমরমা অবস্থা— মিত্র, বসাক, দেব প্রমুখেরা জন্ম দিচ্ছেন এক অভূতপূর্ব সংস্কৃতির, যাকে নাম দেওয়া হল বাবু কালচার। দেখা গেল ইংরেজি পঠনপাঠন আর ইংরেজি সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে ইংরেজদের তোষণ করার নিয়মিত লক্ষ্য। এঁরা স্বভাবতই বাঙালির নাট্যচর্চার মধ্যেও ঢুকে পড়লেন, কারণ এও যে এক অন্যতম মাধ্যম। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন চৌরঙ্গী থিয়েটার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন হিন্দু থিয়েটার, নবীনচন্দ্র বসুর হাতে প্রতিষ্ঠা পেল নাট্যশালা, শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব এগিয়ে এলেন, এগিয়ে এলেন বাবু দুর্গাচরণ দত্ত, জোড়াসাঁকো থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলেন প্যারীমোহন বসু। কিন্তু যেটা লক্ষ্যণীয় বিষয় তা হল এই মঞ্চগুলিতে অভিনীত হচ্ছে একের পর এক ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত নাটক, যার সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির কোনো যোগ নেই। দেখা গেল, কিছু ভদ্র শিক্ষিত হিন্দুযুবক অভিনয় করছেন

এবং আমন্ত্রিত হচ্ছেন বাবু সম্প্রদায় ও ইউরোপীয় বন্ধুজন, যেন বা শুধুই তাঁদের আনন্দ দেওয়া আর তুষ্ট করাই মূল লক্ষ্য হয়ে উঠল। ব্যতিক্রম নবীনচন্দ্র বসু, ১৮৩৫ সালের ৬ অক্টোবর তিনি বাংলায় মঞ্চস্থ করলেন ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' এবং লেবেদফের বেঙ্গলি থিয়েটারের মতো এখানেও মহিলারাই মহিলা চরিত্রে রূপদান করলেন। বাংলা নাট্যশালায় ইংরেজি নাটকের চাকচিক্যময় অভিনয় সাধারণ দর্শদের কাছে ক্রমাগত বিরক্তির কারণ হয়ে উঠছিল। শুরু হল সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। নন্দকুমার রায় অনূদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' প্রথম অভিনীত হল ১৮৫৭ সালে, মঞ্চস্থ হল রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' এবং 'নাটুকে রামনারায়ণ' এই সময়ের বাংলা থিয়েটারের এক দিকচিহ্ন বলা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের মতো বাংলা থিয়েটারেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। ১৮৫৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন বিদ্যোৎসাহিনী সভা, সেখান থেকে জন্ম নিল বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। এই মঞ্চে অভিনীত হতে লাগল 'বেণীসংহার', 'বিক্রমোবর্শী'র মতো নাটক, যেগুলি সেই সময়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রতিষ্ঠা করলেন বেলগাছিয়া নাট্যশালা; অভিনীত হল শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী'র মতো নাটক। এখানেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটির অভিনয় হয় ছয় বার। নাটকে দেখতে দেখতে দর্শকদের মধ্যে এক রুচির প্রসার দেখা যাচ্ছিল, তাঁরা ধীরে ধীরে বিচার করতে শুরু করলেন নাটকের বক্তব্য বা প্রেক্ষাপট। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে একটি চিঠিতে লিখছেন, এখানে দেশে নাট্যশালা ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠিতেছে। দুঃখের বিষয়, এগুলি বেশিদিন স্থায়ী হয় না। তবু এগুলি সুলক্ষণ বলিয়াই গণ্য করা উচিত; কারণ, ইহাদের দ্বারা বুঝায় যে, আমাদের মধ্যে নাটক সম্বন্ধে রুচির প্রসার হইতেছে। 'রুচির প্রসার' মানে শুধুই যে নাচগানের মোহনীয় অনুষ্ঠান নয়, তা যে সামাজিক ভাবনারও বিস্তার---- এই বোধ দর্শকদের মধ্যে দেখা যেতে লাগল। ১৮৫৯ সালে মেট্রোপলিটন

থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল উমেশচন্দ্র মিত্রের লেখা ‘বিধবাবিবাহ’ নাটক। বাংলা থিয়েটারে সমাজসচেতনার এ এক অন্যতম স্বাক্ষর বিশেষ। পর পর মঞ্চায়িত হতে লাগল রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘যেমন কর্ম তেমনি ফল’, ‘মালতিমাধব’, ‘চক্ষুদান’, ‘উভয় সংকট’ এর মতো সামাজিক নাটক। অভিনীত হল বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লেখা ‘নবনাটক’। ১৮৬৫ সালে মধুসূদনের লেখা প্রহসন ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ অভিনীত হল। এভাবেই একে একে মঞ্চস্থ হতে লাগল সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত প্রাসঙ্গিক কিছু নাটক---- ‘সতী’, ‘হরিশচন্দ্র’, ‘কিছু কিছু বুঝি’; দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ এবং ‘সধবার একাদশী’। দর্শক দেখলেন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের এক অদ্ভুত নাট্যচিত্র, যে নাট্যকারদের উদ্দেশ্য ছিল সচেতনতা বৃদ্ধি করা, সত্যকে সবার সামনে উদ্ঘাটিত করা--- তাঁরা সফলতা পেলেন।

২.

১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলা থিয়েটারের এক চিরস্মরণীয় দিন— প্রতিষ্ঠিত হল ন্যাশনাল থিয়েটার। বাংলা থিয়েটার প্রবেশ করল এক নতুন স্বর্ণময় যুগে। নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হল নাটক, নাট্যকর্মীরা, দর্শকেরা। ইংরেজের অপশাসন, জমিদারদের অবর্ণনীয় অত্যাচার, সামাজিক কুসংস্কার ও সাংস্কৃতিক বিকৃতি— এই সমস্ত কিছুকেই তীব্র আক্রমণে জর্জরিত করল বাংলা নাটক ও নাট্যশালা। রামনারায়ণ-দীনবন্ধুর সঙ্গে যোগ দিলেন অমৃতলাল বসু, শিশিরকুমার ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ দিকপালেরা। ১৮৭৩ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার ভাগ হয়ে যায়— একদিকে গিরিশচন্দ্র অন্যদিকে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। মধুসূদনের ইচ্ছানুসারে বেঙ্গল থিয়েটারে এলেন শ্যামা, গোলাপসুন্দরী, এলোকেশী এবং জগত্তারিণী— ‘অন্যসমাজ’ এর চার কন্যাকে অভিনেত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেও যোগ দিলেন কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী। অভিনীত হল ‘শত্রুসংহার’ নাটক, যেখানে দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণ হন বিনোদিনী দাসী। এখানে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, বাঙালির সংস্কারকে অস্বীকার করে বারাঙ্গনাদের থিয়েটারের জগতে প্রবেশাধিকার দিয়ে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা; দ্বিতীয়ত, কিছু নাটক তৎকালীন ইংরেজ শাসক দ্বারা নিষিদ্ধ করা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় কিছু ঘটনা, ‘সতী কি কলঙ্কিনী’ নাটক চলাকালীন পুলিশী হস্তক্ষেপ এবং অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় গে এপ্তার হলেন, ‘সুরেন্দ্রবিনোদিনী’ এবং ‘দি পুলিশ অফ পিগ এন্ড শিপ’ নাটকের অভিনয় অশ্লীলতার দায়ে নিষিদ্ধ করা হল— চালু হল ১৮৭৬ সালের নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন। যে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর দিকে দিকে মুখরিত হয়েছিল তার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা শুরু হল। এই সময়ে প্রায় তেইশটি নাটক নিষিদ্ধ করা হয়। ইংরেজরা শুধু অভিনয় বন্ধ করে, নাট্যকারদের গ্রেপ্তার করেই ক্ষান্ত হলেন না, বন্ধ হয়ে গেল বেশ কিছু মঞ্চও। ১৮৮৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ‘রাবণবধ’ নাটকের অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে এসে নিজস্ব এক নাট্যদল গঠন করলেন— অভিনয় মঞ্চ বেঙ্গল থিয়েটার এবং ওই বছরেই ব্যবসায়ী গুর্মুখ রায়ের সহায়তায় গিরিশচন্দ্র ও বিনোদিনী প্রতিষ্ঠা করলেন স্টার থিয়েটার। এই রঙ্গালয়ে গিরিশচন্দ্রের রচিত নাটক ‘চৈতন্যলীলা’য় বিনোদিনীর অভিনয় শ্রীরামকৃষ্ণের দেখতে আসার কথা তো ইতিহাস হয়ে গেছে। গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনাকাল ১৮৭৭ থেকে ১৯১১। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষের মর্মে মর্মে ধর্ম। তবে, এও আমরা দেখেছি, পরবর্তী কালে ধর্মাশ্রয়ী নাটক ছাড়াও তিনি সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকও লিখেছেন—

'প্রফুল্ল', 'বলিদান' প্রভৃতি উল্লেখ্য। নাট্যরচনা বা অভিনয়ের পথ নির্মাণ করতে গিয়ে গিরিশচন্দ্রকে অনেক সময়েই তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হতে দেখা গেছে। তিনি লিখছেন, ব্যবসায়ে (থিয়েটার) কৃতকার্য না হলে আমার হাতপা বাঁধা। বেশিরভাগ লোক (দর্শক) যায় নাচ দেখতে, গান শুনতে। থিয়েটারে নাটক দেখতে খুব কম লোকই যায়। যদিও নাট্যকার হিসাবে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক লিখে গিরিশচন্দ্রের নাট্য প্রতিভার বিকাশ এবং নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ অবশ্যই এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলা থিয়েটারের পটপরিবর্তনের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে বাঙালির মনে।

৩.

যদি এই ভাবে ভাবা যায় বা ব্যাখ্যা করা যায়— গিরিশচন্দ্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল কারণ জনরুচির কাছে আত্মসমর্পণ, তবে হয়তো ভুল বলা হবে না। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সেই সময়ে প্রয়োজন ছিল আত্মআবিষ্কারের, যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আত্মরক্ষার নামান্তর। সেই আত্মআবিষ্কারে সচেষ্ট হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে এক নব্য থিয়েটারের জন্ম হল। বলা যেতে পারে, অপেশাদার থিয়েটার তাঁর হাতেই পরীক্ষানিরীক্ষার ক্ষেত্র তৈরি করার সুযোগ পেয়েছিল। আজ্ঞ জকে, এই যুগে, আমরা যে সমান্তরাল বা বলা ভালো অবাণিজ্যিক থিয়েটার নিয়ে গর্ব করি, তার সূচনাপর্ব যেন রবীন্দ্রনাথই করে দিলেন। এই সমান্তরাল থিয়েটার অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ১৮৮২ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই ৫৭ বছরের সময়কালে তিনি মোট ২৯টি নিজের লেখা নাটকের পরিচালনা এবং চরিত্রাভিনয়ে নিজেকে উপস্থিত রেখেছিলেন। পেশাদারি মঞ্চেও এই রবীন্দ্রনাটক অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিল। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত তাঁর ১৩টি মূল নাটক এবং ৮টি গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ পেশাদার মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। যার মধ্যে তিনটি নাটক — 'চিরকুমার সভা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও 'শেষরক্ষা' বেশিবার অভিনীত হয়। নাটক লেখা বা অভিনয় করা ছাড়াও বাংলা থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান— মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চমুক্তি। ইংরেজি অনুকরণে মঞ্চসজ্জা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় এক নতুনতর পরিবেশ রচনা করলেন তিনি, এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ১৯১৬ সালে 'ফাল্গুনী' নাটকটির প্রযোজনা। অন্যদিকে, মঞ্চব্যবস্থায় দর্শক এবং অভিনেতাদের মধ্যে যেদূরত্ব বা ব্যবধান রাখা হত, তাও তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন— 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'তে এই সচেতন প্রয়াস আমরা দেখতে পাই। বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য যাত্রাকে তিনি থিয়েটারের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আর ঠিক এই কথাই উচ্চারিত হল শিশিরকুমার ভাদুড়ির কণ্ঠে ১৯৪১ সালে, থিয়েটারকে মঞ্চের বাঁধনে না রেখে তাকে ব্যাপকতর মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।

বাংলা থিয়েটারের তৃতীয় পর্বের সূচনা এক অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে। সমগ্র তিরিশের দশকই ছিল সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের কাল। কিন্তু, আমরা আলোচনা প্রথম দুই পর্ব অবধিই সীমিত রাখব। এই ইতিহাস নব্য থিয়েটারকে বুঝতে সাহায্য করবে— এই আশা রাখি।

ফোবিয়া

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

আমার সকালের ঘুম প্রথমেই ভেঙে যায় পাম্প চালানোর শব্দে। বাড়িওয়ালি মাসিমাই চালান, কখনো-সখনো মা। চোখের পাতা খুলেই সামনে দেয়ালের ঘড়িতে দেখি— সাতটা কুড়ি। সঙ্গে সঙ্গেই উঠি না। পাম্পের একটানা শোঁ শোঁ, গোঁ গোঁ শুনতে শুনতে ঝিম্ লাগে। না বিছানা আমায় ছাড়ে, না আমি বিছানাকে। আরও দশটা মিনিট এপাশ ওপাশ গড়াই। তারপর ফুটবল গ্রাউন্ডের রেফারির শেষ বাঁশিটার মতোই মা যখন চ্যাঁচায়, ঋক! উঠে পড় এবার, সাড়ে সাতটা বাজে! তখন চাদরটা সরিয়ে দলা পাকাই। তার সঙ্গে জড়ো করে ফেলি কিছুতে না ছাড়তে চাওয়া আলিস্যিটাকে। বালিশের সঙ্গে গুটিয়ে এককোণে পড়ে থাকে আমার প্রতিরাতের শেষ ঘুম। শুরু হয় প্রতিদিনের বাঁচার লড়াই।

রোজ যেমন হয়, আজও ঠিক সেরকমটাই হওয়ার কথা ছিল, অথচ হল না...আমার ঘুম ভাঙার সঙ্গে ঘড়ির কাঁটা এবং জলের চাহিদার একটা সরল সম্পর্ক আছে। কিন্তু দুটোই বড়ো একঘেয়ে, রুটিনের মতো এক সূত্রে বাঁধা। কিন্তু আজ যেন কোথাও কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। চোখের পাতাদুটো খুলতে চেষ্টা করছি, খুলছে না! যেন আঠার মতো জড়ানো। সাতটা কুড়িতেও ঘরে এত অন্ধকার! জানলার ঘষা কাচটাও মাঝরাতের মতো চিকন কালো। অথচ ঘুমের ঘোরে পাম্পের শব্দটা একটু আগেও যেন স্পষ্ট শুনছিলাম। ভোরের আলো এখনও ফোটেনি, তাহলে পাম্প চালাল কে?

ঘরে একটিমাত্র তক্তাপোশে মা শোয়। আমার বিছানাটা নীচে মেঝেতে। চাদরটা দুহাতে টেনে পাশ ফেরবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। মাথায় অসহ্য ভার। শরীরটাও তেমনি ভারী।

একবার মনে হল কারা যেন কথা বলছে বারান্দায়। নীচু গলায়, খুব চুপিচুপি। কান পাতি। গলাটা বাড়িওয়ালি মাসিমার। বলছিল, সকালে এমন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে দেখেই ভাবলাম, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। আপনি ডাকেননি একবারও?

এবার উত্তরে মায়ের গলা পেলাম, ডাকিনি আবার? কতবার ডাকলাম! নাড়া দিলাম। হুঁ হাঁ করে বারবার চোখ বুঁজে ফেলছে। কাল শোওয়ার সময় বলছিল শরীরটা ভালো নেই। ভাবলাম থাক, ঘুমুচ্ছে ঘুমোক। কিন্তু এখন যে দেখছি আস্তে আস্তে কেমন সবুজ হয়ে যাচ্ছে... কী করি বলুন তো দিদি! আমার যে কিচ্ছু মাথায় আসছে না!

মায়ের গলায় টলোমলো করছে উদ্বেগ। শেষ কথাগুলো পাশের কারো এলোমেলো কথায় চাপা পড়ে গেল। তার মানে এই মাঝরাত্তিরেই মায়ের ঘুম ভেঙে গেছে! কিন্তু কীসব আবোল তাবোল বকছে মা! সবুজ হয়ে যাচ্ছে মানে! কে সবুজ হয়ে যাচ্ছে? আমি?

—একটু চা হবে মা?

যতটা সম্ভব চেঁচিয়ে বললাম। সাড়া পেলাম না। শুধু দরজাটা একবার একটু ফাঁক হল।

আরে বাঃ! ঘরের বাইরে তো দিব্যি সকালের আলো। তাহলে ঘরে এত অন্ধকার কীসের? আমি চোখ খুলতে পারছি না বলেই? নাকি মনের ভুল! আসলে এখনও বোধহয় সকাল হয়নি!

যাই হোক এখন এক কাপ চা খুব দরকার। মাথাটা বালিশের সঙ্গে চিপকে আছে যেন! আবছা মনে পড়ছে কাল রাতের কথা। হাত মুখ ধুয়ে এসে সেই যে বিছানা নিয়েছিলাম, উঠতে ইচ্ছে করছিল না। খেতে ডেকেছিল মা। মুখ থেকে চাদর সরিয়ে কপালে ছোঁক করে ঠান্ডা হাতটা ছুঁইয়ে বলেছিল, জ্বর নাকি রে! দেখি দেখি, হাত সরা! কপালে গালে এগুলো কীসের দাগ?

তখনই শুধু একবার আয়না দেখেছিলাম। চাপা কালশিটে টাইপের হালকা ছোপ ছোপ দাগ। খুব আবছা, তবে ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছলেও সে দাগ উঠতে চাইছিল না। চুপচাপ চাদরটা মুড়ি দিয়ে ঢেকে ফেলেছিলাম নিজেকে। তারপর...মাঝরাতে শুধু আর একটি বার উঠেছিলাম, বোধহয় রাত দুটোর কাছাকাছি। বাথরুমে যাব বলে। টলছিলাম। গলার কাছটায় ব্যথা। জড়িয়ে যাচ্ছিল পায়ের প্রত্যেকটা স্টেপ্। ফিরে এসে ফোনটা চার্জে বসিয়ে সেই যে বিছানা নিয়েছি, আর উঠিনি। তলিয়ে গেছি অতল ঘুমে। এখনও সে ঘুম ভাঙেনি!

অথচ পরিষ্কার জেগেই আছি। ঢোঁক গিলতে পারছি না। গলার কাছটা শুকনো। মনে হচ্ছে কণ্ঠনালি থেকে পেটের ভেতর দিয়ে পা পর্যন্ত কিছু একটা নেমে চলে গেছে, বিঁধে রয়েছে পায়ের পাতা অবধি। একটু নড়াচড়া করলেই ফুটে যাবে শরীরের আনাচেকানাচে।

দরজা খুলে গেল। আমিও চোখ খুলে তাকালাম। আর এই প্রথম, মাকে লক্ষ করে আমার চমকে যাওয়া!

আড়ষ্ট দাঁড়িয়ে মা। হাতে ডিশের ওপর চায়ের কাপটা ঠকাঠক্ কাঁপছে। চোখ দুটো বিস্ময়ে গোল্লা গোল্লা, পলক পড়ছে না। ঠিক তার পাশেই একইরকমভাবে আরও কয়েকজোড়া চোখ পলকহীন দেখছে আমায়।

কাপ-ডিশ পড়ে গেল মায়ের হাত থেকে, চা চলকে ছড়িয়ে ভেঙে ধপ্ করে সিঁড়িতে বসে পড়ল মা। অস্ফুট শব্দ, দেখেছেন দিদি? ছেলেটাকে দেখেছেন!

প্রায় একই সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলেন বাড়িওয়ালি মাসিমা। উমাগো! এ কী কাণ্ড! এ যে পুরো গাছ হয়ে গেছে!

কথাটা এতটাই অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য যে, মনে হল এইবার আচমকা ঘুমটা ভেঙে যাবে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসব। দেখব চারপাশের সবকিছুই দিব্যি আগেকার মতোই আছে। যেমন সাধারণত স্বপ্নে হয় আর কী!

শুয়ে শুয়েই মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকি। বোঝার চেষ্টা করি, সত্যিই আমি তাকিয়ে রয়েছি কিনা। আশ্চর্য! এর পরেও নতুন করে ঘুম ভাঙার কোনো সুযোগ থাকতে পারে কি?

উঠোনের কাছে দু-চারজন প্রতিবেশী। গলিতে আরও কিছু লোক। উঁকিঝুঁকি, মুখ চাওয়াচাওয়ি, ফিসফাস্...ওনারাও নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে নেই! যা দেখছেন, বিশ্বাস করতে পারছেন না বলেই অমন ড্যাব ড্যাব করে দেখছেন। কান থেকে কানে ভেসে ভেসে ওঁদের দেখার খবরটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পাড়ার মোড় পর্যন্ত পৌঁছেও গেছে। কলোনি পাড়ায় ঘেঁষাঘেঁষি ঘর। এ বাড়ির জানলা থেকে ওবাড়ির

চাতাল দেখা যায়। পীরিতে-ঝগড়ায় আদান-প্রদান মাখামাখি। তার ওপর এমন একটা অতি অদ্ভুত ঘটনা! সে কি চেপে রাখা যায়? ব্যাপারটা কতক্ষণ চলত বলা যায় না, এমন সময়ে হঠাৎ-ই সবাইকে ঠেলেঠুলে হন্তদন্ত হয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল আমাদের পাড়ার লিটনদা, কী হয়েছে? দেখি দেখি, আরে এমন ভিড় করলে চলে? সরো সরো, সরে যাও সব...

ডুবন্ত মানুষের খড়কুটোও ভরসা। লিটনদা এখন আমাদের কাছে ঠিক তাই। লিটনদাকে খুব একটা মানে না কেউ। একটু আঙ্গু ধপাগলাটে ধরনের। কলেজের ম্যাগাজিনে বিশ্ব সাহিত্য নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে ফ্রানৎজ্ কাফকার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে প্রফেসরদের তাক লাগিয়ে দেওয়া সেই তরতাজা ছেলেটার কেন আজকাল এমন দশা, তা সঠিক জানে না কেউ। যেকোনো দিন সাতসকালে সেলিমপুর ব্রিজের মুখে ঢলা বারমুডা আর জংলাপ্রিন্ট শার্টপরা এই ছেলেটাকে দেখলে মনে হবে আধখ্যাপা আলাভোলা কেউ বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। দুপ্রান্তে পাল্লা দিয়ে আসে—যায় ফুলস্পিডে যানবাহন। ফুটপাথ থেকে রাস্তা পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লিটন ওরফে শুভ্রদীপ চ্যাটার্জি। তখন হয়তো তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের আশ্চর্য কোনো থিয়োরির প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগের সম্ভাব্য চিন্তা! যা হলেও হতে পারে, কিন্তু কেন হয় না, অথবা হলেই বা কী হয় সেসব ভাবতে গিয়ে সত্যি সত্যিই চেনা রাস্তাগুলো ওলটপালট হয়ে যেতে থাকে। পথভুলো ছেলেটাকে ঘিরে ধরে আশ্চর্য সুরেলা কোনো মিউজিক্যাল ভাইব। তার মধ্যেই ভাসতে ভাসতে সে অজান্তেই ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু অতশত আর বোঝে কজন? সে কারণেই তাকে ঘিরে পাড়ায় একটা বদনাম রটে গেছে। লিটনদা সাতসকালে, অনেক সময় মাঝরাত্তিরেও লাউড স্পিকারে মিউজিক চালায়। সেসব অদ্ভুত মিউজিক পিয়ানো, স্যাক্সোফোন তাতে নাকি পূর্ণিমার জোছনা রাতে মাটিতে চাঁদ নেমে আসে!

তো সেই লিটনদা যখন আমাদের ছোট্ট খোলা উঠোনটায় পা রাখল, অনেকেরই নজর আমার দিক থেকে একটু হলেও সরল বই-কি! অস্বস্তির পিঠে আরএকটা অস্বস্তি চাপলে যেমন হয়। কাউকে পাত্তাটি না দিয়ে সোজা আমাদের দরজার কাছে উঠে এল লিটনদা। এসেই আলটপকা প্রশ্ন ছুঁড়ল, কখন থেকে চলছে এসব? প্রশ্নটা যদিও ইনডাইরেক্টলি মা এবং বাড়িওয়ালি মাসিমাকেই করা, অথচ সাড়া দেওয়ার মতো অবস্থাটাও কারোর নেই। সেই সুযোগে উঠোন থেকে গলা চড়িয়ে দু-একজন নিজেদের মধ্যে বলা-কওয়া শুরু করে দিয়েছে। কে এসে এই অদ্ভুত 'আমি'টাকে সবার প্রথমে চোখে দেখেছে, তাই নিয়ে ছোটোখাটো বচসা। তক্কাতক্কি।

বাজারে যাচ্ছিলুম বুঝলেন? মহিলার চিৎকার শুনে ছুট্টে এলুম। হঃ! আর তোমারে খবর দিল কেডায়? আমি তো কলপাড়ে বইয়্যা বইয়্যা পুরা ঘটনাটাই দ্যাখতাসি! তহনই মনে মনে কই কি, পোলার গতিক তো ভাল দেহি না! তাইতে পাঁচজনারে জানান দেই...কও, দেই নাই?

থামুন তো আপনারা? লিটনদা ঘরের রোয়াক থেকেই চ্যাঁচাল, খামোখা কাঁওতালি করবেন না। অ্যাতোক্ষণেও একটা ডাক্তার ডাকার কথা কারোর মনে হল না! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন, লজ্জা করে না আপনাদের?

দমকা হাওয়ার মতোই কথাগুলো আছড়ে পড়ল ভিড়ে। নড়েচড়ে উঠলেন প্রায় সকলেই। দু-চারজন সরেও পড়লেন বোধহয়। হ, আমাগো আর কামকাজ কিস্যু নাই!

ফুট কাটল কেউ তুমি ডেকে আনলেই তো পারো লিটন, মুরুব্বিগিরির শখ তো তোমার কম নয়!

লিটনদা কান দিল না। সোজা চলে এল ঘরে। একেবারে আমার সামনাসামনি। দেখছে। আমিও দেখতে পাচ্ছি্ ওর কপালে পরপর খেলে যাওয়া ভাঁজগুলো। চিবুকে হাত রেখে বারদুয়েক ঠোঁট কামড়াল লিটনদা, কী করে হল রে?

এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। এবার মনে হল আমিও কথা বলতে পারি। আসলে চোখ খোলবার পর থেকেই যা সব চলছে তাতে কথা বলা না-বলা দুইই সমান। প্রশ্নটা আমার মুখে এসে গেল, আমার ঠিক কী হয়েছে লিটনদা? একটু বলবে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

ওহো, তাও তো ঠিক। দাঁড়া দেখাচ্ছি...

লিটনদা তাড়াতাড়ি গিয়ে বাথরুমের পাশে ঝোলানো আয়নাটা খুলে আনল। শুয়ে থাকা আমার মুখের ঠিক সামনে মেলে ধরল দুহাতে। নিজের চোখকে আমি যেন নিজেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না!

যদিও প্রথম নজরে ব্যাপারটা তেমন কিছু চমকানোর মতো নয়। পুকুরের পরিষ্কার জলে পানা পড়তে দেখেছেন কেউ? আমারও সারামুখে তেমনি কচি সবুজ গুঁড়ি গুঁড়ি পাতার ঘন সরের মতো আস্তরণ। ঠিক যেন সদ্য পানাপুকুরে ডুব দিয়ে এইমাত্র উঠেছি। জল ঢেলে দিলেই ওগুলো সরে যাবে। কিন্তু না, আঙুল ছোঁয়াল লিটনদা। নখ দিয়ে বেশ করে খোঁটারও চেষ্টা করল একটু। পাতার গুঁড়িগুলো এঁটে বসে আছে চামড়ায়। মাথায়, চুলের ফাঁকফোকর থেকেও বেরিয়ে এসেছে ছোটো ছোটো কিছু শিস। চোখ আর ঠোঁটদুটোই শুধু যা চাপা পড়েনি। কিন্তু এতক্ষণে বুঝতে পারছি কেন চোখের পাতাদুটো অসম্ভব ভারী, আর ঠোঁট ফাঁক করতে কেন এতখানি কষ্ট হচ্ছে।

লিটনদা আমার পাশেই মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে, বল তো

এবার, কী করে এসব হল!
আমি মাথা নাড়াবার চেষ্টা করি। অস্ফুটে বলি, জানি না।
এমন কোথাও গিয়েছিলি কি! মানে এমন কোনো জায়গা, যেখানে প্রচুর গাছপালা আছে! মানে, আমি বলতে চাইছি...আচ্ছা তুই কি বুঝতে পারছিস, আমি কী বলতে চাইছি?
আবারও কষ্ট করে দুদিকে মাথা হেলানোর চেষ্টা করতে হয়। লিটনদা নিজেও কি ছাই বুঝতে পারছে ঠিক কী বলতে চায়? শুধু কপালের ওই ভাঁজগুলো ছাড়া আর তো কিছুই নেই এসব তালগোল কথায়। তবু ঢোঁক গিলে, চোখের চাউনি যতটা সম্ভব স্থির শান্ত রেখে বোঝানোর চেষ্টা করে, আমি বলতে চাইছি, এমন কোনো গার্ডেন বা অজানা কোনো জায়গা, যেখানে চট্ করে কেউ কখনো যায় না, তুই সেরকম কোথাও গেছিলি কি? মনে করে দ্যাখ!
কথাগুলোর উদ্দেশ্য এখনও পরিষ্কার না হলেও হঠাৎ আমার মাথায় ঝিলিক দিয়ে গেল একটা নাম—তিতির। তিতিরের কাছেই তো গিয়েছিলাম, তিতিরের সঙ্গেই গিয়েছিলাম রহস্যে ঘেরা আশ্চর্য সেই জায়গাটায়, কী যেন নাম...হ্যাঁ... 'ঝিলমিল টাউন ফরেস্ট'। তিতিরই বলেছিল নামটা!

কিন্তু আমি যে তিতিরের সঙ্গে ওই জায়গায় গিয়েছিলাম সেটা এই মুহূর্তে লিটনদাকে অন্তত বলা যায় না। আধপাগল ওই ছেলেটা যে তিতিরকে ভালোবাসে, আর জন্তুর মতোই ওকে পাওয়ার জন্য একসময়ে মরিয়া ছিল সেটা তো আমি জানি! সুতরাং গত পরশু রাতের ঘটনার কথা ওকে সরাসরি বলি-ই বা কী করে? আমার আধবোজা চোখের সামনে ভেসে উঠল গত পরশু, এমনকি কাল রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা। জানি না সেগুলো কতটা কল্পনা, কতটাই বা ঘটেছিল! ঠিক স্পষ্ট নয়, কিছুটা জলছবির মতো সেসব সাজানো। এখনও আবছা চোখে ভাসছে—
আমার সামনে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল তিতির। শহরের বুকে এমন একটুকরো সবুজঘেরা গোল চত্বর, রামকৃষ্ণ মিশনটাকে বাঁ-হাতে ফেলে ঢুকতে গিয়েই বুঝতে পারছিলাম, আরে এ তো চেনা জায়গা! যদিও আমি একলা কখনো আসিনি। বন্ধুদের সঙ্গে একবার কি দুবার! আমার বন্ধুই বা আর কজন! নেইই বলতে গেলে। বড়ো হয়ে ওঠার মুহূর্তগুলোয় ক্রমশ একলা হয়ে যাওয়া আমি, হাঁটছিলাম তিতিরকে অনুসরণ করে। আমার মিষ্টি সিক্সটিন, এই একমাত্র বান্ধবীটাই যেন অচেনা এই পৃথিবীতে আমার একমাত্র গাইড।
সেই তিতির, আমাদের বড়ো হয়ে ওঠা দিনগুলোয়, বিশেষ একটা বর্ষার দিনে আমার পাশে দাঁড়িয়ে দু-হাত ছড়িয়ে বৃষ্টি মাখত...
আমারও ইচ্ছে করত ওর সঙ্গে দাহড়িয়ে দু-হাত ছাড়াই। পারতাম না... বার বার কেন যে আমি আমার ছোট্টবেলায় ফিরে যাই!
ছোট্ট আমি যেদিন মায়ের হাত ধরে তিতিরদের বাড়ির পাশে ভাড়া থাকতে এলাম...সঙ্গে বাবা নেই দেখে সেদিন বাড়িওয়ালি মাসিমার সঙ্গে মায়ের অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। সেসব কথা আঙ্গুমার মনে নেই। তবে বাবার না-থাকাটা যে চারপাশের মানুষজনের কাছে বিরাট এক প্রশ্ন, এটা সেই সময়েই বুঝেছিলাম।
বাবা নেই মানে, বাবা মারা যায়নি। বেঁচে আছে কিনা তা-ও জানতাম না। বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল। মা আয়ার চাকরি করে বড়ো করে তুলছিল আমায়...। হাতের শেষ গয়না, সোনাবাঁধানো নোয়াটাও যেদিন মাকে বিক্রি করতে হল, সেদিন লুকিয়ে কেঁদেছিল মা...
'ঝিলমিল টাউন ফরেস্ট'। তিতিরের দেওয়া নাম! তিতির এমন করেই চেনা জায়গার অজানা নাম দিতে পারত। যদিও তিতির আমায় বলছিল, এই নামটা ওর দেওয়া নয়। এখানে একলা সে কোনোদিনও আসেইনি। আসার কথাও নয়! এই জায়গার নামটা লিটনদার দেওয়া।
লিটনদা! কিন্তু তুই এখানে কবে এলি লিটনদার সঙ্গে? কীভাবে এলি?
জানি না ঋক, কীভাবে, কেমন করে, কবে কিচ্ছু জানি না আমি। লিটনদা বলেছিল আমায় নার্সিসাস দেখাবে।
নার্সিসাস!
হ্যাঁ, নার্সিসাস! সে এক অদ্ভুত গাছ! আমি বাবার ডায়েরিতে পড়েছিলাম।
দু-পাশে সবুজ ঘন হচ্ছিল। ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছিল সেইদিন, সেই আমাদের ছোটোবেলারই মতো। বৃষ্টির জলের ছাঁটে গাছের সবুজ পাতাদের আরও ঘন সবুজ মনে হয়। গাছেরা বৃষ্টিতে ভিজছে! ভিজতে ভিজতে হেঁটে চলেছিল তিতির...

আমি হাঁটতে হাঁটতে খুব গুটিসুটি মেরে লক্ষ করছিলাম----গাছেদের নীচে নীচে মোজেইক করা সিমেন্টের বেঞ্চগুলোয় জোড়া জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাদের পর পর জুড়ে আসা মাথাগুলো... বইয়ে পড়া ইভ-আদমের মতোই, এই পুরুষ আর নারীরা সব্বাই যেন আজ এইমাত্র স্বর্গ থেকে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসেছে! কড়াৎ করে বাজ পড়েছিল কাছেই... পিছন থেকে আমি, আর সামনে থেকে আচমকা পিছন ঘুরে তিতির, একসঙ্গে পরস্পরের হাত ধরে ফেললাম শক্ত মুঠোয়। শব্দ হবার আগেই তীব্র আলোর ঝলকানি ছেয়ে দিয়েছিল দুজনেরই চোখমুখ, এখন শব্দটার সঙ্গে একটা তীব্র কাঁপুনিও শরীরের ভেতর সামলে নিলাম দু-জনেই।

পা থমকালেও, আমাদের হাঁটা থামেনি। তিতির দ্রুতপায়ে হাঁটতে হাঁটতেই বলে চলেছিল নার্সিসাস নামের এক অদ্ভুত গাছের কাহিনি---

নদীদেবতা সিফিসাস এবং জলপরি লিরিউপির পুত্র নার্সিসাসের চোখ ঝলসানো রূপের অহংকার, আত্মমগ্ন হয়ে চারপাশের সবাইকে তাচ্ছিল্য করার অভিশাপ একদিন হাতেনাতে ফলল। সকলেরই ভয়---নিজের চেহারা যেন ভুল করেও সে নিজে না দেখতে পায়! আর হলও ঠিক তাই। একদিন জলের ওপর প্রতিবিম্বে নিজের চেহারা দেখে চোখ আটকে গেল চুম্বকের মতো! নিজেরই প্রেমে পড়ে, নার্সিসাস ভুলে গেল চারপাশের সবকিছুকে, সবাইকে, দিন-মাস-বছর গড়িয়ে সে হয়ে গেল পাথরের মতো স্থবির এক মর্মর মূর্তি। তার সমাধির ওপরে ফুলে ফুলে পল্লবিত হয়ে ফুটে উঠল এক আশ্চর্য সুন্দর গাছ---নার্সিসাস!

কিন্তু শুনেছি, সেই ফুল তো ড্যাফোডিল! সে ফুল আমাদের এখানে আসবে কোথায়? অথচ তিতিরকে নার্সিসাস দেখাবে বলে এই পার্কেই নিয়ে এসেছিল লিটনদা।

দেখেছিলি নাকি তুই? সেই ফুল?

আমার ঠিক মনে নেই। সবকিছু কেমন আবছা লেগেছিল। আর এই পিঠের এই ডানার কাছটায় ব্যথা করছিল খুব!

কই দেখি দেখি! আমাকে দেখিয়েছিল তিতির, পিঠের বাঁদিকে একটু ওপরে কাঁধের কাছটায় একটা লালচে মতো ক্ষতচিহ্নের দাগ। যেন আলগোছে ধারালো কোনো দাঁত বসাতে গিয়েছিল কেউ!

আমার খুব ভয় করছে। এইসব গাছেদের অদ্ভুত শক্তি থাকে। মায়ের মামারবাড়ির মফস্সলে এমনই এক গাছ ছিল, যেখানে গেলে সবার সব মনের ইচ্ছে পূরণ হয়ে যেত। তিতির আরো কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। লেকের পাড়ে ঝোপের কাছে তখন ছিল আরো গাঢ় অন্ধকার। সেদিকেই হাত বাড়িয়ে কী যেন মেলানোর চেষ্টা করছিল তিতির। হঠাৎ মোহাবিষ্টের মতো দুদিকে হাত ছড়িয়ে দিল ডানার মতো! দু-বার বুক ভরে শ্বাস টানল বড়ো করে। ও কি নিজের কোনো ইচ্ছেপূরণ করতে চাইছে? বুঝতে পারছিলাম না শুধু দেখছিলাম ওর বাঁদিকের ডানা চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। আমার পায়ের নীচেও কেমন যেন টান লাগল! মাটির খুব তলা থেকে কেউ যেন শিকড়ে জড়িয়ে পা দুটোকে নীচের দিকে টানছে! টান লাগছিল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরায়! তারপর সব অন্ধকার...

কী রে, কিছু মনে করতে পারলি ঋক? তুই কি এমন কোথাও গিয়েছিলি, যেখানে সচরাচর কেউ যায় না!

প্রশ্নটা নাগাড়ে করে চলেছে লিটনদা। আমার কাঠের মতো শরীরটায় বার দুই ঝাঁকুনিও অনুভব করলাম। লিটনদা ঝুঁকে পড়েছে। লক্ষ করলাম ওর দাঁত থেকে ঠোঁটের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ঘন মেরুন রঙের তরলের মতো একটা কিছু!

আমি ওর প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ফিসফিস করে বলি, 'ঝিলমিল টাউন ফরেস্ট। জায়গার নামটা তো তোমারই দেওয়া, তাই না?

প্রশ্নটা শোনামাত্র আমার কাঁধে ধরা লিটনদার হাতদুটো একটু শিথিল হয়ে যায়। সেখানেই মেঝের কাছে উবু হয়ে বসে পড়ে হাঁটু মুড়ে। ওর কানের কাছে, আর দুই বাহুর আঢাকা জায়গায় ঘন লোম। তাকে দেখে আমার ভয় আরো বাড়ছে। মনে হচ্ছে, যেন এক্ষুনি একটা বিকট চিৎকারে পাড়া কাঁপিয়ে লিটনদা কেঁদে উঠবে...

ওদিকে বারান্দায় ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। মুখ না-ফিরিয়েও আন্দাজ করতে পারছি মায়ের উদপ্রাপ্ত চেহারা, বাড়িওয়ালি মাসিমার শুকিয়ে যাওয়া মুখ। পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে এখনও যারা দাঁড়িয়ে, তাদের প্রত্যেকের সরু পিন্ খোঁজার মতো টনটনে চোখের দৃষ্টি। কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। আমিও না। একমাত্র লিটনদাই শুধু ওর আধপাগল চোখ দিয়ে কিছু একটা বোঝবার চেষ্টা করে যাচ্ছে সমানে...

যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে নটার ঘরে। বাইরে উজ্জ্বল বসন্ত সকালের চিকমিকি রোদ। এখন আর হাজার চেষ্টা করলেও অবিশ্বাস করা যায় না— আমি একটু একটু করে গাছ হয়ে যাচ্ছি।

ফিরে পাওয়া জীবন

বাবলু সাহা

লেখা শুরুরও একটি শুরু থাকে। প্রথমেই সেটি বলে নিই। আশা রাখি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘাটবে না।

শেষবার কোনো বড়োসড়ো ট্রেক তৎসহ লম্বা ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম সেই ২০১৯-'২০ সালে হিমাচল প্রদেশের বেশ কিছু চেনা-অচেনা রাস্তায়। তারপর দীর্ঘ সময় করোনা আবহের কারণে প্রায় ঘরবন্দি ছিলাম। এর মধ্যে হঠাৎ করে একেবারে শেষের দিকে যাওয়ার মুখেই আমি ওমিক্রন আক্রান্ত হলাম। এরপর গত ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার লাংসে ধরা পড়ল এমফিসেমা এবং হাইপার ইনফ্ল্যাটেড লাংস (সি ও পি ডি)। সেই থেকে প্রায় ৬-৭ বার হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়েছিল আমাকে এবং ফলস্বরূপ বারবার নতুন গন্তব্য ঠিক করেও শেষ মুহূর্তে বাতিল করতে হয়েছে।

এ বছরের জানুয়ারি মাস থেকে মোটামুটি কিছুটা সুস্থ হই। তখন থেকেই মাথায় ঘুরছিল যে, সামনের এপ্রিল মাসেই একাই গিয়ে কোনো এক নতুন জায়গা, যেখানে এখনো কোনো সমতলের মানুষ ট্রেক করেননি, সেরকম কোনো আঙ্গ পাত—দুর্গম রাস্তায় গিয়ে ট্রেক করার। এক্ষেত্রে অনেকেই হয়তো ভাববেন যে, হয় আমি উন্মাদ বা গোঁয়ার। নয়তো এ আমার হঠকারি সিদ্ধান্ত এবং অনেক সুহৃদ বন্ধুই আমাকে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, এত তাড়াতাড়ি না যেতে, তার উপরে আবার সম্পূর্ণভাবে একা। আমি তাঁদের কীভাবে বোঝাই যে, একা অ্যাডভেঞ্চার করতে যাওয়ার স্বাধীনতা কোথায়! নিজের ইচ্ছে বা স্বাধীনমতো যেখানে মন চায় ঘুরে বেড়ানো, সময় আর ধৈর্য নিয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার, আঙ্গ রও কত কী!

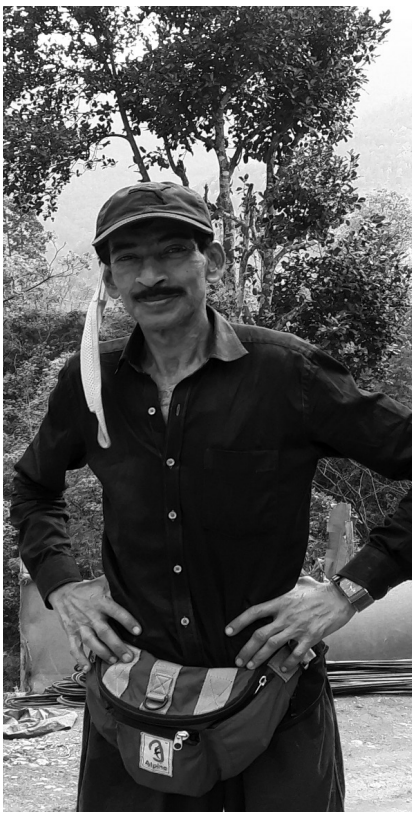

যাওয়ার শুরু

১ এপ্রিল সন্ধ্যায় কাঁধে ভারী স্যাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরে নিয়ে সোজা

শিয়ালদা স্টেশন। সেখানে গিয়ে কাউন্টার থেকে এন জে পি যাওয়ার জেনারেল টিকিট কেটে অপেক্ষারত দার্জিলিং মেলের জেনারেল কামরায় জানলার পাশের সিঙ্গেল সিটে নিশ্চিত হয়ে বসলাম।

পরের দিন মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে হঠাৎ ছুটি ঘোষণা করায়, জেনারেল কামরা সেদিন প্রায় একরকম ফাঁকাই ছিল। পরেরদিন সকালবেলায় এন জে পি নেমেই, সময় নষ্ট না করে, একেবারে সিকিম জিপস্ট্যান্ডে গিয়ে জোরথাং-এর শেয়ার জিপে চেপে বসি। ব্রেকফাস্ট করার আর সুযোগ পাইনি। সঙ্গের ড্রাই ফুড স্যাকের ভিতরে থাকা অবস্থায় জিপের উপরেই রয়ে গেল।

যাত্রা পর্ব

অবশেষে শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি ছেড়ে, সেবক রোড ধরে কিছুক্ষণ এগোনোর পরই রাস্তার দুপাশের দৃশ্যপট বদলে যেতে লাগল।

ঘন গাছের সারি, বুনো ঝিঁঝিঁ পোকার সুতীব্র কলরব। সেবক ব্রিজ পার হতেই, রাস্তার ডান ধার ধরে খরস্রোতা তিস্তা নদী। কোথাও সে নীল, কোথাও সে ঘোলা জলের ঘূর্ণি হয়ে ধাবমান। নীচের দিকের নদীতে রিভার র‍্যাফটিং-এর প্রস্তুতি চলছে। এসব দেখতে দেখতেই, দুপুরের দিকে জোরথাং পৌঁছলাম। এখান থেকে পশ্চিম সিকিমের রিবধি—ভারেং অবধি মাত্র একটিই শেয়ার জিপ যাবে। যেটিতে শিলিগুড়ির ড্রাইভারের মাধ্যমে আমার আগাম সিট বুক করা আছে। অতএব, আগের জিপ থেকে নেমেই, আমার স্যাক তুলে দিই রিবধির গাড়িতে। গাড়ি ছাড়তে তখনো আধঘন্টা প্রায় দেরি আছে।

সেই ফাঁকে আমি দৌড় দিলাম দুপুরের লাঞ্চের হোটেলের উদ্দেশ্যে। ফিরে এসে গাড়িতে বসার সঙ্গে-সঙ্গেই গাড়ি স্টার্ট দিল। এখানে বলে রাখি যে, আমার এই রুটে আসার আগাম প্ল্যান ছিল আলাদা। ভেবেছিলাম, প্রায় ৩০ বছর পরে এখানে এসে, একরাত রিবধিতে থেকে, পরেরদিন সকালে আমার পূর্বের অতি পরিচিত জায়গা বা রাস্তা, যেটি কিনা এখান থেকে হাঁটাপথে মোটামুটি ঘন্টা তিনেকের হাঁটা পথ, সেই সান্দাকফু-ফালুট রুটে নামার রাস্তায়, গোর্খে হয়ে সামানদেন গ্রামে আমার পুরোনো বন্ধুর ঘরে একরাত কাটিয়ে, উল্টোপথে সিঙ্গালীলা উদ্যান দিয়ে উল্টোপথে প্রথমদিন ফালুট

ট্রেকার্স হাটে একরাত কাটিয়ে, সান্দাকফুতে দ্বিতীয় রাত; এরপর গুরদুম হয়ে শ্রীখোলারিম্বিক হয়ে নেমে আসা। কিন্তু, সবকিছু আর আগাম ভাবনা অনুযায়ী হয় কোথায়?

যাই হোক, জোরথাং জিপস্ট্যান্ড থেকে মাঝ দুপুরে গাড়ি ছাড়ল। আমার আসন পিছনের সিটে। যথারীতি আমি তন্ময় হয়ে বাইরের চলমান দৃশ্যাবলী অবলোকন করতে করতে ইচ্ছেমতো ফটো বা শর্ট ভিডিও তুলতে তুলতে চলেছি।
গাড়ি চলছে তো চলছেই। বেশ কিছুটা যাওয়ার পরে ড্রাইভার হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, যেহেতু এই একটিই গাড়ি বা জিপ যাচ্ছে, সেহেতু এখান থেকে এক দোকানদারের কয়েক বস্তা সিমেন্ট গাড়ির উপরে লোড করে রিবধির উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে কাছাকাছি ঘুরে দেখতে থাকলাম।

অপূর্ব এক সুন্দর প্রকৃতির মাঝে জায়গাটির অবস্থান। যে জায়গাটিতে আমরা অবস্থান করছি, সেটি দক্ষিণ সিকিমের সুমবক এবং কিতাম গ্রামের অন্তর্গত (প্রসঙ্গত, এখানে একটি ২০০ বছরের পুরাতন গ্রাম আছে) 'কিতাম বার্ড স্যাংচুয়ারি।'

এই বার্ড স্যাংচুয়ারিতে প্রায় ২০০ প্রজাতির বেশি পাখি ও প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়। যার মধ্যে আছে ওরিয়েন্টাল হোয়াইট আই, রেড জাঙ্গল ফাউল, ইন্ডিয়ান পিফাউল, স্কারলেট মিনিভেট, গ্রিন ম্যাগপাই, হিমালয়ান ফ্লেম এবং আরও অনেক প্রজাতির পাখি।

আজ তো হাতে সময় নেই। পরে আবার এখানে এসে থাকার ইচ্ছে মনে পোষণ করে পুনরায় গাড়িতে উঠে বসলাম। (এই জিপে আমার সিট মাঝখানে থাকায় কিছুটা সুবিধা হয়েছিল। এরপর টানা চলবার পরে, গাড়ি একেবারে বেশ কিছু সময়ের জন্য থামল ছোট্ট পাহাড় ঘেঁষা শহর সোমবাড়িয়ায়।

যেসব ট্যুরিস্ট হিল হয়ে ফুলের উপত্যকা ভার্সে যেতে চান, তাঁরা এখান থেকেই দিক বদল করেন। আর ঠিক এখানেই আমার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে আলাপ-পরিচয় হল, আমার গাড়ি বা জিপের তরুণ ড্রাইভার/মালিক ডি কে শেরপার সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও আমার খুবই একজন কাছের বন্ধু হয়ে গেল; এবং আমার মুখে বিভিন্ন নেপালি গান শুনে ও যে কী খুশি!

ধীরে ধীরে গাড়ি এখন পাহাড়ের অনেকটাই উপরে উঠে এসেছে। ফলে ঠান্ডা হাওয়াও বাড়ছে। গাড়ি পুনরায় ছাড়ার আগে, উপরে বেঁধে রাখা স্যাক খুলে আমার জন্য তখনকার মতো গরম জামাকাপড় বের করে দিল।

গাড়ি যেই না সোমবাড়িয়া ছেড়ে রিবধির পথ ধরেছে, রাস্তার দু-পাশের দৃশ্য দেখে আর চোখের পলক ফেলা দায় হয়ে পড়ল। দু-পাশের পাহাড়ের গায়ে উজ্জ্বল বিভিন্ন প্রকারের রংবেরঙের ফুল, লালী গুঁড়াস অর্থাৎ আগুন লাল রডোডেনড্রন, বিভিন্ন প্রজাতির লিলি ছাড়াও যে আরও কত রংবাহারি ফুল নিজের খেয়ালে ফুটে রয়েছে এবং পথের ধারে একটু নীচের দিকে বেশ কয়েকটি স্রোতস্বিনী সরু-মাঝারি ঝর্না-ঝোড়া।

এভাবে চলতে চলতে গাড়ি একসময়ে রিবধি গিয়ে থামল। গাড়ির উপরে রাখা সিমেন্টের বস্তাগুলো স্থানীয় কিছু মানুষ এবং ড্রাইভার হাতে হাতে ধরে সব নামিয়ে দিল। তখন বিকেল শেষ হতে চলেছে। এদিকে উঁচুতে উঠে আসবার দরুণ প্রবল বেগে ঠান্ডা হাওয়া দিতে শুরু করেছে। আমার কিন্তু পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রিবধিতেই নেমে যাওয়ার কথা ছিল। আমি হয়তো সেখানে নেমেও যেতাম— যেটি খুবই ভুল সিদ্ধান্ত হত।

ডি কে আমাকে আন্তরিকভাবেই পরামর্শ দিল যে, রিবধিতে স্টে করলে আমাকে ভারেঙ পর্যন্ত অনেকটা পথ একাই হাঁটতে হবে। তারপর তো গোর্খে-সামানদেন। তার চাইতে আমি যেন আজ রাতে আপার ভারেং-এই থেকে যাই।

ডি কের ঘর রিবধিতে। ওই আমার হোটেল ঠিক করে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। রিবধি থেকে ভারেং বেশ কিছুটা দূর। সেখানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ও কোনো অতিরিক্ত ভাড়া নেবে না আমার কাছ থেকে।
তখন অন্ধকার নেমে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সন্ধ্যার মুখে আমার গাড়ির ড্রাইভার ডি কে শেরপা আমাকে তার গাড়ি করে আপার 'রিবধি' র একমাত্র হোটেল (ইউটিউবে কথিত 'একমাত্র হোম স্টে') সিঙ্গালীলা সান ভিউ হোম স্টে-তে পৌঁছে দিল। তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে পাহাড়ের বুকে। সুতীব্র কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া; সেই মুহূর্তে টেম্পারেচার ৩ ডিগ্রি।

একটি সিঙ্গেল ছোট্ট রুম (১০০০ টাকায় প্রতিদিন থাকা-খাওয়া

নিয়ে)। ঘরের ছোট্ট জানলা থেকে বাইরের দৃশ্য।
বড়োই মনোমুগ্ধকর। দূরে দেখা যায় বরফাবৃত সিঙ্গালীলা রেঞ্জ-এর চূড়া। প্রসঙ্গত, প্রায় ৩০বছর আগে একটি মাত্র শেয়ার জিপ ছাড়ত জোড়থাং থেকে রিবধি পর্যন্ত। বাকি পথ, অর্থাৎ রিবধি থেকে ভারেং হয়ে গোর্খে-সামানদেন হাঁটা পথে। বর্তমানে একমাত্র গাড়িটি আসে ভারেং পর্যন্ত এবং ভারেং-এ মেক মাই ট্রিপ-এর মাধ্যমে হোটেল বুক করলে কিন্তু যে কোনো রুম বা ডর্মিটরির ভাড়া ২০০০ টাকারও বেশি। এর সঙ্গে অতিরিক্ত সারচার্জ যুক্ত হবে। যাই হোক, হোটেল মালিক প্রেম সাঙ্গের সঙ্গে আলোচনা করে যা জানলাম তা শুনে এবং দেখে আমার মন তিক্ততায় ভরে গেল। এখানে শতকরা ৯৯ ভাগ ট্যুরিস্ট আসেন মূলত গোর্খে হয়ে এক-দু দিনের শখের ভ্রমণ করতে। তাঁদের না আছে নতুন কিছু খুঁজে বের করার মানসিকতা, না আছে আবিষ্কারের অনুসন্ধিৎসা। তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রায় প্রতিটি রুমে আছে বিশালাকৃতি ডি জে বক্স এবং পুরো সান্দাকুফ-ফালুট ট্রেক রুটে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো হোম স্টে শহরের সমস্ত রকম আধুনিক উপকরণ নিয়ে গজিয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যাবেলায় চতুর্দিক বিদীর্ণ করে ডিজেল চালিত জেনারেটরের তীব্র

কর্কশ ঘর্ঘর শব্দ। পাখির সংখ্যা কমে গেছে। যেখানে সেখানে প্লাস্টিকের গ্লাস-বোতল-প্যাকেট ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে এবং, তাবৎ হোটেল মালিক এবং গাইড চূড়ান্তভাবে প্রফেশনাল। কোনো রকম ভালোবাসা-আবেগের কোনো স্থান নেই এঁদের মনে।
আর, এবারে অস্বাভাবিক রকম তুষারপাত হওয়ার কারণে সান্দাকফু-ফালুটের রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ।

এসব দেখেশুনে যখন মনে মনে হতাশ হয়ে পড়েছি, তখনই হঠাৎ আলোর ঝলকানি। যা আমাকে সেই মুহূর্তে প্রচন্ড রকম উত্তেজিত করে তুলল। তার মুখ থেকে শুনলাম যে, এখান থেকে দু'টি একেবারে অজানা স্বল্প পরিচিত ট্রেক পথ আছে, যেখানে এখনো পর্যন্ত একমাত্র লোকাল (ছোট্ট) গ্রামের মানুষজন ছাড়া সমতলের কেউই পা রাখেননি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আমি যেখানে আছি, ঠিক তার উল্টোদিকের সিঁড়ি ভেঙে উপরে ঘন জঙ্গল ভেদ করে খাড়াই মোটামুটি ১১,৫০-১২০০ ফুট উপরে। আর, আরেকটি হচ্ছে একটু দুর্গম রাস্তা ধরে উঠে, একরাত নিজস্ব তাঁবু খাটিয়ে গভীর জঙ্গলে রাত্রিবাস করে, পরদিন নীচে নেমে আসা।
শুনেই আমি স্থির করলাম যে, দুটোতেই আমি উঠব। সেইমতো হোটেল মালিক পরদিন সাত সকালে আসার জন্য একজন লোক্যাল গাইডকে খবর পাঠিয়ে দিলেন। পরেরদিন সকালে ডাক পড়তেই কিচেনে গিয়ে দেখি, আমার বয়সী একজন মানুষ বসে আছেন। ইনিই আমার গাইড। নাম বিষ্ণু রাই। প্রাথমিক আলাপ পরিচয় হওয়ার পরে, নাস্তা নুডল আর চা খেয়েই রওনা দিলাম আমার নতুন ট্রেক রুট ভার্খে / বোর্খে দাঁড়ার উদ্দেশ্যে।

আপার ভারেং-এর সমতল থেকে উচ্চতা ১০,৫০০-১১,০০০ ফুট।
প্রথমেই বেশ কয়েকধাপ সিমেন্টের বাঁধানো সিঁড়ি ভেঙে উঠে মূল জঙ্গলের পথে প্রবেশ করলাম। ছোট্ট গ্রাম নীচে আর একটু ছোটো হয়ে গেল। ডানদিকে বনদপ্তরের ঘেরা সীমানা পার করে, চলার পথে মোটা একটি গাছের গুঁড়ি কেটে তিনচার ধাপে বানানো একটি সিঁড়ি বেয়ে নামতেই, গাইড বিষ্ণু আমার হাতে একটি সরু বাঁশের ছিপ লাঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইয়ে ডান্ডি আপনা হাত সে পাকড়ো' অর্থাৎ চলার পথে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ওটিই ভরসা। কিন্তু, আমি যে আজ অবধি কখনোই কোনোরকম ডান্ডি বা লাঠির সাহায্য নিয়ে পথ

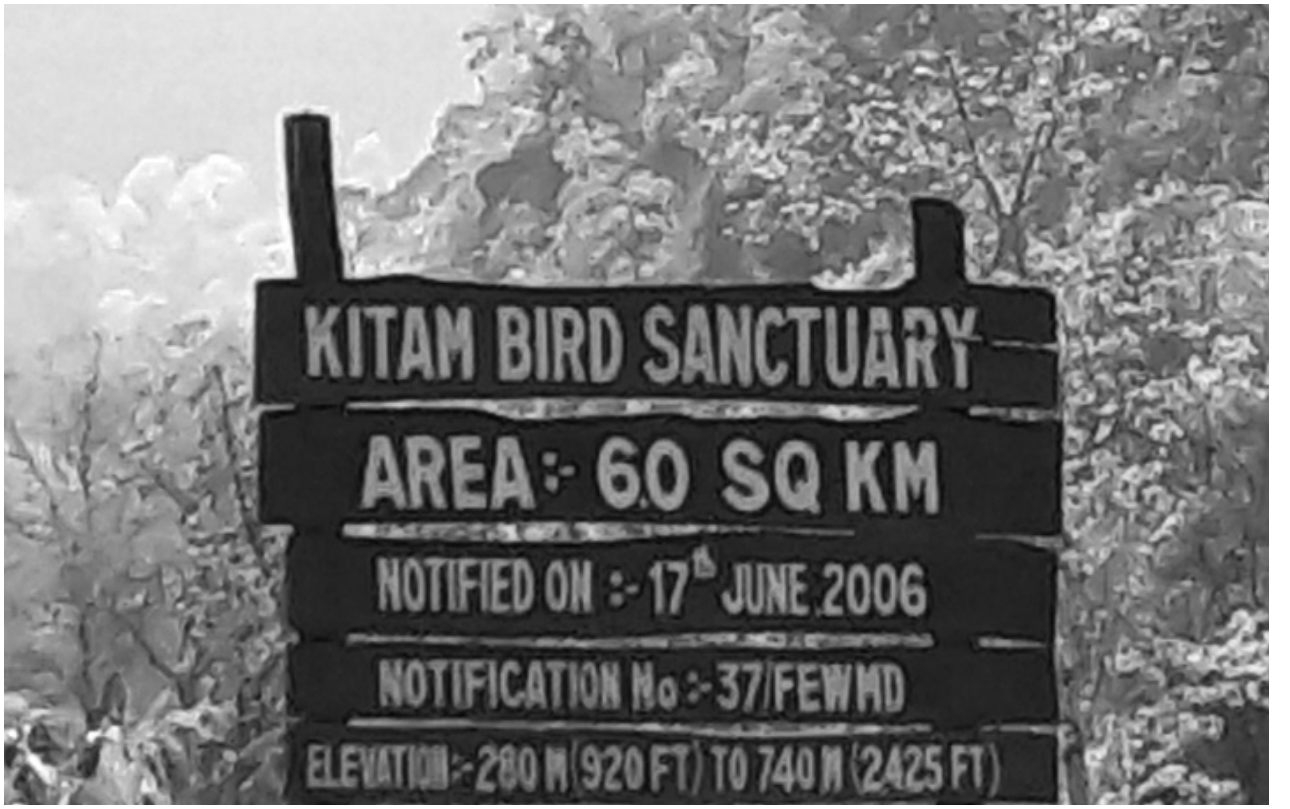

চলিনি! অতএব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম।

যদিও এবারের ট্রেক একটি মাত্র লাংসের উপরে নির্ভর করে (এবং, দুটি অসুখ ধরা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সিগারেট বা ধূমপান চিরতরে পরিত্যাগ করেছি)। তবু এরপর হাঁটা শুরুর পথে প্রথমেই পড়ল, বিশাল এলাকা জুড়ে ওষধি গাছ বিশাল উচ্চতার হেমলক-এর জঙ্গল। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে, এখানে বিজলি বা বিদ্যুৎ থাকে না ঘন্টার পর ঘন্টা। সোলার পাওয়ার ব্যবহার সীমিত, কিচেনের জন্য। পাওয়ার ব্যাংক এবং মোবাইলের চার্জ ক্ষণস্থায়ী। টাওয়ার লোকেশন সবজায়গায় পাওয়া যায় না। এরপর আবার চড়াই ভাঙা। এবার এল পাইনের বন। আর, এপ্রিল মাসের সেই অতি বিখ্যাত ফুল লালী গুঁড়াস বা রেড রডোডেনড্রন। ফুল তো নয়, যেন সারা গাছ জুড়ে আগুন ছোটাচ্ছে। সরু জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তা। অজস্র কচি সরু বাঁশের ঘন জঙ্গল। সেসব দু-হাত দিয়ে সরিয়ে, যতটা সম্ভব পা বাঁচিয়ে চলার রাস্তা করে নিতে হচ্ছে।

হঠাৎ আমাদের উল্টোদিকের জঙ্গলের রাস্তায় ঝড়ের মতো আওয়াজ মনে হল নীচে নেমে আসছে।

দেখলাম আমার সামনে দিয়ে একজন-দুজন মানুষ নেমে আসছেন, যাঁদের পিঠের বোঝা, নিজের শরীরকে ছাপিয়ে গেছে।
এঁরা লোকাল গ্রামের গাই চারা সংগ্রহের জন্য কচি বাঁশের ডগা কেটে অনেক পরিশ্রম করে নিচে তাদের নিজস্ব গোঠে নামিয়ে আনেন। এই ছোট্ট গ্রামে প্রধান জীবিকা বলতে বেশকিছুটা জায়গা নিয়ে ক্ষেত বা সবজি চাষ এবং গাইগরু পালন। প্রসঙ্গত, এই সরু বাঁশের কোড় বা কচি নরম ডগা এবং ফুল খাওয়ার জন্য ডিসেম্বর মাসে প্রচুর ভালুক দল বেঁধে নেমে আসে। যারা প্রায় হুড়মুড় করে নীচের দিকে নেমে আসছিল, তাদের মধ্যে একজন তরুণ হঠাৎ করে পিঠের পাহাড়প্রমাণ বোঝা নামিয়ে রেখে আমার পাশে বসে পড়ল। পরিচয় দিল তার নাম পেম্বা শেরপা। কথায় কথায় সে জানাল যে, সে এখানকার ভূমিপুত্র। এই বনজঙ্গল তাঁর কাছে মাতৃসম। সিকিম সরকার কখনও যদি এই বন কেটে উন্নয়নের নামে অসদুদ্দেশ্যে এখানে প্রবেশ করে, তাহলে সে এখানে শুয়ে পড়ে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করবে।

শুনে আমার সারা শরীরে যুগপৎ আনন্দ আর শিহরণ বয়ে গেল। ওর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গল্প করার পর ও আবার গাইচারার বোঝা পিঠে নিয়ে নীচের দিকে চলল, আমরা দুজন উপরে।

বেশ কিছুটা পথ চড়াই ভাঙার পর জঙ্গল এতটাই গভীর ঘন হয়ে এল যেখানে মানুষের যাতায়াত প্রায় নেই বললেই চলে। সেখানে দিনের বেলাতেও সূর্যের আলো ঢোকা দুষ্কর। এরমধ্যে আচমকা পথ আটকে দাঁড়াল একটি বড়ো শ্যাওলা ধরা গাছ, আড়াআড়ি ভেঙে পড়ে রয়েছে। মাথা নিচু করে সেই পড়ে থাকা গাছের তলা দিয়ে বেরিয়ে আবার খাড়াই জঙ্গল।

চারিদিকে অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। শব্দ বলতে, গাছপালার পাতার ফিসফিসানি, পাখির কুজন আর আমাদের শুকনো ভেজা পাতায় গোড়ালি ডুবিয়ে চলার পদশব্দ। এর মধ্যে আরেক বিপদ, আসার সময় দুজনেই জলের বোতল আনতে ভুলে গিয়েছিলাম। ফলে নীচের দিকে ওই গোঠওয়ালাদের ফেলে যাওয়া একটি পরিত্যক্ত বোতলে ঝোরার জল ভরে পান করা। এভাবে একসময় পথ শেষ হয়ে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পৌঁছলাম।

গাইড বলল এটিই সেই আমাদের গন্তব্য 'ভার্খেদাঁড়া'র শেষ জিরো পয়েন্ট। হুঁশ ফিরতেই আমার মুখ দিয়ে একটি অব্যক্ত আওয়াজ বেরিয়ে এল। চোখের সামনেই দিগন্তবিস্তৃত বরফাবৃত পুরো সিঙ্গালীলা টপ, তার বামদিকে ফালুটমোল্লে, ডানদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, আর পিছনে তাকালেই অনেক দূরে ছবির মতো রিবধি গ্রাম, নাম চিরাবাংলা।

চতুর্দিকে নাম না জানা নানা ধরনের অর্কিড গাছ। তাতে অজস্র মনোমুগ্ধকর নানা রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। এভাবে কতক্ষণ মৌননিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম, হুঁশ ছিল না। প্রবল ঠান্ডা হাওয়ার বেগ বাড়তে হুঁশ ফিরল। ধীরে ধীরে নিচের দিকে উতরাই ভাঙতে শুরু করলাম। নীচে নামার জন্য সহজ চওড়া রাস্তা থাকলেও, আমি জঙ্গল দিয়ে নামার পথই বেছে নিলাম। পাহাড়ের ট্রেকরুটে ওঠার জন্য বুকে দম লাগে; নীচে নামতে গেলে অনেক সাবধানে পা ফেলতে হয় কারণ একবার ফস্কালেই কিন্তু হয় গভীর চোট-আঘাতের সম্ভাবনা, নয়তো অতল খাদে (এক্ষেত্রে অবশ্য খাদ ছিল না)।

যথারীতি নীচের দিকে হুড়মুড়িয়ে পথ নেমে গেছে এবং, অতি সাবধানতা সত্বেও দু-তিনবার ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়লাম। যদিও পড়ে থাকা পাতার কারণে অক্ষত ছিলাম। এবার বুঝতে পারলাম যে, দমে বেশকিছুটা ঘাটতি পড়ছে। পথ যেন আর শেষই হতে চায় না। সেই কুড়িয়ে পাওয়া বোতলটাও কোথায়

যেন ফেলে এসেছি। ধারেপাড়েও জলের কোনো রকম উৎস নেই। প্রবল তৃষ্ণায় গলাজিভ শুকিয়ে কাঠ। পকেটে লজেন্সও নেই যে মুখ ভেজাবো। বিষ্ণু বলল, আরো নীচের দিকে একটি বরফ গলা জলের ঝোরা আছে। অতএব সেই অবস্থায় আবার নামতেই থাকলাম। একজায়গায় এসে বিষ্ণু আমাকে বেশ খানিকটা ঘুরে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে ঝোরার রাস্তাটির দিকনির্দেশ দিতেই, আমি দ্রুত সেখানে পৌঁছেই একেবারে নালার ধারে ট্রাউজার ভিজিয়ে থেবড়ে বসে পড়ে দু-হাতের আঁজলা ভরে ওই ঠান্ডা কনকনে জল আকণ্ঠ পান করলাম।

এরপর আবার সেই গাছের গুঁড়ির ধাপ টপকানো। এবারে আর পারলাম না, গাইড বিষ্ণুর সাহায্য নিতেই হল। অবশেষে প্রায় মধ্য দুপুরে আমার হোটেলের ঘরে পৌঁছানো। মোট সময় লেগেছিল প্রায় সাড়ে ছয় ঘন্টা।

একদিন বাদ দিয়েই আমার যাওয়ার কথা ছিল রাম্মাম খোলা (নেপালি ভাষায় নদী)-য় মাছ ধরতে এবং তার পরদিন সেই অজানা-অচেনা পথের ট্রেকে।
কিন্তু বিধি বাম। আচমকা দুর্ঘটনায় মারাত্মক রকম জখম নিয়ে ফিরতে হয়েছিল। সে গল্প তোলা রইল।

সবশেষে হোটেল মালিক প্রেম সাঙ্গে এবং তার স্ত্রীর প্রশংসা না করলে সত্যিই অপরাধ হবে। যতটা সম্ভব আদর যত্নের কোনো রকম ত্রুটি রাখেনি।

আমিও দুহাত ভরে ওদের জন্য কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া উপহার দিয়ে এসেছি এবং কলকাতার বিখ্যাত পেস্তা রসগোল্লা। আর যোগ্য সঙ্গী পেয়েছিলাম একটি ফুটফুটে বাচ্চা, যেটি প্রেমের সম্পর্কে নিজের ভাইঝি। আর, একটি ধবধবে সাদা অতি মিষ্টি দেখতে পাহাড়ী সারমেয়। তার জন্য রোজ রাতে আমার ডিনারের থালায় মাংসভাত রাখা থাকত, খুব ভোরবেলায় এসে খাবে বলে। আর, এখানকার মাইনাস ৩ ডিগ্রি ঠান্ডার সঙ্গে ছিল প্রবল বেগে হওয়া, যার কারণে একদিন রাতে হোটেলের কয়েকটি কাচ ভেঙে গিয়েছিল।

হোটেলের কিচেনের সামনেই ওদের ছোট্ট সবজির ক্ষেতের সামনে রাখা চেয়ারে বসে হাতের কাছে পেঁজা তুলোর মতো অপরূপ মেঘের আনাগোনা দেখতে দেখতে সময় যে কীভাবে কেটে যেত। এখন ঘরে বসে মন খারাপের দিনে ভাবলে, কী যে মন ভালো হয়ে যায়।

ছবি ঃ লেখক

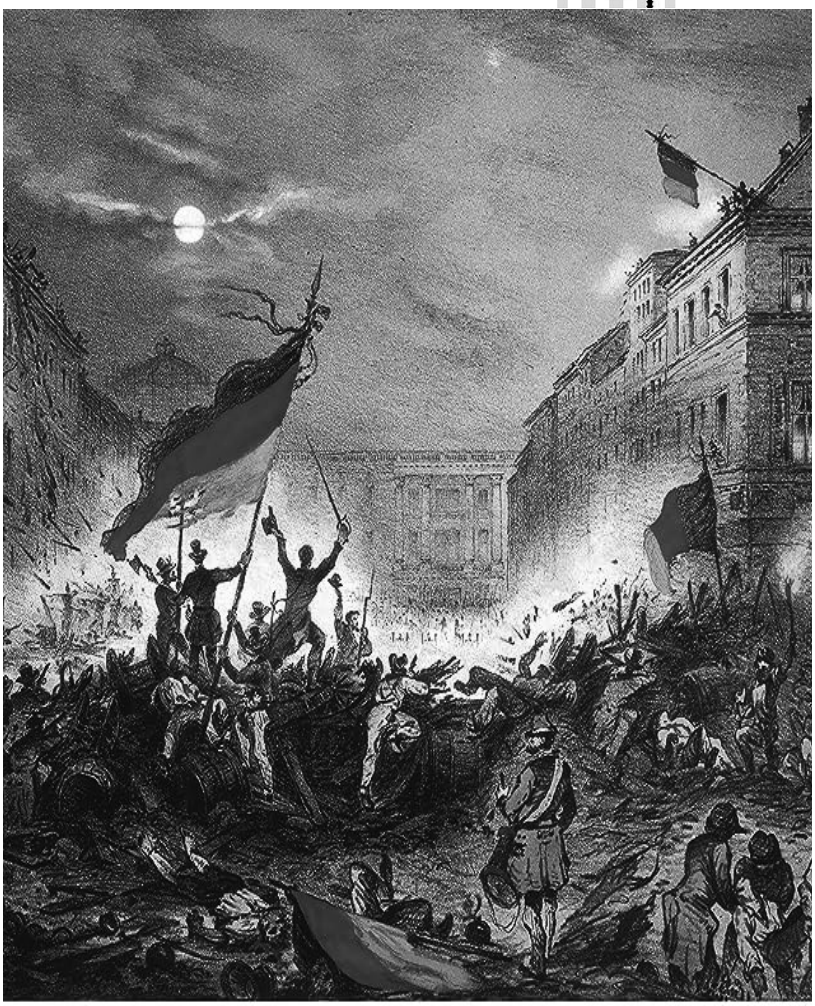

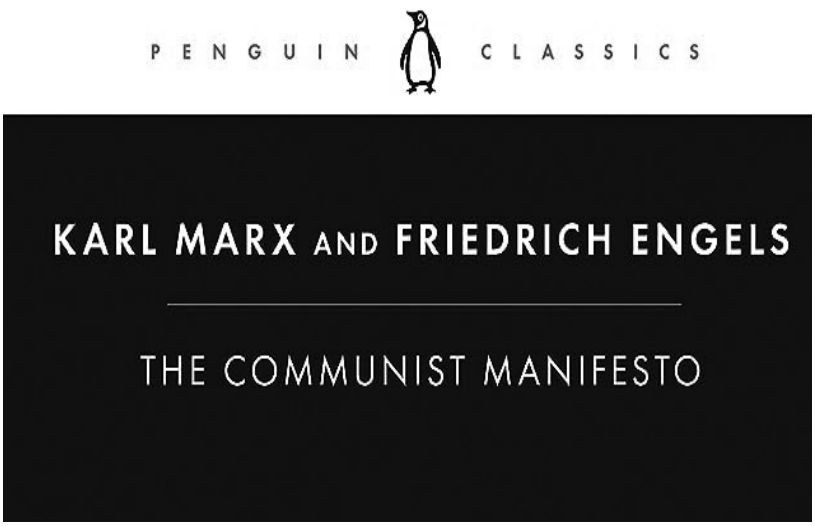

ইতিহাসে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো

পার্থ মুখোপাধ্যায়

১.

এ বছর , ২০২৩ সালে , ১৮৪৮-এ প্রকাশিত কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের ‘দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’-র ১৭৫ বছর হল। এই ১৭৫ বছর যখন পালিত হতে যাচ্ছে তখন পৃথিবীতে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে তো বটেই, তার পরের আমলের দ্বিবিভাজিত বিশ্বও আর নেই ; কেবল তা-ই নয়, ইতিহাসের যেটা সবথেকে বড়ো পরিহাস তা হল, যে দেশে প্রথম মার্ক্সের মতবাদ নিয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল সেই সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক শিবিরেরও যখন পতন হয়েছে । বিশেষ করে, যখন পুঁজিকেন্দ্রিক একমেরু দুনিয়াও যথেষ্ট সন্ত্রস্ত। সন্ত্রস্ত বলেই যত দিন যাচ্ছে ৯/১ -পরবর্তী বিশ্বকে আরো আরো আরো ত্রস্ত ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যে বিপুল বিক্রমে খাড়া করা হচ্ছে ইওরোপ সহ সর্বত্র ‘ইসলামিক সন্ত্রাস’-এর একটা হাড়হিম করা ঝকঝকে চিত্রনাট্য, যেমন খাড়া করার খানিকটা চেষ্টা ছিল একদা কিউবা, পরে ভিয়েতনাম নামে দেশগুলিকে কেন্দ্র করে। রীতিমতো চেষ্টা চলছে এইসব ইসলামিক

সন্ত্রাস, এন্ড অফ হিস্ট্রি, পোস্ট ট্রুথ ওয়ার্লড, সাইবার দুনিয়া ইত্যাদির ধুয়ো তুলে নজরদারি চালানো, যারপরনাই কড়া ধাতের সামরিক একটা রাষ্ট্র খাড়া করার , যার মূল মেরুদণ্ডই হবে আজকের বিশ্বপুঁজির রুক্ষতম, একরোখা চেহারাটা।

অথচ এত কিছুর পরেও কিন্তু যেটা ঘটনা তা হল, বিশ্বে যে কোনো বিষয়ে যতগুলি ক্লাসিক আছে এই 'দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-ই তার মধ্যে অন্যতম, যার এতবার এতগুলি সংস্করণ হয়েছে, এত ভাষায় এতবার অনূদিত হয়েছে যে সংখ্যাটা আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে অনায়াসেই। অর্থাৎ , সত্যিটা হল তাহলে কী রাজনৈতিক দুনিয়ায় কী বুদ্ধিজীবীদের মহলে, অ্যাকাডেমিক বা নন-অ্যাকাডেমিক সমাজবেত্তাদের দুনিয়ায়, বা সোসিওলজি / পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র / গবেষক শুধু নয় সাংবাদিক বা আলোচকদের কাছেও এমনকি , সমর্থক ও বিরোধী নির্বিশেষে , স্বভাবতই বইটির জনপ্রিয়তা আজও বিপুল। আয়তনে যত ছোটোই হোক এবইয়ের অডিও সংস্করণ হয়েছে , ইলাস্ট্রেটেড কমিক্স বেরিয়েছে , ইউ টিউব খুললে একাধিক অ্যানিমেশনও যে চোখে পড়ে না তা নয়। অর্থাৎ , যত ছোটোই হোক না আয়তনে , বইটি কেবল তখনই নয়, আজ , এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও, আলোচক গবেষক তো বটেই , নিছক পাঠক মহলেও তার আকর্ষণ মোটে হারায়নি। কেন হারায়নি ? ১৮৪৮ সালে লেখা একটি বই তো ১৭৫ বছর বাদে এসে, এই ২০২৩ সালে , তা যত ক্লাসিকই হোক, স্রেফ সময় আর পরিস্থিতি বদলে গেছে বলেই , শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক মহল বাদে অন্যত্র তার আকর্ষণ হারিয়ে ফেলতেই পারত। এবং সেটাই হত স্বাভাবিক। কিন্তু তা হয়নি। হয়নি স্রেফ ওই সময়ের জন্যেই। কী রকম ! দেখা যাক।

২

১৮৪৮ সাল, অর্থাৎ যে বছরে বইটি লিখলেন মার্ক্স-এঙ্গেলস, তার বিষয়ে কিছু কথা বলে নেওয়া যাক, যা বাদে এই বইটির প্রেক্ষিত ঠিক বুঝে ওঠা যাবে না। ইতিহাস বলছে ১৮৪৮ থেকে ১৮৪৯ এই একটি বছর নাকি ইয়োরোপের ইতিহাসে এমন একটি সময়কাল, যাকে এক কথায় ইতিহাসবিদরা চিহ্নিত করেন স্প্রিংটাইম অফ দ্য পিপল বা আরো ব্যাপকার্থে ধরলে স্প্রিংটাইম অফ নেশনস হিসাবে। ইয়োরোপের ইতিহাসে এই কালপর্ব খ্যাত সবথেকে তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়া বিপ্লবের ধারার কারণে। খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে এই সময়কাল থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ্ব পর্যন্ত সময়ে ইয়োরোপের সমাজক্ষেত্রে এমন কিছু পরিবর্তন সূচিত হয় যার অভিঘাত ইয়োরোপের সমাজ ক্ষেত্রে ব্যাপক হয়েছিল বললেও কম বলা হয়। এক কথায় বললে বলতে হয়, ইয়োরোপের লিবারাল রিফর্মার আর

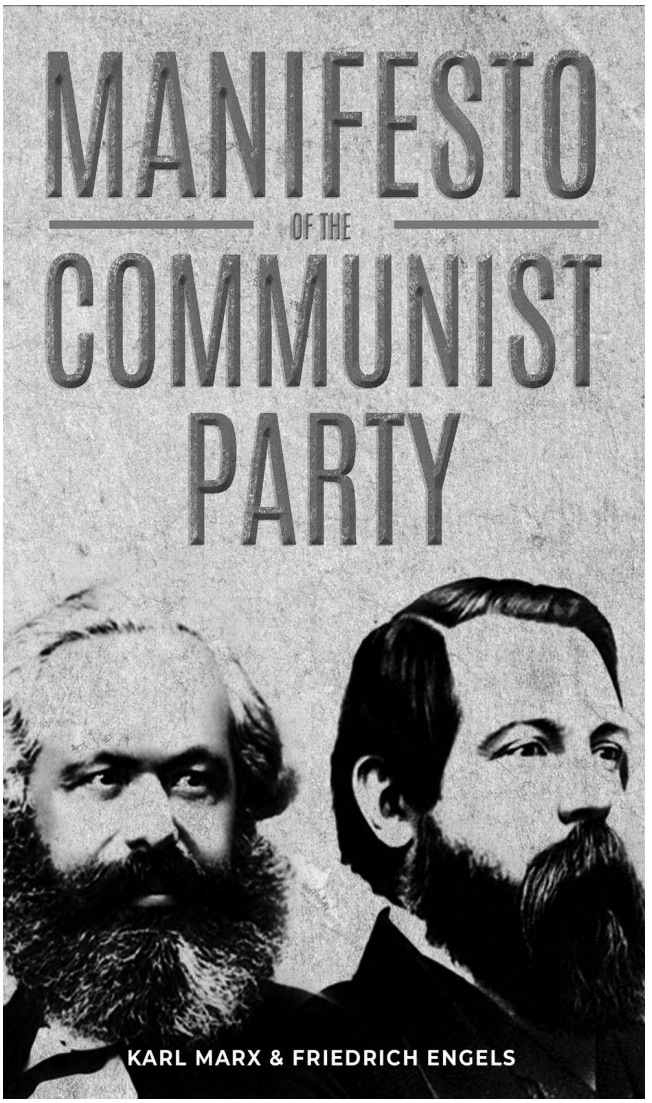

চরমপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা ইয়োরোপের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এ সময়ে ব্যাপক একটা পরিবর্তনের সূচনা করেন।অন্যদিকে কারিগরি ক্ষেত্রে বদলও আসছিল, যা শ্রমিক শ্রেণির জীবনধারায় ছাপ ফেলছিল । উদ্ভব হচ্ছিল পপুলার লিবারালিজম, জাতীয়তাবাদ , সমাজবাদ ইত্যাদি ধারণার। তার ওপর ১৮৪৬ সালের ফসল উৎপাদনে বিপর্যয়ও কম প্রভাব ফেলেনি। প্রধানত কৃষক আর শহুরে শ্রমিক শ্রেণির জীবন প্রায় ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।

ইতিহাস বলে এই সময়ে ফরাসি দেশের শহরাঞ্চলে জনসংখ্যায় প্রায় জোয়ার আসে। অধিকাংশ কৃষিজীবীই চাইছিলেন শহরে এসে জীবনযাত্রার মোড় ফিরিয়ে নিতে। পরিস্থিতি দেখে বুর্জোয়া মহলে রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তাঁরা নিজেদের শ্রমিকদের থেকে দূরে সরিয়ে নিতে থাকেন। দারিদ্র্য আর নানা অসুখ অধ্যুষিত বস্তি অঞ্চল তখন ভরে গেছে অদক্ষ শ্রমিকের ভিড়ে। তারা ঘার গুঁজে

১২ থেকে ১৫ ঘন্টা খাটে, বাকি সময়টা ভিড় জমায় অভিজাত অঞ্চলে গিয়ে । যারা হাতের কাজ করে বংশানুক্রমে জীবিকা অর্জন করেছে তাদের হাতে কাজ নেই। বাণিজ্য আইন শিথিল করে দেওয়া হচ্ছিল , ফলে গজিয়ে উঠছিল কারখানার পর কারখানা। হিসেব বলছে জার্মানিতেও হাল প্রায় একই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইতিহাস বলে, ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮-এর মধ্যে দক্ষ কারিগর, পেশাজীবী শ্রমিক আর শিক্ষানবীশদের সংখ্যা শহরাঞ্চলে বেড়ে দাঁড়ায় ৯৩ শতাংশ। শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ ফেটে পড়তে থাকে। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৪-এর মধ্যে ফ্রান্সের লিঁয়তে এরকম শ্রমিক বিক্ষোভ ফেটে পড়ে চোখে পড়ার মতো ভাবে। ইয়োরোপের অন্যতম ব্যবসা কেন্দ্র প্রাগেও ১৮৪৪-এ এরকম শ্রমিক সমস্যা আছড়ে পড়েছিল বিপুলভাবে। ইতিহাস বলে ১৮২৫-এর পর থেকেই দেখা যেতে থাকে গোটা ইয়োরোপের গরিব শহুরে শ্রমজীবীরা লক্ষ্য করেন যে, তাঁদের পকেটের হাল দিনকে দিন খারাপস্য খারাপ হচ্ছে। হিসেব দেখাচ্ছে ১৮৩০-এর পরে দেখা যায় বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি সহ ইয়োরোপের নানা দেশে শহরাঞ্চলে মাংস কেনার খদ্দের কমে যাচ্ছে অথচ জনসংখ্যা বাড়ছে না তা নয়। ১৮৪৭-এর পর একটা তীব্র অর্থনৈতিক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জানা যায় ভিয়েনার ১০,০০০ শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন, হামবুর্গের ১২৮ টি সংস্থা দেউলিয়া হয়েছে। ১৮৪৭-এর এই বিপর্যয়ে এক নেদারল্যান্ড ছাড়া ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে এক অর্থে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল শক বলতে যা বোঝায় তা-ই ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪০-এর দশকে জার্মানিতে বস্ত্র শিল্পে জোয়ার আসে যন্ত্রের কল্যাণে। এতে জার্মান হস্তশিল্পীদের কাজের চাহিদা কমে যায়। সংস্কার চললেও তাতে শিল্পকর্মীরা খুশি ছিলেন না। তাঁরা আরো সংস্কার চাইছিলেন। নিরুপায় শহুরে শ্রমিকদের উপার্জনের অর্ধেকই চলে যেত খাবারের পিছনে, তা-ও খাবার মানে কেবলই রুটি আর আলু। ওদিকে কৃষি বিপর্যয়ের ফলে খাদ্যের দাম বেড়ে যায়। ১৮৪৫ থেকে এক বছরের মধ্যে গোটা উত্তর ইয়োরোপে আলু চাষে বিপর্যয় দেখা যায়। এর ফলে গোটা আয়ারল্যান্ডেই দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ।এর প্রভাব পড়ে ইয়োরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও। দাম বাড়তে থাকে বিপুল পরিমাণে। ফ্রান্সে কেবল ১৮৪৬-'৪৭ সালেই ৪০০ জায়গায় দেখা দেয় খাদ্যের জন্যে বিক্ষোভ। জার্মানিতে আর্থ সামাজিক নানা কারণে বিক্ষোভ ১৮৩০-''৩৯ সালে দেখা গিয়েছিল ২৮ টির মতো যা ১৮৪০ থেকে ১৮৪৭-এ বেড়ে দাঁড়ায় ১০৩। গোটা ইয়োরোপে যেদিকে তাকানো যায় তখন সংবিধান, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা সহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবিতে মানুষ ফেটে পড়ছেন। দাবি উঠছে কৃষকের স্বাধীনতা, অর্থনীতির উদারীকরণ, কর ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণেরও --- অর্থাৎ , সব মিলে সামন্ততন্ত্রের ক্ষমতা কাঠামোয় পড়ছে একের পর এক প্রবল ধাক্কা।

১৮৮৫-তে, মার্ক্সের মৃত্যুর পরে এসে এঙ্গেলস এই সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখছেন, ১৮৩৪ সালে প্যারিসে একদল জার্মান উদ্বাস্তু প্যারিসে এক্সাইলস লিগ নামে একটি গুপ্ত সমিতি তৈরি করেন। সংগঠনটি মনোভাবের দিক থেকে গণতান্ত্রিক এবং সাধারণতান্ত্রিক বলতে যা বোঝায় তাই ছিল। ১৮৩৬ সালে এসে চরমপন্থী মনোভাবাপন্নরা সংগঠন ছেড়ে বেরিয়ে যায় এবং গিয়ে জড়ো হয় ফেডারেশন অফ দ্য জাস্ট নামে এক ছাতার তলায়, যে সংগঠনের সদস্যরা মূলত ছিলেন, এঙ্গেলস লিখছেন, প্রলেতারিয়ত।আর মূল সংগঠনটি , জ্যাকোবাস ভেনেদির মতো এক অর্থে দেখলে ঘুমন্ত ব্যক্তিত্বরাই একমাত্র যার প্রতি একনিষ্ঠ রয়ে গেছিলেন, সেটি এর পরেও কিন্তু ঘুমন্তই রয়ে যায়।১৮৪০ সালে এসে , পুলিস যখন ধরপাকড় শুরু করল , তখন ওই সংগঠন একটি নাম কা ওয়াস্তে সংগঠন ছাড়া কিছুই নয়। সে যাই হোক ফেডারেশন কিন্তু ওই সময়ের মধ্যেই যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আসলে সেটা ছিল ফরাসি শ্রমিক শ্রেণির কমিউনিস্ট সংগঠনের জার্মান মুখোশ, যার তাত্ত্বিক মতামতগুলির উৎস ছিল প্রধানত ফরাসি সাংবাদিক ও বিপ্লবী ফ্রাঁসোয়া নোয়েল বাবেউফের অনুসারী, যা তখন প্যারিসে আস্তে আস্তে দানা বেঁধে উঠছে।এইসব গোষ্ঠির মধ্যে সমানাধিকার তথা গণতন্ত্রের চাহিদা ছিল বিপুল।এই ফেডারেশন অফ জাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য , ধাঁচধরণ তখনকার ফরাসি গুপ্ত সংগঠনগুলোর থেকে আলাদা কিচ্ছু ছিল না।এদের কাজকর্মের মধ্যে পড়ত প্রচার আর ষড়যন্ত্র ঘটিয়ে হইচই ফেলে দেওয়া। প্যারিস তখন পর্যন্ত ছিল বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম মূল কেন্দ্র, যদিও সুযোগ পেলে জার্মানিতে বৈপ্লবিক কোনো কাণ্ড ঘটানোর ব্যবস্থাপত্র করাও এদের হিসেবের বাইরে ছিল না। যেহেতু প্যারিসেই মনে করা হত আসল লড়াইটা হবে ফলে ফেডারেশন মোটেই ফরাসি গুপ্ত সংগঠনের জার্মান শাখা ছাড়া কিছু ছিল না, যাদের মধ্যে পড়ত ব্লাঁকি আর বার্বেদের সংগঠনগুলি। ১৮৩৯-এর মে মাসে যখন ফরাসিরা বিদ্রোহ করল তখন ফেডারেশনও তাদের সঙ্গেই লড়েছিল এবং পরাজয় বরণ করে নিয়েছিল।

এঙ্গেলস লিখছেন, কার্ল শাপার আর হাইনরিশ বাউয়ের গে এপ্তার হন। দীর্ঘ কারাবাসের পর লুই ফিলিপের সরকার সিদ্ধান্ত নেয় তাঁদের বহিষ্কারের । দুজনেই চলে যান তারপর লন্ডনে। জার্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শাপার বনবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করতেন এবং ১৮৩২-এ জর্জ বুশনারের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৩৩-এ ফ্রাঙ্কফুর্টের থানায় হামলাতেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন বলেই জানা যায়।এরপর তিনি বাইরে চলে

যান এবং ১৮৩৪-এর ফেব্রুয়ারিতে স্যাভয়ে গিয়ে মাৎসিনির দলের সঙ্গে যোগ দেন। শাপার ছিলেন ১৮৩০-এর দশকের পেশাদার বিপ্লবীদের মতো মানসিকতার লোক। মানুষটাকে নিজের মত থেকে নড়ানো ছিল কঠিন।এঙ্গেলস লিখছেন, যে যাই বলুক জার্মান শ্রমিক শ্রেণির জন্যে তাঁর অবদানের তুলনা হয় না।হাইনরিশ বাউয়ার এসেছিলেন ফ্রাঙ্কোনিয়া থেকে। পেশায় জুতোর কারিগর বাউয়ার ছিলেন হাসিখুশি মজাদার মানুষ।তবে কর্তব্যে অটল। প্যারিসে কম্পোজিটরের কাজ করলেও লন্ডনে এসে শাপার ভাষা সাহিত্যের শিক্ষকতার কাজে মন দেবার কথাই ভাবছিলেন। তিনি আর বাউয়ার একটু গুছিয়ে নিয়েই চেষ্টা করছিলেন ফেডারেশনের ছিঁড়ে যাওয়া সুতো জোড়া লাগাতে। ওঁরা চাইছিলেন কাজ কর্মের কেন্দ্র হোক লন্ডন। যোগ দিলেন জোসেফ মল । প্যারিসেও ভদ্রলোক দলেই ছিলেন। ওঁর কাজ ছিল ঘড়ি সারাই। উনি এলেন কোলন থেকে। তাগড়াই চেহারার মানুষটিকে অন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বহুবার ঝামেলা সামলাতে দেখা গেছে। এঙ্গেলস বলছেন এঁরাই হলেন সেইসব প্রথম তাত্ত্বিকদের অন্যতম যাঁদের সঙ্গে ওঁর মোলাকাৎ হয়েছিল। ১৮৪৩ সালে এঁদের সঙ্গে তিনিও ভিড়ে যান বলে জানাচ্ছেন তিনি। গোড়ার দিকে কিছু ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও তাতে সম্পর্ক গড়ে ওঠা আটকায় না। পরেও এই তিন ব্যক্তিকে ভুলতে পারেননি বলেই জানিয়েছেন তিনি তাঁর স্মৃতিচারণে।

১৮৪০। ফেব্রুয়ারি মাসে তৈরি হল জার্মান ওয়ার্কার্স এডুকেশনাল সোসাইটি। সংগঠনটি গুপ্ত সংগঠন ছিল না । ১৮৮৫-তে যখন স্মৃতিচারণ করছেন এঙ্গেলস তখনও সেটি সক্রিয় ছিল। আসলে এটি ছিল ফেডারেশনের লোক সংগ্রহ করার মুখ। আসলে যখনই দেখা যেত সংগঠন তৈরি করায় আইনি বাধা আছে তখনই সেই কাজ করার জন্যে তৈরি হয়ে উঠত জিমন্যাস্টিক সোসাইটি, কোরাল সোসাইটির মতো এই ধরনের সংগঠন যার আড়ালে চলত কাজ। অথচ সরকারও নজর রাখত।

যাই হোক, ফেডারেশন ধীরে বেশ জমে উঠতে থাকল।ওই সময়ে সুইজারল্যান্ডে এরকম জমে ওঠার যথেষ্ট উদাহরণ মিলত বলেই জানাচ্ছেন এঙ্গেলস। ইতিহাস বলে, জার্মানিতেও এরকম অনেক গ্রুপ তৈরি হয়েছিল বটে কিন্তু জন্মসূত্রে সেসবের মধ্যেই ছিল ধ্বসে যাবার বীজ।কিন্তু যেটা অবাক কাণ্ড তা হল, যত গ্রুপ ধ্বংস হত সঙ্গেসঙ্গেই প্রায় ফের গজিয়ে উঠত তার থেকেও বেশি।যখনকার কথা বলা হচ্ছে সেই ১৮৪০ থেকে ছ-ছটা বছরের আগে, অর্থাৎ ১৮৪৬-এর আগে জার্মান পুলিস কিন্তু বার্লিন এবং মাগডেবার্গে ফেডারেশনের কোনো হদিশই খুঁজে পায়নি।এবং যখন পেয়েছিল তখনো তার মর্মার্থ বোঝার ক্ষমতা তাদের হয়নি বলাই ভালো বলেই জানাচ্ছেন এঙ্গেলস।তাঁর কথায়, ফেডারেশনের সিংহ ভাগ সদস্যই ছিলেন টেলর অর্থাৎ দর্জি।তখন জার্মান দর্জিরা সুইজারল্যান্ড, লন্ডন, প্যারিস সহ সারা দুনিয়ায় চুটিয়ে কাজ করছেন।এঙ্গেলস জানাচ্ছেন, প্যারিসে ১৮৪৬-এ প্যারিসে নাকি জার্মান ভাষাই ছিল এই টেইলরিং শিল্পে এতটাই প্রচলিত ভাষা যে তিনি নাকি একজন নরওয়ের একজন দর্জিকে জানেন যে সমুদ্রপথে ড্রন্থেইম থেকে প্যারিসে আসে এবং এসে খোদ প্যারিসে বসেও আঠের মাস ধরে এক বর্ণ ফরাসিতে বাৎচিত করেনি , কারণ সে জার্মান ভাষায় দারুণ কথা বলতে পারত। হিসেব বলছে ১৮৪৭-এ প্যারিসে নাকি ফেডারেশনের দুটি কমিউন ছিল --- যার একটি কেবল দর্জিদের আর অন্যটি আসবাবপত্র তৈরি করিয়েদের।

যাই হোক কর্মকেন্দ্র প্যারিস থেকে লন্ডনে চলে আসায় একটা অন্য ব্যাপার ঘটল। ফেডারেশন ধীরে ধীরে জার্মানদের সংগঠন থেকে আস্তে আস্তে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে থাকল। জার্মান আর সুইডিশরা বাদে আরো নানা দেশের লোক যারা জার্মান জানত তারাও এসে এখানে জড়ো হতে থাকল। এদের মধ্যে ছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়া, ডাচ, হাঙ্গেরিয়ান, বোহেমিয়ার বাসিন্দা, উত্তরের স্লাভ, রাশিয়ান আর আলসেশিয়ানরাও। এঙ্গেলসের স্মৃতিচারণ থেকেই জানতে পারি একজন ব্রিটিশ গ্রেনেডিয়ারের কথা যে কিনা ফেডারেশনের প্রায় প্রত্যেক মিটিঙেই আসত রীতিমতো পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে। তো এইভাবেই দেখা যেতে থাকল ফেডারেশন হয়ে উঠছে রীতিমতো আন্তর্জাতিক। কিছুদিনের মধ্যেই ফেডারেশনের নাম গেল বদলে।এবারে নাম হল কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স এডুকেশনাল সোসাইটি।মেম্বারশিপ কার্ডে এল স্লোগান 'সবাই আমরা ভাই ভাই'। এবং সে শ্লোগান থাকল প্রায় বিশটি ভাষায়। তবে কিনা দু একটি অনুবাদ হল অপেক্ষাকৃত ভালো। এর পাশাপাশি চলল একটি গুপ্ত সংগঠনও। এক সময় অল্প দিনেই দেখা গেল সেটাও হয়ে উঠেছে রীতিমতো আন্তর্জাতিক।যেহেতু নানা দেশের মানুষ জড়ো হচ্ছেন, ফলে, বোঝা যাচ্ছিল বিপ্লব যদি সংঘটিত করতেই হয় তাহলে তার চারিত্র্য হওয়া উচিৎ ইউরোপীয়ান। আন্তর্জাতিক চারিত্র্য উঠে এল এইভাবেই।

কিন্তু যত যাই হোক, মনে হচ্ছিল কিন্তু প্যারিসই হতে চলেছে বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি। কিন্তু সমস্যা হল, প্যারিসে যাঁরা সেদিন সক্রিয় ভাবনাচিন্তা করছিলেন তাঁদের সঙ্গে আন্দোলনের সূত্র কার্যত আস্তে আস্তে আলগা হচ্ছিল।অথচ ফেডারেশন আকারে আয়তনে বাড়ছিল। ধীরে ধীরে সদস্যরা টের পাচ্ছিলেন ফেডারেশনের নীতিগুলির শিকড় প্রোথিত জার্মান শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে, ফলে

তাঁদেরই দায়িত্ব গোটা ইয়োরোপের হয়ে অবস্থান স্পষ্ট করার, তা সে বিপ্লবের ডাক উত্তর দক্ষিণ যেদিক থেকেই উঠুক না কেন !

১৮৪৭-এর গ্রীষ্মে লন্ডনে ফেডারেশনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। এঙ্গেলস প্যারিসের কমিউন থেকে ডেলিগেট হয়ে এলেন, ব্রাসেলস থেকে এলেন উইলহেল্ম উলফ। এঙ্গেলস লিখ ছেন সেখানে মূল আলোচ্য হল পুনর্গঠন । আস্তে আস্তে বোঝা যাচ্ছিল আগের দিনের গোপন ষড়যন্ত্রমূলক অবস্থান দিয়ে কাজ আর চলবে না। আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছিল কমিউন, সার্কল , নেতৃত্ব দানকারী সার্কল ,সেন্ট্রাল কমিটি, কংগ্রেস ইত্যাদি। নাম বাছা হল কমিউনিস্ট লিগ। কনভেনশনের নীতিতে বলা হল, লিগের লক্ষ্য হল বুর্জোয়াদের অপসারণ, প্রলেতারিয়েতের শাসন প্রতিষ্ঠা, শ্রেণি বিরোধিতার ভিত্তিতে বুর্জোয়া সামাজিক রীতিনিয়মগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা ইত্যাদি। গোটা সংগঠনের ভিত্তিই হল গণতান্ত্রিক। কর্মীরা নির্বাচিত হলেন। এবং প্রয়োজনে তাঁদের জবাবদিহি করার ব্যবস্থাও থাকল। মনে হচ্ছিল এই পথেই এতদিন যেভাবে কাজ চলত সেই গোপন পন্থা এবার বদলে যেতে চলেছে। নতুন নতুন এইসব নীতিনিয়ম যা ধার্য হচ্ছিল সেসব কমিউনগুলিতে আলোচিত হত। দ্বিতীয় কংগ্রেস হল ১৮৪৭-এর নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের গোড়ায়। এসবের বিবরণ মিলবে ওয়েরমুথ ও স্টিবারের উনিশ শতকে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র নিয়ে বইয়ে।এঙ্গেলস লিখছেন এই সময়ে মার্ক্স কেবল ছিলেনই না দীর্ঘ তর্ক বিতর্কের মধ্যে নতুন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। গোটা কংগ্রেস চলেছিল দিন দশেক ধরে।এঙ্গেলস লিখছেন, নতুন তত্ত্ব গৃহীত হল সর্বসম্মতিক্রমে এবং তাঁর আর মার্ক্সের উপর দায়িত্ব এসে পড়ল একটি ম্যানিফেস্টো রচনার। 'আমরা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের কাজ করে দিলাম । ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কয়েক হপ্তা আগেই সেই পাণ্ডুলিপি পাঠানো হল লন্ডনে। সেখ ানে তা ছাপা হল।' লিখছেন এঙ্গেলস। আর ইতিহাস বলছে, এর সতের বছরের মধ্যেই এ বইয়ের আহ্বান ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস অ্যাসোসিয়েশনের যুদ্ধ নিনাদের চেহারায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে বিশ্ব জুড়ে।

৩

মার্ক্স আর এঙ্গেলস 'দ্য ম্যানিফেস্টো অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি' লিখেছিলেন ১৮৪৮ সালে। তখন তাঁরা লন্ডনে। জার্মান ভাষায় এই বইয়ের নাম ছিল 'Manifest der kommunistischen Partei' ; এ বই প্রকাশিত হয় ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে। ইতিহাস বলছে প্রথম বেরোয় যখন তখন ঘন সবুজ রঙে ছাপা প্রচ্ছদ শোভিত ২৩ পাতার এই পুস্তিকার প্রকাশ স্থান ছিল বিশপগেট অঞ্চলের ৪৬, লিভারপুল স্ট্রিট। ওয়ার্কার্স এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন থেকে বেরোনো এই পুস্তিকা তখন ছিল লেখকের নামহীন। প্রকাশের পর এটি তিনবার মুদ্রিত হয়। এবং ৩ মার্চ থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় লন্ডনে আশ্রয় নেওয়া দেশ ছেড়ে আসা জার্মানদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্র Duetsche London Zeitung —এ। এই লেখা ধারাবাহিকভাবে বেরোনো শুরু হবার ঠিক পরের দিনেই মার্ক্সকে বেলজিয়ান পুলিশ বিতাড়িত করে । দু সপ্তাহ বাদে, ২০ মার্চ নাগাদ এ পুস্তিকার হাজার কপি পৌছয় প্যারিসে। সেখান থেকে জার্মানিতে পৌঁছয় এপ্রিলের গোড়ায়। গোটা এপ্রিল-মে মাস এর বিভিন্ন ভ্রম সংশোধিত হল। তারপর পুস্তিকার আয়তন দাঁড়ায় ৩০ পাতায়। হিসেব বলছে এর পর থেকে ম্যানিফেস্টোর যেসব সংস্করণ বেরিয়েছে সেগুলি এই সংশোধিত পাঠ থেকেই তৈরি । যদিও বলা হয়েছিল এ বই বেরোবে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান , ইতালিয়ান, ফ্লেমিশ আর ড্যানিশ ভাষায়, কিন্তু জার্মান ভাষার প্রথম বইটি বেরিয়ে যাবার পর এটি অনূদিত হয় পোলিশ আর ড্যানিশ ভাষায় , এবং ১৮৪৮-এর শেষ দিকেই এর সুইডিশ অনুবাদ বেরিয়ে যায় , যদিও পুস্তিকার শিরোনাম তখন ছিল 'দ্য ভয়েস অফ কমিউনিজম ডিক্লারেশন অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি'।

যে সময়ের কথা হচ্ছে ইংল্যান্ডে তখন চলছে চার্টিস্ট আন্দোলন।রাজনৈতিক অধিকার আর সমাজে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেখানকার শ্রমিক শ্রেণি তখন ফেটে পড়ছে বিক্ষোভে। ১৮৩৬ সালে শুরু হয়ে এই আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা দেশে। সেটা ১৮৫০ সাল। চার্টিস্টপন্থীদের আন্দোলন আস্তে আস্তে স্তিমিত হতে শুরু করছে বলেই মনে হচ্ছে। চার্টিস্টপন্থী জর্জ জুলিয়ান হার্নে একটি পত্রিকা করতেন 'দ্য রেড রিপাব্লিকান' নামে। এই পত্রিকায় হেলেন ম্যাকফার্লেনের অনুবাদে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল 'ম্যানিফেস্টো অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি'। ল্যাঙ্কাশায়ারের বাসিন্দা ম্যাকফার্লেন এঙ্গেলসের সহায়তা নিয়েছিলেন অনুবাদ কর্মের ব্যাপারে।কারণ, ইতিহাস বলছে, এঙ্গেলস স্বয়ং এই পুস্তিকার ইংরেজি অনুবাদে হাত দিলেও সে কাজ শেষ করেননি। ম্যাকফার্লেনের অনুবাদের একটি মূল্যবান ও তথ্য সমৃদ্ধ ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং প্রকাশক। হার্নের এই অসামান্য ভূমিকাতেই বিশ্ব প্রথম জানতে পারল এই বইয়ের দুই রচয়িতার নাম।

ফ্রান্সেও তখন বেজায় ডামাডোল । ১৮৪৮-এর এপ্রিলে ফ্রান্সে একটি প্রধানত মধ্যপন্থী ও রক্ষণশীল গণপরিষদ নির্বাচিত হয়, প্যারিসের মানুষ যা পছন্দ করেননি। প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর হলেও এই বিক্ষোভ দ্রুত প্রশমিত হয়

ঠিকই কিন্তু বিষয়টি রক্ষণশীলদের মধ্যে রীতিমতো আতঙ্কের জন্ম দেয়। এই বিক্ষোভকে ইতিহাসে ফরাসি শ্রমিক শ্রেণির জুন ডে'জ আপরাইজিং বলা হয়। এই বিক্ষোভ প্রশমিত হবার ঠিক আগেই ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় ম্যানিফেস্টো।

সাময়িকভাবে প্যারিসে আস্তানা গেড়ে মার্ক্স কলিউনিস্ট লিগের হেড কোয়ার্টার তুলিয়ে আনালেন সেখানে । কেবল কি তা-ই ! কয়েকজন জার্মান সোশ্যালিস্টকে জুটিয়ে বানিয়ে নিলেন জার্মান ওয়ার্কার্স ক্লাব। মার্ক্স আশা করেছিলেন জার্মানিতে বিপ্লব হবেই , তিনি চেষ্টাচরিত্র করে চলে এলেন কোলনে। সেটা ১৮৪৮। বার করলেন 'ডিম্যান্ডস অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি ইন জার্মানি' নামে হ্যান্ডবিল, যেখানে তিনি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর কিছু পয়েন্ট তুলে প্রচার শুরু করেন। অবস্থা বিচার করে তাঁর ধারণা ছিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত যখন জার্মান বুর্জোয়ারা আগে ফিউডাল রাজশক্তি ও অভিজাতদেরকে ছুঁড়ে ফেলবে এবং পরে তাদের উৎখাত করবে প্রলেতারিয়েতরা।

বাবা মারা গেছেন। মার্ক্সের হাতে পয়সা এসেছে। শুরু হল তাঁর সম্পাদনায় Neue Rheinische Zeitung পত্রিকা। সেই পত্রিকায় বেরোচ্ছে তখন গোটা ইওরোপে যা যা ঘটছে তার মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা।পুলিশের নজর পড়েছে। বারংবার মার্ক্সকে আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রাশিয়ার ডেমোক্র্যাটিক পার্লামেন্ট ভেঙে গেছে। সিংহাসনে তখন রাজা চতুর্থ ফ্রেডরিক উইলিয়াম। রাজার প্রতিক্রিয়াশীল পার্শ্বচররা নতুন ক্যাবিনেট গড়লেন। দেশে বামপন্থী শক্তি আর বিপ্লবী দলগুলির হাড়ির হাল বললেও কম বলা হয়। Neue Rheinische Zeitung বন্ধ করে দেওয়ার ফতোয়া জারি হল। মার্ক্সকে বলা হল দেশ ছাড়তে। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে মার্ক্স এলেন প্যারিসে। সারা ফ্রান্সে তখন প্রতিবিপ্লবীদের রমরমা। কলেরার প্রকোপে মানুষ ভয়ে আধমরা। প্যারিসেও রেহাই নেই। কর্তৃপক্ষ মনে করছেন মার্ক্স মানেই হলেন ইংরেজিতে এক কথায় যাকে বলা যায় পলিটিক্যাল থ্রেট। এদিকে সংসারে তখন নতুন অতিথির আবির্ভাব বার্তা সূচিত হয়েছে। যা অবস্থা তাতে মার্ক্সের পক্ষে জার্মানি বা বেলজিয়াম কোথাও গিয়ে একটু থিতু হবার মতো পরিস্থিতি নেই।

১৮৪৯-এর জুন মাসের গোড়ার দিকে মার্ক্স চলে এলেন লন্ডনে। কমিউনিস্ট লিগের হেড কোয়ার্টার তখন লন্ডনে উঠে এসেছে। ১৮৪৯-এর শেষে এসে কমিউনিস্ট লিগে ভাঙন ধরছে। অগুস্ত উইলিচ আর কার্ল শাপার আশা করছিলেন কমিউনিস্ট লিগ যে মুহূর্তে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেবে সেই মুহূর্তে সারা ইওরোপে শুরু হবে শ্রমিক শ্রেণির উত্থান। মার্ক্স আর এঙ্গেলস আপত্তি তুললেন এরকম হঠকারী ধারণার বিরুদ্ধে । তাঁদের মতে এরকম কোনো প্রচেষ্টা লিগের পক্ষে প্রাণঘাতী হতে বাধ্য। দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর মার্ক্সদের মতই জয়যুক্ত হল। উইলিচরা লিগ ছাড়লেন। মার্ক্স তখন জড়িয়ে পড়েছেন সোশিয়ালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স এডুকেশনাল সোসাইটির সঙ্গে। এই সংগঠনেও মতাদর্শের লড়াই চলছিল। শেষমেশ উপায়ান্তর না দেখে মার্ক্স বেরিয়ে এলেন এই সংগঠন থেকেও।

যত দিন যাচ্ছে পড়াশোনার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলেন মার্ক্স। অন্যদিকে পারিবারিক ভাবে দারিদ্র্যের প্রকোপ বাড়ছে। এঙ্গেলসের পরিবার ধনী। ফলে বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ালেন এঙ্গেলস। কিন্তু প্রাশিয়াতে যেমন একটা অন্তত খবরের কাগজ ছিল হাতে এখন তো তাও নেই। ১৮৫১ সাল। কমিউনিস্ট লিগের কেন্দ্রীয় বোর্ডের নেতারা গ্রেপ্তার হলেন।১৮ মাস বাদে, সালটা ১৮৫২, কোলনে তাঁদের বিচারে ৩-৬ বছরের জেল হয়। দুই বন্ধু উপায়ান্তর না দেখে তখন মন দিয়েছেন আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতায়। সেসব লেখা তখন নিয়মিত বেরোচ্ছে ইংলন্ড, আমেরিকা, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকার ছটি খবরের কাগজে। তবে মার্ক্সের তখন মূল আয় ১৮৪১ সালে হোরেস গ্রিলির প্রতিষ্ঠিত নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউনে বেরোনো লেখা থেকে। ১৮৫২ থেকে প্রায় দশ বছর চলল এরকম।হিসেব বলছে, তথাকথিত বিভিন্ন বুর্জোয়া খবরের কাগজগুলিই তাঁর তখন জীবিকা অর্জনের উপায়। উইলহেলম পাইপার তখন তাঁর জার্মান ভাষার লেখাগুলি অনুবাদ করে দেন ইংরেজিতে। গ্রিলির পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলিতে ছিলেন সে সময়ের ডাকসাইটে সব বুর্জোয়া সাংবাদিকরা। সম্পাদকীয় ভার ছিল ফরাসি বুদ্ধিজীবী শার্ল ফ্যুরিয়ারের মতবাদের অনুগামী ও অ্যাবলিশনিস্ট , দুঁদে সাংবাদিক শার্ল ডানা আর আরেক সাংবাদিক জর্জ রিপ্লের ওপর। এর মধ্যে ডানার যোগাযোগেই মার্ক্স এখানে লেখার সুযোগ পান। গোড়া থেকেই এ কাগজের একটা বড়ো অংশ পাঠকই ছিলেন শ্রমজীবীরা। আমেরিকায় কাগজটির প্রচার সংখ্যা ছিল বিপুল। ১৮৫২-র আগস্ট থেকে নিয়মিত এ কাগজে মার্ক্সের লেখা বেরোচ্ছে তখন।

১৮৫৭। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে নেমে আসে আকস্মিক মন্দা । ১৮৫৬ সালের শেষের দিক থেকে ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসার ক্রমাগত ব্যর্থতার জন্য ১৮৫৭-র মাঝামাঝি এই বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়। যদিও সামগ্রিক অর্থনৈতিক মন্দা সংক্ষিপ্ত ছিল, তবে এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ছিল অর্থনৈতিক অবস্থার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। ওহাইও ব্যাঙ্কের আস্থা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে যে আতঙ্কের সূত্রপাত, তা রেলপথ ব্যর্থ হওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, এবং ইউএস ফেডারেল

সরকারকে নিয়েই আশঙ্কা দেখা দেয়। দেখ যায় এক বছরের মধ্যে ৫০০০ টিরও বেশি আমেরিকান ব্যবসা ব্যর্থ হয়েছে, এবং বেকারত্বের জন্য শহর এলাকায় প্রতিবাদ মিটিং অনুষ্ঠিত হতে শুরু করেছে ব্যাপক হারে । অবশেষে আতঙ্ক ও হতাশা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা এবং দূরপ্রাচ্যেও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে দেড় বছর ধরে এই অবস্থার পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়নি এবং ১৮৬১-তে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের আগ পর্যন্ত এই মন্দার প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি।

যাই হোক, ১৮৫৭-র মার্চে খবর এল টাকার টানাটানির জন্যে সপ্তাহে একটা মাত্র লেখার জন্যে পয়সা মিলবে, সে লেখা বেরুক বা না বেরুক। আর অন্য লেখা বেরোলে তবে পয়সা। মাস কয়েকের মধ্যে মার্ক্স আর বি টেইলর নামে একজন বাদে বাকি সমস্ত ইয়োরোপীয় সংবাদদাতাই ছাঁটাই হলেন। আর মার্ক্সের লেখার পরিমাণও গিয়ে দাঁড়াল ওই সপ্তাহে সাকুল্যে একটায় ।লেখা ছাপার পরিসরও কমছে। ১৮৬৮। বেরোল ডানার নিজের সম্পাদনায় নতুন পত্রিকা নিউ ইয়র্ক সান ।তার আগে ১৮৫৭-র এপ্রিল নাগাদ আমন্ত্রণ এসেছিল নিউ আমেরিকান সাইক্লোপিডিয়াতে লেখার জন্যেও ।এই প্রকাশনার মূল পরিকল্পক ছিলেন ডানার সহযোগী রিপ্লে। সব মিলে লেখা বেরোল মোট ৬৭ টি, যার মধ্যে ৫১ টি এঙ্গেলসের। যদিও এর জন্যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে তথ্য সংগ্রহের কাজ চালালেন মার্ক্স।

হিসেব বলছে ১৮৫০ থেকে ১৮৬০ এই সময়টা মার্ক্স এবং এঙ্গেলসের তাত্ত্বিক ভাবনার জগতে একটা বিরাট তোলপাড়ের সময়। তাত্ত্বিকরা বলেন এই সময়টা তরুণ মার্ক্সের হেগেলিয়ান অবস্থান থেকে পরিণত মার্ক্সের অবস্থানে উত্তরিত হবার কাল। তিনি ১৮৪৮-এর ব্যর্থতার পর এই ব্যর্থতাকে পর্যালোচনা করছেন এই সময়ে। ১৮৫১ ডিসেম্বর থেকে ১৮৫২-র মার্চের মধ্যে লেখা তাঁর 'এইটিনথ ব্রুমেয়ার অফ লুই বোনাপার্ট" বেরোল নিউ ইয়র্কে জোসেফ ওয়েডেমেয়ারের জার্মান পত্রিকা 'ডাই রেভলিউশান'-এ। এই রচনায় মার্কস চিহ্নিত করলেন কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক স্বার্থের সংঘাত রাজনৈতিক সংগ্রামের জটিল জালে এবং বিশেষ করে সংগ্রামের বাহ্যিক রূপ এবং এর বাস্তব সামাজিক বিষয়বস্তুর মধ্যে পরস্পরবিরোধী সম্পর্ককে প্রকাশ করে। প্যারিসের প্রলেতারিয়েতরা এই সময়ে ক্ষমতালাভের ক্ষেত্রে খুব অনভিজ্ঞ ছিল ।কাজ চলছে পলিটিক্যাল ইকনমি আর বিশেষ করে ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম নিয়ে , যা পরে এসে , ১৮৬৭-তে, আঙ্খ মরা দেখতে পাব নির্মাণ করবে 'ডাস ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড। ১৮৫০। বেরোল 'ক্লাস স্ট্রাগল ইন ফ্রান্স'। ১৮৫২। প্রকাশিত হচ্ছে 'দ্য এইটিনথ ব্রুমেয়ার অফ লুই বোনাপার্ট'। ১৮৫৭-৫৮। চলছে 'Grundrisse der Kritik der politischen konomie'-র (ইংরেজি আর জার্মান দুই-য়েই যা পরিচিত 'গ্রুন্ড্রিশ' নামেই)

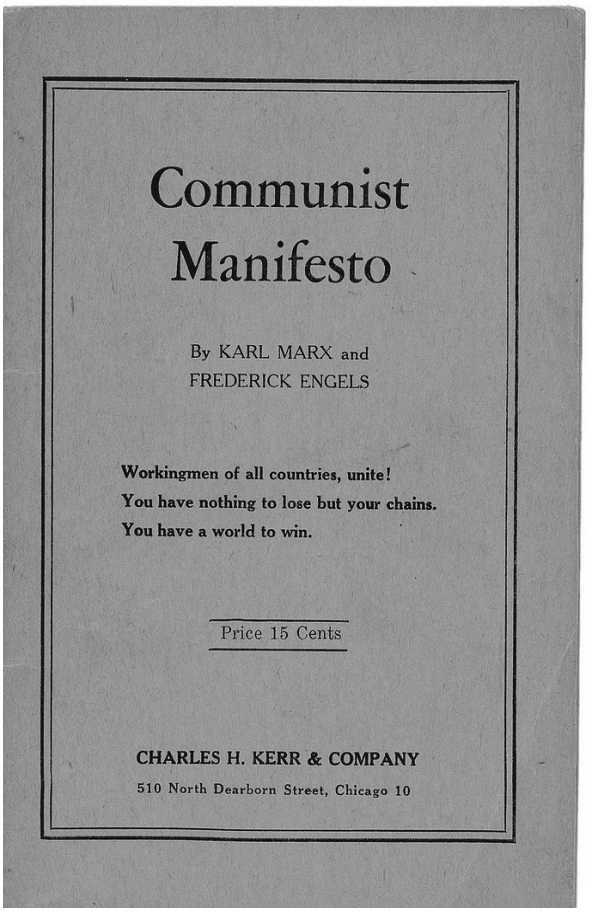

কাজ, যা অসমাপ্ত রয়ে যাবে মার্ক্সের জীবৎকালে, বেরোবে একেবারে ১৯৩৯-এ, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার বছরে এসে। ১৮৫৯। বেরোচ্ছে 'এ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি'। তৈরি হচ্ছে 'ডাস ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ডও, যা-ও অসমাপ্তই রয়ে যাবে , বেরোবে এসে মার্ক্সের মৃত্যুর পরে, এঙ্গেলসের যোগ্য সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনায় । ১৮৬২-৬৩। নির্মিত হচ্ছে তিন খণ্ডে 'থিওরি অফ সারপ্লাস ভ্যালু', যা আবার বেরোবে গিয়ে আরো পরে ,একদম সেই বিশ শতকের গোড়ায় । কাজ চলছে আরো বেশ কিছু নোটবুকের পাতায়, তৈরি হচ্ছে আরো বেশ কিছু কাজের খসড়া। ১৮৬৪। মার্ক্স জড়িয়ে পড়ছেন ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেন'স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে, যা পরে পরিচিত হবে প্রথম আন্তর্জাতিক বা ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল হিসাবে। সংগঠনের জেনারেল কাউন্সিলে তিনি নির্বাচিত হলেন। ১৮৭১। বেরোচ্ছে 'দ্য সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স'। ১৮৭৫। দিনের আলো দেখছে 'ক্রিটিক অফ গোথা প্রোগ্রাম'। সবই হচ্ছে, কিন্তু ম্যানিফেস্টো নিয়ে তেমন নড়চড় কিন্তু নেই, যা

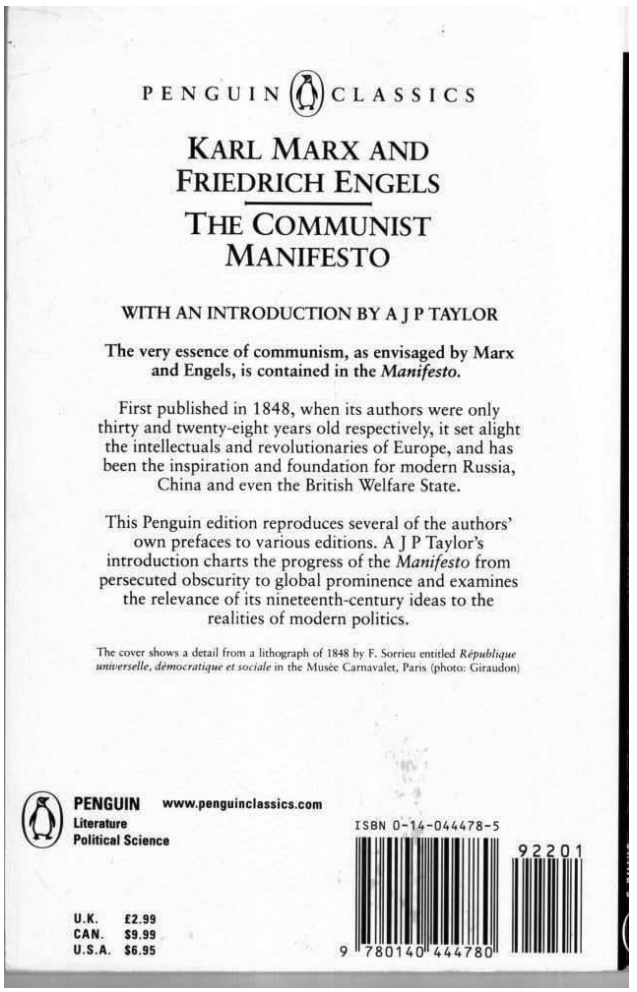

ফের শুরু হবে ১৮৭০-এর দশকের গোড়ায় এসে।

জানা যায় ১৮৬৯-তে রাশিয়ায় মিখায়েল বাকুনিনের করা ম্যানিফেস্টোর রুশ অনুবাদটি বেরোয় বটে তবে সে অনুবাদ জায়গায় জায়গায় বেশ গণ্ডগোলের। আর তার আগে ১৮৬৬-তে বার্লিন থেকে বেরোয় এ বইয়ের প্রথম জার্মান সংস্করণ। এই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড,ইতালি আর স্পেনের ৭৫ জন প্রতিনিধি নিয়ে আয়োজিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ সাধারণ কংগ্রেস, যাকে সাধারণভাবে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল বলা হয়। এই সময়েই জন কাওয়েল স্টেপনি-র 'সোশাল ইকনমিস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হল ম্যানিফেস্টোর একটি সংক্ষিপ্ত রূপ।

১৮৭১। এ বছর ১৮ মার্চ থেকে ২৮ মে। এই দু মাস দশ দিন ফ্রান্সের প্যারিস শহর দেখল মার্ক্স এঙ্গেলস যাকে বলবেন ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য প্রলেতারিয়েত তার হাতে কলমে রূপ, যে কারণে ১৮৯১-তে লন্ডনে পারি কমিউনের ২০ তম বার্ষিকীতে এঙ্গেলস বলবেন, 'অফ লেট, দ্য সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফিলিস্তিন হ্যাজ ওয়ান্স বিন ফিলড উইথ হোলসাম টেরর অ্যাট দ্য ওয়ার্ডস ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য প্রলেতারিয়েত। খ ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো হোয়াট দিস ডিক্টেটরশিপ লুকস লাইক ? লুক অ্যাট দ্য পারি কমিউন। দ্যাট ওয়াজ দ্য ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য প্রলেতারিয়েত।'

১৮৭২। মার্ক্স-এঙ্গেলস দেখলেন যতদিন যাচ্ছে ইয়োরোপের চেহারা বদলাচ্ছে। তার সঙ্গে তাল রেখে ভূমিকা সহ জার্মান অনুবাদে বেরোল ম্যানিফেস্টোর একটি অনূদিত সংস্করণ।এই সংস্করণেই ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হল 'দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' (জার্মানে Das Kommunistische Manifest) নামে। এই অনুবাদের ভূমিকাতেই মার্ক্স এঙ্গেলস বললেন, 'গত পঁচিশ বছরে আধুনিক যন্ত্রশিল্প বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির পার্টি সংগঠন উন্নত ও প্রসারিত হয়েছে ; প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে , পরে আরও বেশি করে প্যারিস কমিউনে , যেখানে প্রলেতারিয়েত এই প্রথম পুরো দুই মাস ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল ---- তাতে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তার ফলে এই কর্মসূচি খুঁটিনাটি কিছু ব্যাপারে সেকেলে হয়ে পড়েছে।কমিউন বিশেষ করে একটি কথা প্রমাণ করেছে যে, 'তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটা শুধু দখলে পেয়েই শ্রমিক শ্রেণি তা নিজের কাজে লাগাতে পারে না।'খ তাছাড়া একথাও স্বতঃস্পষ্ট যে, সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের সমালোচনাটি আজকের দিনের হিসাবে অসম্পূর্ণ , কারণ সে আলোচনার বিস্তার এখানে মাত্র ১৮৪৭ পর্যন্ত ; তাছাড়া বিভিন্ন বিরোধী দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তব্যগুলিও সাধারণ মূলনীতির দিক থেকে ঠিক হলেও, ব্যবহারিক দিক থেকে সেকেলে হয়ে গেছে। । কেননা রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেছে, এবং উল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলির অধিকাংশকে ইতিহাসের অগ্রগতি এ জগত থেকে ঝেটিয়ে বিদায় দিয়েছে।' সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দিলেন, 'এই 'ইশতেহার' এখন ঐতিহাসিক দলিল হয়ে পড়েছে, একে বদলাবার কোনো অধিকার আমাদের আর নেই।'

১৮৭১ থেকে ৭৩ সালের মধ্যে এ বইয়ের নটা সংস্করণ হল মোট ছটা ভাষায়। আর ইতিমধ্যে ১৮৭১-এর ৩০ ডিসেম্বর আমেরিকায় নিউ ইয়র্কের উডহাল অ্যান্ড ক্ল্যাফলিন্স উইকলি থেকে বেরিয়ে গেছে ম্যানিফেস্টোর প্রথম মার্কিন সংস্করণ। সেই অর্থে বলা যায় এ পর্যন্ত এই ম্যানিফেস্টোই ছিল সারা বিশ্বে মার্ক্স-এঙ্গেলসের একমাত্র কমবেশি সুপরিচিত রচনা।পরের চল্লিশ বছরে নজর করলে দেখা যাবে গোটা ইয়োরোপ তথা সারা বিশ্বেই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলগুলির রমরমা শুরু হয়। আর

হিসেব বলছে এই চার দশকে কমপক্ষে তিরিশটি ভাষায় শতাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয় ম্যানিফেস্টোর। ১৮৮২-তে বেরোয় রুশ সংস্করণ, যার অনুবাদ করলেন সুদূর জেনেভায় বসে স্বয়ং প্লেখানভ এবং তার জন্যে নতুন ভূমিকা লিখে দিলেন মার্ক্স-এঙ্গেলস। এই ভূমিকাতেই তাঁরা বলেন যেমন রাশিয়া প্রথম কমিউনিস্ট দেশ হয়ে উঠলে খুব অবাক হবার কিছু নেই , তেমনি আবার রাশিয়া যদি আর সব ইয়োরোপীয় দেশের মতো পুঁজিবাদী হয়ে যায় তাহলেও খুব অস্বাভাবিক কিছু হবে না। লিখলেন, 'বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যাওয়া সত্বেও জমিতে আদিযুগীয় সাধারণ মালিকানার একটা রূপ --- রুশ অবশ্চিনা (গ্রাম-সমাজ) কি সরাসরি উচ্চতর রূপের কমিউনিস্ট সাধারণ মালিকানায় রূপান্তরিত হতে পারে ? অথবা উল্টোটা , তাকেও কি যেতে হবে ভাঙনের সেই একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে , যা পশ্চিমের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা ?' লিখলেন, 'এর একমাত্র যে উত্তর দেওয়া সম্ভব তা হল, রাশিয়ার বিপ্লব যদি পশ্চিমে সর্বহারা বিপ্লবের সংকেত হয়ে ওঠে , যাতে উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে রাশিয়ায় ভূমির বর্তমান যৌথ মালিকানা কাজে লাগতে পারে এক কমিউনিস্ট বিকাশের সূত্রপাত হিসাবে।'

মার্ক্সের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। ১৮৮১-র ডিসেম্বরে প্রয়াত হয়েছেন স্ত্রী। মার্ক্সের নিজের শরীরও ভালো যাচ্ছে না।শ্লেষ্মার আধিক্য জনিত কারণে ব্রঙ্কাইটিস আর প্লুরিসির প্রকোপ দেখা দিয়েছে। ১৮৮৩র ১৪ মার্চ । মার্ক্স প্রয়াত হলেন।তাঁর বয়েস তখন ৬৪। ১৭ মার্চ তাঁকে সমাধিস্থ করা হল জর্জ এলিয়টের সমাধির কাছেই, লন্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্র (পূর্ব) ,এ।ফ্রান্সিস হুইনের সাক্ষ্য মানলে শোক মিছিলে ছিলেন সাকুল্যে জনা কয়েক ব্যক্তি , যাঁদের মধ্যে আছেন কন্যা ইলিয়ানর , ফ্রেড্রিক এঙ্গেলস, এডওয়ার্ড অ্যাভেলিং, পল লাফার্গ , হেলেন দেমুথ, উইলহেলম লিবনেখট প্রমুখ।পরে, ১৯৫৪ সালে অবশ্য এই সমাধিক্ষেত্র তাঁদের দেহ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কাছেই অন্যত্র। ১৮৮৩ থেকে ১৮৯৩। ম্যানিফেস্টোর পাঁচটি সংস্করণের ভূমিকা লিখবেন এঙ্গেলস, যার মধ্যে আছে ১৮৮৮-র ইংরেজি সংস্করণটিও , যা অনুবাদ করেন স্যামুয়েল মুর এবং দেখেশুনে তার অনুমোদন করেন স্বয়ং এঙ্গেলস। কেবল তা-ই নয় তিনি এই সংস্করণ দেখে তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন প্রয়োজনীয় টীকা। বলতে কী, সেই শুরু হল দুনিয়ার ইংরেজি অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ম্যানিফেস্টোর জয়যাত্রা। ১৮৯২ সালের পোলিশ সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস লিখলেন, 'ইশতেহারটি যেন ইদানীং ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বৃহদায়তন শিল্প বিকাশের একটি সূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো দেশে বৃহদায়তন শিল্প যে অনুপাতে বাড়ে, সেই অনুপাতেই মালিকশ্রেণিগুলির সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণি হিসাবে স্বীয় অবস্থা সম্পর্কে আলোকিত হওয়ার জন্য সে দেশের শ্রমিক শ্রেণির দাবি বাড়ে ; তাদের মধ্যে প্রসার লাভ করে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন' ।

পোস্টার

আদিত্য সেন

আজ কার্শিয়াং স্টেশনে পাথরের গায়ে একটা পোস্টার পড়েছে। সারা কার্শিয়াং সে পোস্টার নিয়ে তোলপাড়। কে পোস্টার ছাড়ল, কার বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল? যেন ব্রেকিং নিউজ কিংবা সংবাদপত্রে ব্যানার হেডলাইন। কার্শিয়াং ছোট্ট পাহাড়ি জায়গা হলে কী হবে এই রেলওয়ে স্টেশনে ট্রয় ট্রনটা আগে থামে তারপর সোজা দার্জিলিং চলে যায়। তিনধারিয়ার পরেই মনোরম কার্শিয়াং, তার এক ধাপ পরে আকর্ষণীয় ট্যুরিস্ট স্পষ্ট দার্জিলিং। সবার কাছেই একই জিজ্ঞাসা। যে শোনে সেই জিজ্ঞেস করে—কার বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল? এবং প্রশ্ন করে পাহাড়ের পোস্টার স্লেটের কাছে দেখতে যায় কে সে? পোস্টার কেন পড়ল? রবিদাসের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সুন্দরী মেয়ে হলেই সে যুববাণীর প্রোগ্রাম পায়। কতটা খুশি করতে পারল তার ওপর নির্ভর করছে (যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক) কে কতবার এবং কত শীঘ্র প্রোগ্রাম পাবে। সাংঘাতিক অভিযোগ তো। সত্য হলে তো কেলেঙ্কারি। আমার তাড়াতাড়ি আছে বলে শিলিগুড়ি থেকে সোজা পাঙ্খাবাড়ির আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি কার্শিয়াং-এ উঠে এলাম। এসে দেখি রবিদাসের মতো জনপ্রিয় মানুষ আহত হয়ে পড়ে আছে পাথরের গায়ে। আর

একজন বলল, নিশ্চয় তখনো সাতটা বাজেনি, কারণ তারপরেই রবিদাসের লোক বা নিজে এসে পোস্টারটা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে।

বাকিরা সব অর্ধেক পোস্টারটা দেখতে ছুটে গেল। পড়া যাচ্ছে না তাতেই বা কী, পোস্টার তো বটে। হলই বা ছেঁড়া, কিছু একটা অভিযোগের নিশ্চয় কারণ ঘটেছে, নয়তো ওরকম একজন জনপ্রিয় লোক কি সহজে আহত হয়? আরে পোস্টার কী ভয়ংকর শক্তিশালী অস্ত্র এই কার্শিয়াং-এ, নয়তো রবিদাস নিজে এসে পোস্টার ছিঁড়ে চলে যায়?

রেললাইনে বসে যারা গালগল্প করে তারা আড্ডার নতুন খোরাক পেয়ে হাসছে আর বলছে এই একই কথা বারবার। অন্য দল খোরাক পেয়ে হাসতে হাসতে দাবাখেলার ঘুটি চালছে। রাস্তার ওপারে রেলিং, সেখানেও লোকেরা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পোস্টারের খোসগল্পে মেতে উঠেছে।

সরোজ খুব উত্তেজিত হয়ে বলল, শুনেছ দীপিকা, শহরে পোস্টার পড়েছে।

'তুমি রবে নীরবে'— গানটা প্রাণ ঢেলে গাইছিল দীপিকা, গানটা হঠাৎ থামিয়ে বলল, সেই পাথরে, রেল স্টেশনের সামনে?

হ্যাঁ, তাই। সারা শহর এ নিয়ে উত্তেজিত।

আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও, না? দীপিকা হেসে বলে ওঠে।

আমার আর কী কাজ বলো? এই নিয়েই তো আছি।

দাঁড়াও, আমার সঙ্গে কথা বলতে হলে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। স্বামীকেই এই সময়ে ধারে কাছে আসতে দিই না, তুমি তা কোনরে ছাড়।

সরোজ চেয়ারে বসতে বসতে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি তো চিরকালই অপেক্ষা করে আছি কে কখন কথা বলে। আর তুমি তো আমাকে গান শোনাচ্ছ।

আমি কাউকে গান শোনাই না। গানটা যে কার জন্যে করি ঠিক জানি না। হতে পারে নিজের সুখের শান্তির জন্য। কিংবা কে জানে কখনো কী, আশা করি রবীন্দ্রনাথের মতো, তিনি নিজে এসে বসে আছেন আমার গান শুনবেন বলে।

বলেই আবার গান ধরল দীপিকা। 'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম/নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম....জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি,/তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।/'

দীপিকা এই গানটা বড় প্রাণ ঢেলে গায়। আর একদিন ঝড়বাদলবৃষ্টির মধ্যে গানটা গাইছিল দীপিকা। সরোজের মনে হচ্ছিল যেন সব কথাগুলি ওর জীবন নিয়ে লেখা— 'জাগিবে একাকী তত করুণ আঁখি/তব অঞ্চল ছায়া মোরে রাখিবে ঢাকি।'...

সরোজ জলঢাকা হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রোজেক্টে কাজ করছে আট বছর হয়ে গেল। সে বছরেই ওর বন্ধু মিহির অল ইন্ডিয়া রেডিওতে বদলি হয়ে এল। তখন থেকে সরোজের সঙ্গে ওদের বন্ধুত্ব। সরোজের আনন্দদুঃখযন্ত্রণা সবই দীপিকাকে ঘিরে। কিন্তু কোনো কথাই ও বলতে পারেনি কোনোকালে। দীপিকাকে যে এত ভালোবাসে সরোজ সেকথা কদাচ নয়। মিহির হয়তো কিছুটা আন্দাজ করে কিন্তু মিহির চিরকালই বড়ো নীরব মানুষ। কখনো উঁচু গলায় ওকে প্রতিবাদ করতে দেখেনি কখনো। সরোজ আবার ঠিক উল্টো। যাকে পছন্দ করে তার সঙ্গে মিলেমিশে ভরাট করে রাখে তার জীবনকে। দীপিকার সংসারের যাযা প্রয়োজন সেসব তো ও করে দেয়ই, প্রয়োজনে দীপিকার ছেলেটাকেও পৌঁছে দিয়ে আসে স্কুলে। অবশ্য নিজের অফিসের কাজ বাঁচিয়ে।

গান শুনলে অনেকের মন স্তব্ধ, নীরব হয়ে যায়— বিশেষ করে এরকম একটা ভুবনজোড়া গান। কিন্তু সরোজের এসব গান শুনলে কার সঙ্গে কি গভীর বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে সেসব কথাই মনে হয়। তার থেকে উদ্ধারের কোনো চেষ্টাই সে করেনি। যেন যা করছে এটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক।

আবার একটা গান ধরল দীপিকা। কাকে ও শোনাতে চায় দুতিনটে গান গাওয়ার পরেও তা ঠিক বোঝা গেল না। এখন গাইছে আর একটা ওর প্রিয় গান তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা,/মম শূন্যগগনবিহারী।

সরোজ না হয়ে যদি অন্য কেউ হত তবে হয়তো উঠে যেতে যেতে বলত, তুমি গান করো, আমি অন্য সময় আসব। নেহাৎ শহরে পোস্টার পড়েছে, সারা শহর সে নিয়ে কথা বলছে। অথচ না আছে ধারে কাছে মিহির, না দীপিকা। ওরা দুজনে যেন অন্য এক জগতের লোক। ছেলেটাও ওরকম হয়েছে। সাত বছর বয়স, এখনই হাতের আঙুল তুলে তুলে ঠেকা দেয়।

আবার একটা গান ধরল দীপিকা 'যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম। কে যে আমায় কাঁদায় আমি কী জানি তার নাম।'...

এ গানটা হয়ে যাবার পরে থামল দীপিকা। বলল, এতক্ষণ চুপচাপ বসে আমার গান শুনেছ। তোমার কিছু পাওয়া উচিত। চা খাবে? না থাক, আবার কমলাকে বিরক্ত করা কেন?

বড়ো ভালোমানুষ সেজো না তো! কমলাকে ডেকে দুকাপ চা করতে বলল দীপিকা। তারপরে বলল, এবার বলো কী হয়েছে শহরে।

এতক্ষণ পরে সরোজ আবার ফেটে পড়ল উত্তেজনায়। বলল, রবিদাসের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়েছে। সে নাকি সুন্দরী মেয়ে হলেই যুববাণীর প্রোগ্রাম দেয়, যোগ্যতার অত তোয়াক্কা করে না। শহর আলোচনা করছে আর পরবর্তী সময়ে কার বিরুদ্ধে পোস্টার পড়বে বলছে। লোকে বলছে রবিদাস নিজে এসে তার

পোস্টার ছিঁড়ে চলে গেছে। তা নিয়ে সারা শহর হেসে অস্থির। আমারও হাসি পাচ্ছে। দীপিকা হাসতে হাসতে বলল, কেন জানো?

সরোজ বিহ্বল দৃষ্টিতে দীপিকার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কতদিন থেকে এসব কথা জানি। পোস্টার আমাকে তবে কেন বিচলিত করবে বলো!

তা বটে, তুমি জানো? আগে থেকে জানলে বিচলিত হবার তো প্রশ্নই ওঠে না। মিহির আরো ভেতরের খবর দিতে পারত। ও কোথায় গেল?

ও একটা জরুরি অফিসের কাজে শিলিগুড়ি রেডিও স্টেশনে গেছে। তোমার কি ছুটি আজ? তাহলে তুমি না হয় আমাদের সঙ্গে দুপুরে খেয়ে যাবে।

অতক্ষণ আমি থাকতে পারব না। তাছাড়া আজ একটু শহরের লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা খুব জরুরি। কবে আমাদের বিরুদ্ধে আবার না পোস্টার পড়ে কে জানে।

ও, তাই বুঝি ভয় পাচ্ছ? তা তুমি তো ভয় পেতেই পারো। কিন্তু আর বেশি দূর গেল না দীপিকা। অতি বুদ্ধিমতী মহিলা। কখনো কোন কথা চেপে যেতে হয় খুব ভালো করে জানে দীপিকা।

ততক্ষণে চা এসে গেছে। অনেকক্ষণ গান শুনেছ বলে, আমার উপহার— হেসে দীপিকা বলল।

তখন সরোজের ভেতরটা গুঞ্জরিত হয়ে উঠল— ভাবল এই দীপিকাকেই সরোজ এত ভালোবাসে। শুধু বলল, তোমার উপহার পেয়েই তো বেঁচে আছি। নয়তো আমার অন্তত বেঁচে থাকার কী সার্থকতা বলো। দাদা অত বড়ো ডাক্তার। টি.বি. স্যানাটোরিয়ামের দুর্ধর্ষ মালিক। আমি তার অনামী এক ভাই। কতটুকু আমার প্রাপ্য হতে পারে বলো।

কী যে বলো? ওভাবে জীবনকে দেখতে নেই। আশাভরসা নিয়েই তো আমাদের জীবন। বঞ্চিত ভাবলেই দুঃখ যন্ত্রণাটা পেয়ে বসে। এই যে কথাটা বললে, এটা আমাকে দারুণ বল-ভরসা দিল। আসলে তোমাদের বল-ভরসাতেই তো বেঁচে আছি। আজ উঠি। একটু জরুরি কাজ আছে শহরে।

তার মানে আজ রেলওয়ে স্টশনে সারাদিন কাটাতে চাও। তোমার সেই ধৈর্য আছে, মিহির এটা একেবারে পারে না, তাই ওর সুখ-দুঃখের বোধটুকু একটু কম।

।। দুই ।।

শহরে পোস্টার পড়ার পর যেসব কাণ্ড নিঃশব্দে ঘটে তার সঠিক বর্ণনা দেবার ক্ষমতা কারুর নেই। তখন সংশোধনের পর্ব চলে। কেউ জানে না কীভাবে নিঃশব্দে সেই কর্মকাণ্ড চলতে থাকে, যাকে রাজনৈতিক ভাষায় বলা হয় ড্যামেজ কন্ট্রোল। সরোজ জানতে পেরেছে এবার স্যানাটোরিয়ামের বিরুদ্ধ পোস্টার পড়বে। এবং তার পরেই সেটা গড়িয়ে আসবে ওর দিকে, ওর চালচলন ও জীবনযাপনের ওপর। তার মানে ওর সঙ্গে দীপিকার যে মধুর একটা সম্পর্ক তাও জনসমক্ষে আসবে? লোকেরা তা নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে যা তা কথা বলবে। লোকেদের কথাবার্তায় কোনোকালেই সীমা-পরিসীমা বলতে কিছু নেই। তবু ওকে নিয়ে হয়তো এমন সব কথা বলা হবে যা সর্বৈব মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। হয়তো বলা হবে দীপিকার ছেলেটারও বাপ না হলে কি এতটা কেউ করতে পারে? হয়তো গভীর অনুশীলনের পরে ইঙ্গিতে বোঝা যাবে ওই ছেলেটা আসলে সরোজের, তাই তো ও ওদের অত কাছের মানুষ হয়ে গেছে। না হলে প্রেম করা মানে কি ভেড়া হয়ে যাওয়া?

সরোজ আর ভাবতে পারছে না। শুনেছে সারা শহরে চলেছে ড্যামেজ কনট্রোলের কাজ। রবিদাস সব সুন্দরী মেয়েদের নাকি প্যানেল থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। ঘটনা যাতে আরও সোচ্চার হয়ে লোকের সামনে না আসে তাই সুন্দরী মেয়েদের দু-একজনের প্রোগ্রাম নাকি অলরেডি ক্যানসেল করে দেওয়া হয়েছে। ওখানে নিউজে যে মহিলাটি কাজ করে তাকে খুব ভালো করে চেনে সরোজ। পদ্মরাণির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বহুদিনের আলাপ। প্রাণের কথা বলে। ওর ভাষায় নেপালিতে কথা বলে সরোজ। একদিন নাকি পদ্মরাণি হাসতে হাসতে বলেছিল, সংসারটাকে নিরাপদ রাখতে ওকে অনেক কিছু ছাড়তে হয়েছে। সরোজ বলেছিল, তাই নাকি? তোমার প্রফেসরের খবর কি? দার্জিলিং থেকে আর ফোন করেন কি না? না না, শহরে পোস্টার পড়ছে, এখন আমি ওসবের মধ্যে আর যাচ্ছি না। সুস্থিতে আরামে ঘর করার স্বার্থে অনেক কিছু ছাড়তে হয়। দাজু আপনি আমার বন্ধু বলে বলছি, এসব কথা কাউকে বলবেন না।

দীপিকার কাছে পদ্মরাণির কথাটা তুলবে কি না ভাবছে সরোজ। ওদের দুজনের মধ্যে পারস্পরিক যে আশ্বাস ও বিশ্বাস তাতে এসব কথা বলা মানে ভিমরুলের চাকে হাত দেওয়া। ওরা দুজনে ছাড়া আর কেউ শুনলে বিশ্বাস করবে না যে সরোজ কোনোদিন দীপিকাকে বুকের কাছে টেনে নেয়নি। কখনও হাত হয়তো ধরেছে, তাও দীপিকা অত আগ্রহ করে আশ্বাস দিতে চায় বলে। মিহিরের গোমরানো স্বভাব, ও হয়তো কিছু বাড়তি কথা ভেবে নিতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সরোজের প্রেম নিয়ে কখনো কথা হয় কি না আজ পর্যন্ত জানে না সরোজ। মনে হয় মিহিরের মনে কিছু অন্ধকার থাকলেও দীপিকার মনের উদার আলো জ্বলে বলে সে প্রশ্ন কোনদিন জাগেনি ওর মনে। অবশ্য এও হতে পারে এ-ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করার সাহস হয়নি ওর।

স্যানাটোরিয়াম নিয়ে যদি পোস্টার পড়ে তবে তো সরোজের জীবনযাপনের কথা উঠবেই। গোটা শহর ওকে চেনে, আপনজন

মনে করে। তবে শহরবাসীর মনে স্যানাটোরিয়াম নিয়ে অনেক প্রশ্ন। বলা হয় এই স্যানাটোরিয়ামে যেসব ছেলেমেয়ে টিবি সারাতে আসে যত টাকা তারা খরচ করে তার সিকি ভাগও তাদের ভালো হবার জন্য খরচ করা হয় না। সেসব নাকি ডা. মুখার্জি আত্মসাৎ করেন। এসব কথা কতটা সত্য তা কখনো তলিয়ে দেখতে চায়নি সরোজ, প্রয়োজন বোধ করেনি কখনো। কোনো দুর্নীতির মধ্যে কোনোকালে যায়নি সরোজ। তাও যদি আত্মীয় বলে সরোজের জীবনযাপন নিয়ে কথা ওঠে তাহলে ওর দুঃখের অবধি থাকবে না।

তবে কি জলঢাকা শিলিগুড়িতে ট্রান্সফার নিয়ে নেবে? সেটাই একমাত্র নিরাপদ রাস্তা। এই পাহাড়ে তো সারা জীবন কেটে গেল, আর কতদিন? কিংবা মিহির যদি নিজেকে শিলিগুড়ি রেডিও স্টেশনে বদলি করে নিতে পারে তবে সবচেয়ে ভালো হয়। ও তখন চেষ্টাচরিত্র করে শিলিগুড়িতে চলে যেতে পারবে। হয়তো দুবোতল কস্টলি মাল খাওয়াতে হবে বসকে এই যা! তিনি ওটুকু উপকার করে থাকেন প্রয়োজন পড়লে।

কাল সারা রাত ঘুমোতে পারেনি সরোজ। কেবলি মনে হয়েছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে সারাদিনের জমে থাকা কুয়াশা রাতের অন্ধকারে যেমন ঘিরে ধরে মানুষকে, সেরকম জমাট এক কুয়াশাঘেরা অন্ধকারে সরোজ যেন নিজের জীবনকে হাতড়ে হাতড়ে দেখছে। একদিন তাহলে কাদের নিয়ে সুখ-দুঃখে জীবনটা কাটিয়ে দিল? একে কি জীবনযাপন বলা যায়? না দুঃখ, না সুখ, না রাগ না আনুরাগ। ওরা না চাইতেই ওর কাছ থেকে যা পেয়েছে তা দিয়ে ওর নিজের জীবন কি পরিপূর্ণ হতে পারে? দীপিকার প্রতি এ ভালোবাসা সমাজের চোখে সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

এতদিন সমাজকে কোনোরকম তোয়াক্কা করেনি। আজ প্রথম অনুভব করল, সমাজকে জোর করে উপেক্ষা করা যায় কিন্তু সমাজটা ছায়ার মতো মানুষের চারপাশে ঘোরে। এতদিন ধরে যা করে আসছে তা হঠাৎ বন্ধ করবে কীভাবে সরোজ? এ যেন ওর বাঁচা ও মরণের সমস্যা। যদি দীপিকার কাছ থেকে সরে আসে তাহলে একা একা মনের জ্বালায় ওর গভীর এক নিরালায় দিন কাটাতে হবে। আর যদি মনে হয়, জীবনটা যেভাবে চলছিল, চলুক না দেখা যাবে নৌকো শেষমেশ কোনো ঘাটে এসে পাড়ি দেয়—তাহলে লোকে বদনাম দেবে, শহরে পোস্টার পড়ার এক লোভনীয় বস্তু হয়ে উঠবে।

এতসব কথা ভাবতে ভাবতে সরোজ দীপিকার কাছে গিয়ে হাজির হল। এক রাতের মধ্যে ওর যা চেহারা হয়েছে দীপিকা ওকে যেন চিনতে পারছে না।

সরোজ মিহিরকে বলবে তার উপায় নেই, আজো মিহির বাড়ি নেই। দীপিকা বলল, ও বলে গেছে ওসব পোস্টার-ফোস্টার নিয়ে অকারণে যেন সরোজ মাথা না ঘামায়। সুবিধে মতো ওর সঙ্গে কথা বলবে।

দীপিকা সরোজকে আরো একটু গভীরভাবে দেখে নিয়ে বলল, কী হয়েছে তোমার? রাতে তো ঘুমোচ্ছো না মনে হচ্ছে। কী এমন হঠাৎ ঘটল যাকে তুমি এত মূল্য দিয়ে নিজের জীবনের কথা এত তলিয়ে ভাবছ। আমাদের পরিবারের সঙ্গে আলাপ হবার মুহূর্তেই তো তোমার এসব নানা কথা ভাবা উচিত ছিল। এতদিন পরে যা কিছু করেছ তা তলিয়ে দেখার মানে হয়?

এ তো তোমার দৃষ্টি দিয়ে তুমি তোমার জীবনকে দেখছ। সেখানে আমি তো নেই। এই প্রথম জীবনে আমার মনে হল আমি আছি, আমার একটা জীবন আছে।

শহরের একটা পোস্টার যা অনেকটা উপহাসের মতো ব্যাপার নেপালিদের কাছে, তার এত মূল্য দিয়ে তুমি যখন আমাদের জীবন থেকে সরে দাঁড়াতে চাইছ— তখন আমি কোন মুখে বাধা দেব? আমি যেটা করতে পারি—

বলো কী করবে?

মিহিরকে শিলিগুড়িতে বদলি করতে চাইছে। আমি বাধা দিচ্ছিলাম, আজ রাতেই ওকে বুঝিয়ে বলব, তুমি রাজি হয়ে যাও। সেটাই একমাত্র পথ দেখছি, যদি আমার খুব কষ্ট হবে। নিরালা মুহূর্তগুলিতে সারাক্ষণ হয়তো তোমাদের কথাই ভাববে। তবু বলছি এখনো আমাকে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে, সময় বড়ো দাপাদাপি করছে। এটা আমার জীবনের সন্ধিক্ষণ।

বেশ তাই হোক। তোমার জন্য আমারও খুব কষ্ট হবে। আমারও হয়তো জীবনের একটা মোড় । ছেলেটা বড়ো হচ্ছে। বুঝতে শিখছে। ওর মনে মায়ের সম্পর্কে যেন কোনো সংশয়ের বীজ মহীরুহ হয়ে না ওঠে। আমি জানি তুমি আমাকে এ সম্ভাব্য মিথ্যাবাদের থেকে বাঁচাতেই এরকম একটা পথ বেছে নিচ্ছ। যা মিহির কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি তা তুমি তোমার দূরদর্শিতায় করে দেখালে।

দীপিকা এগিয়ে এসে সরোজের হাত ধরল।

অরিন্দম উধাও

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

১

গাড়ি থেকে নামতেই দুজন সুবেশা তরুণী তার দিকে এগিয়ে এসে দুজন দুদিকে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অভিজাত কায়দায় একই সঙ্গে আমন্ত্রণ জানাল সরসীকে,'ওয়েল কাম ম্যাডাম'। তারপর সরসীকে এসকর্ট করে করে নিয়ে চলল। প্রেক্ষাগৃহের পেছনের বিশেষ গেট দিয়ে ঢুকল তারা। একদম সামনের সারিতে সরসী স্যানাল নাম লেখা এক আসনে বসতে অনুরোধ করল। সরসী বসল। ওদিক থেকে ততক্ষণে তাকে দেখে ফেলেছে ফিল্ম ডিরেক্টেরেটের চিফ অফিসার মনোজ শ্রীবাস্তব। ছুটে আসে,বলে, ম্যাডাম কোনো অসুবিধা হয়নি তো ?

সরসী মাথা নাড়ে, না , চমৎকার ব্যবস্থা। ফাইন। তারপর, কেমন আছ্ম ছেন আপনি ? এবারের বার্লিন ফেস্টে আপনাকে দেখলাম না যে ?

না, ম্যাডাম, কী করে যাব, ঐ সময় যে এখানে প্যানোরামা সিলেকশন পড়ে গেল। তাই যেতে পারিনি। চৌহানকে পাঠিয়েছিলাম। দেন, হাউ য়ু এনজয় বার্লিন ফেস্ট ? এবার আপনার ওখানে কোনো ছবি ছিল নাকি ?

ঘোড়েল চিজ, মনে মনে বলল সরসী। সব জানে। নিজেই তো কলকাঠিটা নেড়েছে। বিপাশার প্রযোজকের কাছ থেকে টাকা খেয়ে তার ছবিটা আটকে বিপাশার ছবিটা বার্লিন পাঠাল। টাকার

খেলার মাস্টার মনোজ। জাতীয় পুরস্কারে বেস্ট অ্যাকট্রেসটাও আটকাবার চেষ্টা কম করেনি। কিন্তু শেষ অবধি পেরে ওঠেনি। ইনফরমেশন মিনিস্টারের কড়া অর্ডার ছিল এবার সরসীই যেন সেরা নায়িকার পুরস্কারটা পায়। ইনফরমেশন মিনিস্টার রীতিমতো তার ফ্যান। এর জন্যে অবশ্য তাকেও কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। যাই হোক, মিষ্টি হেসে সে মনোজকে বলে, না, তবে ওখানকার আমন্ত্রণ ছিল। হসপিটালিটিও দিয়েছিল।

মনোজ বলে ,'বাহ, এতো আমাদেরও গর্ব। এখুনি অনুষ্ঠান শুরু হবে। রাষ্ট্রপতি বোধহয় এসে গেলেন।

মনোজ চলে গেলে চারিদিকে তাকায় সরসী। দিল্লির সিরি ফোর্টের এই প্রেক্ষাগৃহটি দারুণ। আগেও এসেছে সে। তবে দিন দিন যেন আরও সেজে উঠছে। এবার যেন আরও ভালো লাগছে এই হলটিকে। সেটা স্বাভাবিক। এবার সে সারা ভারতবর্ষের সিনেমা দুনিয়ার সেরা নায়িকা। খোদ রাষ্ট্রপতি তার হাতে পুরস্কার তুলে দেবে। সে খুব মন দিয়ে হলের চারপাশটা দেখতে থাকে।প্যাসেজে দাড়িয়ে আছে ব্যাজ পরিহিতা সব ঝকঝকে তরুণীরা। তারা সব উপস্থিত অতিথিদের দেখভাল করছে।

স্টেজের পর্দা তখনও খোলেনি। সামনে থেকে একটা ক্যামেরা তাকে তাক করছে। সরসী একটু সরে তার বেস্ট অ্যাঙ্গেলটা ক্যামেরার দিক করে রাখে। একটু ঝুঁকে চেয়ারের 'বেস্ট অ্যাকট্রেস সরসী সেন' লেখাটা যাতে ক্যামেরায় ধরা পড়ে তার ব্যবস্থা করে দেয় দুরদর্শনের ক্যামেরাম্যান। সে ওদিক থেকে মাথা নামিয়ে একটু হাসে। সরসীর ক্যামেরা কনসাসনেস দেখে সে খুশিই হয়। সরসী জানে সারা ভারতবর্ষে এটা লাইফ টেলিকাস্ট হচ্ছে। ভারতে কেন? বলা ভালো সারা পৃথিবীতে। সরসী চেয়ারটায় পাশে এসে বসে এবারের শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পাওয়া দীপায়ন দাশগুপ্ত। সরসী তার দিকে তাকিয়ে তার চেনা হাসিটি দেয়। দীপায়ন চেয়ারে বসতে বসতে হাসির প্রত্যুত্তর দেয়, বলে, কেমন আছ ? সকালের ফ্লাইটে এসেই হোটেলে তোমায় না দেখে খোঁজ করছিলাম। ইনফরমেশান ডেস্ক থেকে জানাল ,তুমি এখনও ল্যান্ড করোনি।

সরসী ঘাড় ঘুড়িয়ে উত্তর দেয়, আসলে সকালে একটা শুটিঙ ছিল। সুব্রতর ছবিটার সামান্য কাজ বাকি ছিল। অনেকদিন ধরে ধরেছিল ডেট দেওয়ার জন্যে। কিছুতেই সময় দিতে পারছিলাম না -আজকের সকালটা দেখলাম ফাঁকা আছে - প্রাইজ নেওয়ার জন্যে বিকেলে এলে তো আর ক্ষতি নেই -তাই তিনটের ফ্লাইটাই ধরলাম।

দীপায়ন হাসে, দারুন বিজি, গুড, তার মানে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এখানে। লাগেজ ?

সরসী টিপ্পনিটা সহ্য করে নেয়, বলে, হোটেলে পৌঁছে যাবে। ইতিমধ্যে উৎপল চক্রবর্তী নামে একজন বয়স্ক লোক এসে সরসীকে সামনে দাঁড়ায়, সরসী প্রশ্ন করে, হ্যালো, কেমন আছ ? চিনতে পারছ ?

আপনাকে কী ভোলা যায়. আপনি কেমন আছেন, কোনো খোঁজ খবর নেই কেন ? সরসী জিজ্ঞেস করে।

আমি তো এখন এখানে নেই। আমেরিকায় ছবি করছি ইংরেজিতে - এর একটা আলাদা মার্কেট আছে জানেন তো ?

রিয়েলি ইন হলিউড, সরসী ইচ্ছে করেই রিপিট করে। কেননা ও জানে ইদানিং কিছু এন আর আই মার্কিনিদের বাংলা ছবি করার সখ হয়েছে। এখান থেকে পরিচালক আর আর্টিস্ট নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ি আর তার আশেপাশেই শুটিং করে। আর পরিচালকেরা কলকাতায় এসে বলে আমেরিকায় ছবি করছি। দেখা গেল এটাও ঠিক তাই।

উৎপল বলল, নো, নট ইন প্রপার হলিউড, আমি ছবি করছি বোস্টনে। এখানে এসেছি এদের আমন্ত্রণে, - বাই দ্য ওয়ে, তুমি তো এবার শ্রেষ্ঠ নায়িকা - কোন ছবির যেন ---

'আক্রান্ত'।

ওটা নবীনের ছবি না ? শুনেছি নবীন নাকি তোমাকে ব্লক করার চেষ্টা করেছিল ? তোমার সঙ্গে নবীনের সম্পর্ক কীরকম এখন? ঠিক আছে।

অরিন্দমের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল, ইজ ইট আ কেস অফ কিডন্যাপিং ?

জানি নাখ

সাতদিন তো হয়ে গেল - কোনো খোঁজ খবর নেই----ভাবাই যায় না, আমরা একটা সভ্য দেশে আছি ----ঠিক আছে, আমি আছি - পরে কথা হবে ---

দীপায়ন এতক্ষণ চুপ করে বসে কথা শুনছিল। দীপায়ন এবার সরসীকে বলে, হামবাগ, চিরকাল এক রকম রয়ে গেল ! আচ্ছা সরসী , অরিন্দম আপনার এই পুরস্কার পাওয়া ছবিটারও নায়ক তো ?

না, সেকেন্ড লিড ছিল, নায়ক হল জিৎ চ্যাটার্জি ।

অরিন্দমকে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে খবর কী ? এটা আত্মগোপন না অপহরণ ---

ঠিক জানি না ---

পুলিশ কী বলছে ---

সরসী উত্তর দেওয়ার আগেই পর্দা খুলে যায়। অনুষ্ঠান শুরুর ঘোষণা হয়। এদিকে দেখা যায় কিছু মানুষ তীক্ষ্ণ ভাবে সরসীর দিকে নজর রাখছে। সরসী সেটা অবশ্য খেয়াল করেনা। সে তখন মন দিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণ শোনে। যারা সরসীর দিকে নীরবে নজর রাখছিল তাদের মধ্যে কিছু মহিলাকেও দেখা যায়। তারাও

নজর রাখছে সরসীর ওপর। একজন কী সব নির্দেশ দিল যেন, আর মেয়েগুলো প্রেক্ষাগৃহের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এইসব ঘটনা যখন ঘটছে তখন এক মন্ত্রীর ভাষণ চলছে । মন্ত্রীর ভাষণের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানশুরু হয়।প্রথম দুএকটা পুরস্কারের পরেই সরসীর নাম ঘোষণা হয়। সরসীর ওপর একটা স্পট লাইট এসে পড়ে। একজন সুবেশা তরুণী এসে তাকে মঞ্চে যাবার আমন্ত্রণ জানায় । সে উঠে মঞ্চের দিকে হাঁটতে থাকে। স্পট লাইট অনুসরণ অনুসরণ করতে থাকে তাকে। এদিকে দেখা যায় সেই ছড়িয়ে থাকা কিছু মানুষও নিঃশব্দে অনুসরণ করছে সরসীকে। তারাও ভীষণ সর্তক। সরসী উঠে পুরস্কার নেয় রাষ্ট্রপতির হাত থেকে। ঘোষিকা তাকে কিছু বলার জন্যে অনুরোধ করলে সে মাইকটা হাতে নিয়ে বলতে থাকে, আমি বাংলাতেই বলব। প্রথমেই বলে রাখি এই পুরস্কার পেয়ে আমি গর্বিত। এ শুধু আমার গর্ব নয়। এই পুরস্কার বাংলা সিনেমার গর্ব। তবে এই পুরস্কার আমাকে আলাদা করে প্রভাবিত করছে না। কেন না, আমি মনে করি সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার হল দর্শকের পুরস্কার। সে পুরস্কার আমি অনেক আগেই পেয়ে গিয়েছি।
সরসী বক্তব্য শেষ করে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় তিন চারজন লোক তাকে ঘিরে ধরে। দূর থেকে ছুটে আসে সিকিউরিটির লোকজন। তিন চারজন লোকের মধ্যে একজন একটা কার্ড বার করে দেখায়। সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটির লোকগুলো সরে যায়। চারজনের মধ্যে একজন সরসীকে বলে ,
ম্যাডাম, আমরা কলকাতা পুলিশের লোক। আপনাকে এখনি আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।
এ সবের মানে কী ? আপনারা যেই হোন এভাবে আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারেন না।-
কোনো জোর এখনও করিনি ম্যাডাম। কোনো সিন করার চেষ্টা

করবেন না। আপনার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট চার্জ রয়েছে । আপনাকে অ্যারেস্ট করার আদেশও আমাদের কাছে রয়েছে - এই দেখুন। অতএব ম্যাডাম , সম্মানজনক ভাবে আমাদের সঙ্গে চলুন, চারজন লোকের মধ্যে একজন তাকে বলে।
সরসীকে নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ে। প্রেক্ষাগৃহে তখন অনুষ্ঠান চলছে।

কলকাতার এয়ারপোর্টে বিমান থেকে এই চারজন লোক সমেত সরসী নামে।
সরসী কোথায় যেতে হবে আমায়?
লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোল রুম , উত্তর আসে।

২

বড়ো একটি হলঘরের একটি কোণের অংশে পার্টিশন দিয়ে ভাগ করা রিপোর্টিং বিভাগটি । গোটা চারেক বড়ো টেবিল, সেখানে সারি সারি কম্পিউটার। তার সামনে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে বসে। একধারে খ বরের কাগজের ফাইল। এরই একটি একটা চেয়ারে বসে অনির্বাণ মন দিয়ে দেখছে একটা টাইম ম্যাগাজিন। 'আজ' কাগজের চিফ রিপোর্টার। তার পাশের টেবিলে বসে কিছু লিখছে সিনিয়র রিপোর্টার সুদর্শন মল্লিক। ২৫/২৬ বছরের , জিনস আর পাঞ্জাবী পরা সপ্রতিভ চেহারার এক যুবতী অনির্বাণের চেয়ারের উল্টো দিকের চেয়ারে এসে বসে পড়ে। তার কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা টেবিলে রাখে। তারপর একটা রুমাল নিয়ে মুখের ঘাম মোছে। তারপর এককোণে রাখা জলের বোতল দিয়ে ঢক ঢক করে জল খায়। বোতলের ছিপি বন্ধ করতে করতে দেখে অনির্বাণ আর সুদর্শন কাজ থামিয়ে দুজনে দু পাশ থেকে কাজ থামিয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে। মালা রেগে যায়, বলে কী দেখছেন বলুন তো ?
আবার ম্যাগাজিন দেখতে দেখতে কার অনির্বাণ বলে, কার কথা বলছেন ? আমি না সুদর্শনদা ?
আপনাদের দুজনের কথাই বলছি। তখন থেকে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন না,
যে মনে হচ্ছে খ
কী মনে হচ্ছে ? ম্যাগাজিন থেকে চোখ না তুলেই অনির্বাণ প্রশ্ন করে।
সেটাই তো জিজ্ঞাসা করছি। আমাকে দেখে কী এমন মনে হচ্ছে যে এমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন ?
এবার সুদর্শন উত্তর দেয়, অনির্বাণ কেন চেয়ে আছে সেটা ওই বলতে পারবে, সত্যিই তো কেন ডিপার্টমেন্টাল হেড তার রিপোর্টারের দিকে তাকিয়ে আছেন সেটা বোঝা শক্ত, তবে আমি কেন তাকিয়ে আছি বলতে পারি।
বেশ, বলেই ফেলুন, মালা বলে।
বলব ?
আর সাসপেন্স বাড়িয়ে লাভ নেই দাদা। বলেই ফেলুন।
সুদর্শন বলতে শুরু করে, এই রকম একটা সুপারসুন্দরী মেয়ে। কোথায় ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একের পর এক শট দেবে, চারিদিকে মোসাহেবরা ঘুরে বেড়াবে, তা না ভর দুপুরে কড়া রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘুরে অফিসে এসে নিজেই নিজের ঘাম মুছছে। কী স্যাড !
মালা সুদর্শনের কথা শেষ করতে দেয় না, প্রায় ধমক দেয়ার সুরেই বলে, আমি মরছি নিজের জ্বালায় উনি ভাঁট বকছেন। অনির্বাণ ব্যাপারটা সামলায়, কুল মালা কুল , আজকের স্পেশাল স্টোরি বলো।
অনেক তো ঘুরলাম, কিন্তু কিছুই ক্লিক করছে না, মালা নিরাশভাবে উত্তর দেয়।
ওই যে তোমাদের হিরো অরিন্দম, ওর ব্যাপারে কোনো ডেভলপমেন্ট নেই, এনি ফলো-আপ ? অনির্বাণ প্রশ্ন করে মালাকে।
না, কোনো খবর নেই। লোকটা সেই যে হাওয়া হয়ে গেল, নো ট্রেস।
পুলিশ কী বলছে ?
কিছু বলতে পারছে না। কোথায় যে গেল লোকটা কেউ জানে না। আমি তো টালিগঞ্জ ঘুরে এলাম। কেউ কিছু বলতে পারল না।
আমরা মিডিয়াবালারা তো অনেক খেজুর করলাম। টানা সাত দিন। এবার পাবলিক খবর চায়, খেজুর নয়।
ওদিক থেকে একটি মেয়ে অনির্বাণদের কথা শুনছিল। মেয়েটি পুলিশ বিট করে। বলল, শুনলাম, জয়ন্ত কানুনগো নিজে কেসটা নিয়েছেন।
ইন্টারেস্টিং, অনির্বাণ বলে, তার মানে অন্য কোনো রহস্য আছে। সরল নয় কেসটা। একটু নজরে রেখো।
অনির্বাণ আবার মালার দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে স্পেশাল স্টোরি কী হবে আজ?
সেটাই তো ভাবছি। আচ্ছা, সাত দিন আগে লাস্ট পার্টিতে দেখা গিয়েছিল অরিন্দমকে। পার্টি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি তিনি। নো ট্রেস। সেলফ ড্রাইফ করছিলেন। গাড়িটা পাওয়া যায় বাই পাসের ধারে এক নয়ানজুলিতে। যদি এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা সাসপেন্স গল্প ফাঁদা যায়।

অনির্বাণ মাথা নাড়ে, টিভি এসব দেখিয়ে দেখিয়ে ক্লান্ত করে শেষ। অন্য কিছু ভাব মালা, অন্য
কিছু ভাব।
মালা হঠাৎ অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, একটা স্টোরি আছে ?
ওদিক থেকে সুদর্শন বলে ওঠে, বলে ফেলো।
মালা সুদর্শনের দিকে এক ঝলক রাগত চোখে তাকিয়ে অনির্বাণকে বলে, চিড়িয়াখানায় জিরাফের যমজ বাচ্চা হয়েছে। তাদের নাম রাখা হয়েছে লব কুশ। জন্মেই বাচ্চাদুটো তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।
ওদিক থেকে সুদর্শন, আহা। ওদের মায়ের নাম নিশ্চয়ই সীতা। আর তার ওপর জন্মেই তিরিং তিরিং করে লাফাচ্চে, ভাবা যায় !
ভাল হচ্ছে না কিন্তু। মালা বলে ওঠে। অনির্বাণ মাঝে পড়ে সামাল দেয়। মালাকে বলে, স্টোরি হিসেবে মন্দ নয়। তবে জমিয়ে খেলাতে হবে। ছবি হয়েছে ?
হ্যাঁ। ভাস্করদা তুলেছে।
নাহলে নেমে পড়ো। তবে নবজাতকের মজাটা যেন লেখায় থাকে।
ইতিমধ্যে অনির্বাণের মোবাইলটা বেজে ওঠে। মোবাইলটা কানে দিয়ে, হ্যালো অনির্বাণ বলছি, বলেই কীসব কথা নীরবে শোনে সে, ফোনটা কানে নিয়েই বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে বলে, বেরোচ্ছি। আমি এলে স্টোরিটা ছেড়ো মালা।

৩

জয়ন্ত বেশ খানিকটা অবাকই হয়েছিল। এই ধরনের হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের কেস সাধারণত তার কাছে আসে না। এগুলো থানা লেভেলেই সলভ হয়ে যায়। কিন্তু কমিশনার মিটিং ডাকার পর ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়। জয়ন্ত বুঝতে পারে ব্যাপারটা আর হারানো প্রাপ্তি লেভেলে আটকে নেই।প্রায় চার দিন হল বাংলা ছবির অন্যতম নায়ক অরিন্দম চ্যাটার্জিকে পাওয়া যাচ্ছে না।তাকে শেষ দেখা গিয়েছিল নভোটেল হোটেলের এক পার্টিতে। অনেক রাত অবধি পার্টি চলে। নিজেই গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যান অরিন্দম।তারপর থেকেই তিনি নিখোঁজ। বিয়ে করেননি নায়ক অরিন্দম। একাই। তবে নারীহীন নন।এইতো নায়িকা সরসীর সঙ্গে তাঁর অ্যাফেয়ার ছিল। যাইহোক কমিশনারসাহেব তার হাতে কেস ফাইলটা দেবার পর থেকে প্রাথমিক খোঁজ খবর নিয়ে ফেলেছে সে। কিন্তু অরিন্দম কি বেঁচে আছেন , না কেউ তাঁকে খুন করে লাশ গুম করে দিয়েছে এটাই কদিন ধরে ভাবাচ্ছে তাকে। কেন জানি তার মনে হচ্ছে এই অরিন্দম কেসটার অনেকটাই জানে সরসী। হাতে তেমন কোনো সলিড প্রমাণ নেই। কিন্তু তার মন বলছে এই কেসটার অনেককিছুই জানে সরসী। অতএব প্রথম কাজ সরসীকে চিন্তার এক নম্বর জায়গায় রাখা। সরসী কোথায় সে খোঁজ নিয়ে ফেলেছে সে। সকালে টালিগঞ্জের এন টি ওয়ান স্টুডিও-তে শুটিং করে বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লি যাচ্ছে।এবারের জাতীয় পুরস্কারে সেরা অভিনেত্রী সে। যে 'আক্রান্ত' নামের ছবিটার জন্যে এই পুরস্কার পাচ্ছে সে, তাতেও অরিন্দম ছিল। জয়ন্ত ঠিক করে পুরস্কার পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরসীকে কোনো বিরক্ত করবে না সে। সেই মতোই প্ল্যান করে ফেলে। সরসীর ফ্লাইটেই সাদা পোষাকের পুলিশ পাঠায় সে। তারা সরসীর অজান্তেই সরসীর ওপর নজর রাখবে। দিল্লি পুলিশকেও খবর পাঠিয়ে দেয় সে। তারাও কলকাতা পুলিশকে সাহায্য করবে।

কলকাতা থেকে যাওয়া পুলিশের দলে দময়ন্তীও আছে। কলকাতা ক্রাইম ব্রাঞ্চের দুঁদে গোয়েন্দা। পুরস্কারপর্ব শেষ হলেই সরসীকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে কলকাতা নিয়ে আসবে তারা। ঘড়িটার দিকে তাকায় জয়ন্ত। এতক্ষণে তো তাদের সরসী সমেত কলকাতায় নেমে পড়ার কথা। ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই জয়ন্তর মোবাইল বেজে ওঠে। মোবাইল অন করতেই ওধার থেকে শোনা যায়, অপারেশন সাকসেসফুল,স্যর। দয়মন্তীর গলা। জয়ন্ত উত্তর দেয়, প্রসিড টু লালবাজার। 'অ্যাম দেয়ার।

সরসীকে নিয়ে ওরা আসছে। মনে মনে পরর্বতী কাজগুলো সাজিয়ে নিতে থাকে জয়ন্ত। কেসহিস্ট্রিটা আরেকবার ঝালিয়ে নেয়। ঘটনাগুলো পরপর সাজিয়ে নেয়। কিন্তু এখনও অবধি তেমন কোনো আশার আলো সে দেখতে পায় না। লেটস ট্রাই, বিড় বিড় করে বলে জয়ন্ত। ,

'ম্যাডাম ভেরি স্যরি। আপনাকে বিরক্ত করতেই হল। এছাড়া উপায় ছিল না', অফিসে নিজের চেম্বারে ঢুলতে ঢুকতে জয়ন্ত বলে।

সরসীকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে চেয়ারে বসিয়েছে দময়ন্তী। কফি ও স্যান্ডুউইচ আনিয়ে ফেলেছে। যদিও দেখা যাছে সে সব ছোঁয়নি সরসী।

এ সবের মানে কী মিস্টার কানুনগো ? অত্যন্ত রাগত স্বরেই জয়ন্তকে প্রশ্ন করে সরসী।

,কুল ম্যাডাম। কফিটা খান, সব বলছি।

-বোগাস। এইভাবে একটা অনুষ্ঠান থেকে প্রায় জোর করে তুলে আনলেন আমাকে। আপনার অডাসিটি তো কম নয়। আমি কমিশনার সাহেবের সঙ্গে কথা বলব।

জয়ন্ত দয়মন্তীকে বলে, ম্যাডামের মোবাইলটা দাও। উনি কমিশনার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

এবার সরসীর দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বলে, আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনি কথা বলুন। কিন্তু তার আগে একটা কথার জবাব দিন তো? পুরস্কার নেবার পর কোথায় যাবার আপনার প্ল্যান ছিল।

কেন ? অ্যাওয়ার্ড ডিনারে ?

ম্যাডাম , আপনি ঠিক বলছেন না। আমার খবর বলছে, ডিনার তো দূরের কথা, আপনি অ্যাওয়ার্ড সেরিমনিতেও পুরো সময় থাকতেন না। সন্ধে সাতটা পঁচিশে আপনার দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে দুবাইয়ের টিকিট বুক ছিল। আপনি অন লাইনে চেক ইনও করে রেখেছিলেন খ

সো হোয়াট ? আমার দুবাই যাওয়াতে কোনো বাধা আছে ? দেন ?

না তা নেই। আপনার দুবাই যাত্রার ব্যাপারটা না থাকলে, আমাদের এইভাবে আপনার পেছন পেছন দিল্লি ছুটতে হত না।

মিস্টার কানুনগো, এভরিথিং হ্যাজ এ লিমিট। আমার দুবাই যাবার সঙ্গে আমাকে এখানে গ্রেপ্তার করে আনার কী সম্পর্ক ?

গ্রেপ্তার ? আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কে বলল ? গ্রেপ্তার করা হলে আপনি তো লক-আপে থাকতেন ? এ সি-তে বসে কফি খেতেন কি ?

হোয়াট ডু য়ু মিন ? আমাকে যে বলা হল আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ট্রাঞ্জিটে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

এক্সকিউজ ম্যাডাম। এটা না বলে কোনো উপায় ছিল না।এটা না করলে এতক্ষনে আপনি দুবাই-য়ে।

ইয়ু ইয়ু চিট মি? আমি এখনই কমিশনারকে জানাছি।

স্বচ্ছন্দে ম্যাডাম। তবে তার আগে আর একটা কথার জবাব দিন, হঠাৎ জয়ন্তর টেবিলের ইন্টার-কম বেজে ওঠে। জয়ন্ত ফোনটা তোলে, বলে, পাঠিয়ে দিন। সরসীর দিকে ফিরে তাকায়, হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম, ওহ ইয়েস, অরিন্দম চ্যাটার্জি কোথায় বলুন তো ? আই মিন সুপারস্টার অরিন্দম চ্যাটার্জি, লোকটা একেবারে ভ্যানিস। জানেন নাকি, কোথায় আছেন?

আপনি কিন্তু আপনার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন মিস্টার কানুনগো। ফর ইয়োর ইনফরমেশন, যেদিনের পার্টির পর অরিন্দমকে আর

পাওয়া যায় না, সেই পার্টি থেকে আমি আগেই বেরিয়ে যাই।
য়ু মিন, ২৬ সেপ্টেম্বর।
ইয়েস।
সেদিন কি অরিন্দম একটু বেশি খেয়ে ফেলেছিলেন। আই মিন হাই।
সরসী উত্তর দেবার আগেই অনির্বাণ ঘরে ঢুকে সরসীর দিকে তাকিয়ে বলে, হাই।
সরসী অনির্বাণের দিকে তাকায়, তারপর জয়ন্তর দিকে, অতি দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে এক দায়সারা গোছের ভাবে বলে, হাই।
জয়ন্ত বলে, ডোন্ট অ্যাফ্রেড ম্যাডাম। আপনার খবরটা এখনও মিডিয়া পায়নি। জয়ন্ত এসেছে আমার ডাকে। কী জয়ন্ত , কালকের কাগজ ছাড়া হয়ে গেছে তো !
লেট এডিশনের অ্যাঙ্করটা বাকি আছে। আর সব ছেড়ে দিয়েছি। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। এখান থেকে আজ কোনো নিউজ হবে না। আজকের এই তিনজনের মিটিং টপ সিক্রেট। ও কে লেটস স্টার্ট।
অনির্বাণ ফোনে অফিসে পাতা ছাড়ার নির্দেশ দেয় ।তারপর জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে বলে, কী ব্যাপার, হঠৎ আমায় তলব। আমি তো ভাবলাম কোনো খবর দেবে ?
না, উল্টোটাই। তোমার কাছ থেকে খবর নেব। দেন, মিস সরসী দেবী। ক্যান আই অ্যাসক য়ু সাম কোয়েশ্চেনস ? জয়ন্ত সরসীর দিকে আকিয়ে বলে।
প্রশ্নটার কোনো মানে হয় না। আপনার কাজ আপনি করুন, সরসী যেন বিরক্ত।
তাই করছি,জয়ন্ত শুরু করে,আপনার সঙ্গে অরিন্দম চ্যাটার্জির শেষ কবে কোথায় দেখা হয়েছে ?
নভোটেল-এর পার্টিতে।
কখন ?
রাত বারটা চল্লিশে।
এতটা সঠিক করে সময়টা বলছেন কী করে ?
কেননা ও বেরোবার সময় আমাকে বলে, আমি চললাম। আমি বলি, আরেকটু থাকলে পারতে। বলে, না , রাত বারটা চল্লিশ হল, কাল আটটায় কল।
তারপর আর আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?
প্রশ্নই আসে না।
অরিন্দমের অন্তর্ধানের খবরটা কবে পেলেন?
পরের দিন। ওর সেক্রেটারি ফোন করে জানাল, পার্টি থেকে বাড়ি ফেরেনি অরিন্দম। শুটিংও যায় নি ।তারপর তো স্টুডিও পাড়ায় গিয়ে নানা রকম কথা। অল বোগাস। গসিপ।
ম্যাডাম একটু ভেবে দেখুন তো, সেদিনের পার্টির পর আপনার সঙ্গে অরিন্দম চ্যাটার্জির আর দেখা হয়েছিল কিনা?
বললাম তো হয়নি।
বেশ। একটা প্রশ্ন করি, সেদিন মানে পার্টির দিন, আপনি নভোটেল-এর পার্টি থেকে বেরিয়ে কোথায় গেছিলেন ?
অনেক রাত হয়ে গেছিল, সোজা বাড়ি গেছিলাম।

কত রাত?
সাড়ে বারোটা হবে।
আপনি নিশ্চিত আপনি সোজা বাড়ি গেছিলেন?
হাঁ। অবশ্যই।
আপনি ঠিক কথা বলছেন না, ম্যাডাম।
হোয়াট ডু য়ু মিন?
য়ু আর টেলিং লাই। পার্টির পর অন্য জায়গায় অরিন্দমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার।
ক্যান য়ু প্রুভ ইট?
ইয়েস। আই ক্যান। আপনার পাশে যে তুখোড় সাংবাদিকটি বসে আছে সে আপনাদের, মানে আপনাকে আর অরিন্দমকে দেখেছে তাজ বেঙ্গলে, ওই ২৭ সেপ্টেম্বর, না রাত বারটার পর ডেট পালটে যায়, যাই হোক, ওই তারিখে তাজ বেঙ্গলে দেখেছে।
সাক্ষী আপনার সামনেই বসে আছে।
ইম্পসিবল। কোথাও একটা ভুল হচ্ছে।
ভুল হচ্ছে না ম্যাডাম। ফোটো ডকুমেন্ট রয়েছে। অনির্বাণ আপনাদের ছবি তুলেছে। অনির্বাণ , তোমার মোবাইলের ছবিটা দেখাও তো।
অনির্বাণ পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে, একটা ছবি বার করে, জয়ন্তর হাতে দেয়। জয়ন্ত মোবাইলের ছবিটা এগিয়ে দেয় সরসীর দিকে। সরসী এক ঝলক ছবিটা দেখে।
বুঝলাম। ছবিটা আমার আর অরিন্দমের। রুফ গার্ডেন-এ বসে আছি।এটা আমাদ্রে প্রিয় জায়গা। ছবিটা অন্য কোনও দিনের। আর সময়টাও তো স্পষ্ট নয়।

কনফিউজ করে লাভ নেই ম্যডাম। আমি চেক করেছি। আপনারা সেদিন তাজ-এ ছিলেন। রুম নম্বর ৫০২।

৪

সরসী দরজাটা খুলতে গিয়ে দেখল সেটা বাইরে থেকে আঙ্গ টকানো। লকটা আবার ঘোরাল
সে। দরজাটা টানল। খুলল না। কে বন্ধ করল দরজা? চিন্তায় পড়ে যায় সরসী।
ইন্টারকম থেকে সিকিউরিটিকে ফোন করে।
আমার দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। খোলার ব্যবস্থা করুন।
ম্যাডাম, আপনার যা কিছু দরকার আমরা পৌছে দিচ্ছি। দরজা খে ালা যাবে না।
সেক্রেটারির হুকুম, সিকিউরিটি জানায়।
সরসী আর কথা না বাড়িয়ে হাউস কমিটির সেক্রেটারিকে ফোন করে, 'আমার
ফ্ল্যাটের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কেন ?
আপনার ফ্ল্যাটে চাবি দিয়ে গেছে পুলিশ, তাই। আপনাকে বোধহয় নজরবন্দী করা
হয়েছে । সেক্রেটারি দত্ত অতি বিনয়ের সঙ্গে জানায়।
সে কি, আমি ফ্ল্যাট থেকে বেরোতে পারব না ? খানিক রেগে উঠেই কথাটা বলে সরসী।

ব্যাপারটা সে রকম নয়, আসলে পুলিশ অর্ডার। আমরা তো ভায়োলেট করতে পারি না। তবে যা কিছু দরকার আমাদের ফোন করবেন আমরা অ্যারেঞ্জ করব। ইভেন আপনার লাঞ্চ ডিনার ইত্যাদি সবই আমরা পাঠাব। এই সমস্তই হচ্ছে ম্যাডাম সরকারি আইন মেনে।

সো আই অ্যাম কনফাইন্ড ইন এ ফ্ল্যাট ?

ম্যাডাম ইটস আ রুল। নাথিং ডুয়িং। একটা কথা বলি , ব্যাপারটা খুব বেশি লোক জানে না। ব্যাপারটা নিয়ে বেশি হইচই করলে নানা স্ক্যান্ডাল হবে। আপনি আবার সেলিব্রেটি। তার চেয়ে, আঙ্কমার তো মনে হয় ব্যাপারটা দুএকদিনের। ম্যানেজ করে নিন ম্যাডাম।

ননসেন্স। ফোনটা কেটে দেয় সরসী। কী আশ্চর্য ! সে তার বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে

না। কাল রাতে লালবাজার থেকে ফিরতে ফিরতে রাত দুটো হয়ে যায়। পুলিশের গাড়িতে তাকে উঠতে হয়নি।। জয়ন্ত গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে ড্রাইভারকে বলে, ম্যাডামকে পৌঁছে দাও। জয়ন্ত তাকে একটা ফোন নম্বর দেয়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সেই ফোনে ফোন করল সে। রিং বেজেযায় তো বেজেই যায় কেউ ধরে না। ফেড আপ হয়ে যায় সরসী। কিন্তু জয়ন্তের সঙ্গে তো যোগাযোগ করা দরকার। এদিকে তার ফ্ল্যাট বাইরে থেকে বন্ধ। কী করবে ভেবে পায় না সরসী। কিন্তু কিছু একটা করা দরকার। জিৎকে কি একবার ফোন করবে সে। কিন্তু জিৎ-তো বাইরে। তাহলে ? কিছু ভেবে পায় না সে। মনে হয় জয়ন্তরই এসব খেলা।

ঘোড়েল মাল। দেখে তো মনে হয় হাঁদা ভোদা কিন্তু জিলিপির পাঁচে পয়জার। সব খোঁজ রেখেছে, সাতদিন ধরে তার মানে প্রতি মুহূর্তে ফলো করেছে তাকে। সে এক বিন্দুও বুঝতে পারেনি। বিনা অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টে তাকে অনায়াসে দিল্লি থেকে কলকাতা উড়িয়ে আনল। ঘন্টা খানেক কথা বলে তাকে ছেড়েও দিল, বলল, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। আপনি বাড়ি যান। বাড়ি ফেরার গাড়িও দিয়ে দিল তাকে। পুলিশের গাড়ি নয়। পুলিশের গাড়ি দিলে পাছে তার ইমেজ নষ্ট হয়, তাই এ সি ইম্পালা।

ইমেজ? ড্যাম ইয়োর ইমেজ। যা করার তা তো করেই দিয়েছ। সাংবাদিক অনির্বাণ তো সব জানে। সে একটা স্টোরি করেই দিতেই পারে। তবে আজকে আর চান্স নেই। কাল দেখা যাবে। গাড়িতেই পুলিশ কমিশনার সিনহাকে ফোন করেছিল সরসী। সিনহা তার খুবই পরিচিত।কিন্তু তার কথাকে খুব একটা গুরুত্বই দিলেন না। কথা শুনেই বোঝা গেল গোটা এই নাটকটা জয়ন্ত সিনহাকে জানিয়েই করেছে। বললেন, জয়ন্ত সাধারণত ভুল করে না। হি ইজ আ সুপার কপ। পুলিশলাইনে জয়ন্তর বিশাল নামডাক। সে কথা সে আগেই শুনেছে। তার ওপর কমিশনার

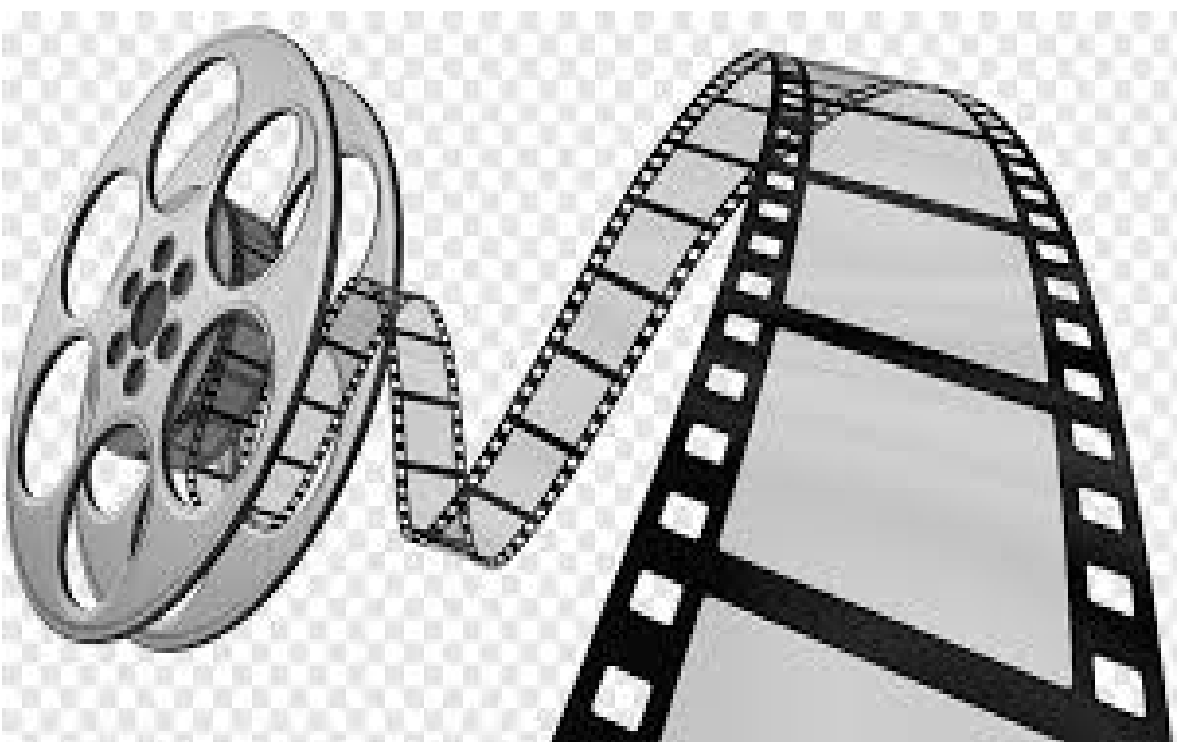

সাহেবের অগাধ ভরসা। চোখ বন্ধ করে তার হাতে কেস ছেড়ে দেন। এসব জানতে ঘন্টা খানেকের বেশি সময় নেয়নি সরসী। বাড়ি ফিরে খুব ক্লান্তই লাগছিল তার। আশ্চর্য ভবিতব্য। এইসময় তার দুবাইয়ে থাকার কথা। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই বানচাল করে দিল ওই ঘোড়েলটা। স্কাউন্ড্রেল। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। তাহলে এটা কী? বাড়িতে নজরবন্দী?

জয়ন্তর নম্বরে আবার একবার ফোন করে সরসী। এবার জয়ন্ত ফোনটা ধরে, হ্যালো। এত সকাল সকাল আপনি ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন।

এসব কী হচ্ছে ? আমার ফ্ল্যাটে বাইরে থেকে চাবি দিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন ? আমি আমি আপনাকেখ

ম্যাডাম কুল। আপনাকে এই অবস্থায় দু'চারদিন থাকতে হবে। এটা আপনার স্বার্থেই। তবে কথা দিচ্ছি কোনো অসুবিধা হবে না। সমস্ত ব্যবস্থার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।এখুনি ব্রেকফাস্ট পৌঁছে যাবে আপনার।

আমার শুটিংখ।

আমি ভালো করেই জানি, এই ক'দিন আপনার কোনো শুটিং নেই।

আপনি কি আমার সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলেছেন?

না, কথা বলার দরকার কি ? এটা তো কমন সেন্স। এই ক'দিন তো আপনার দুবাই-য়ে থাকবার কথা।

সুপার্ব। আপনার যুক্তির অভাব নেই।

এই করেই তো খাচ্ছি ম্যাডাম, ওকে, সি ইউ, ফোন ছেড়ে দেয় জয়ন্ত।

সরসী মোবাইলটা হাত থেকে নামিয়ে জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়।তার এই চোদ্দতলা থেকে কলকাতার এক বড় অংশের স্কাইলাইন দেখা যায়। ভিক্টোরিয়া, দূরে নবান্ন, উলটো দিকে হাওড়া ব্রিজ, ওই তো নিউ সেক্রেটারিয়েট, এদিকে সেই সব চেয়ে উঁচু বাড়ি-'দ্য ৪২'। অরিন্দমের সুপারডুপার হিট ছবি 'সাক্ষর'-এর সাকসেস পার্টি হয়েছিল এই বাড়ির ৩৯তলায়।প্রযোজক বিশাল আদানির ফ্লাট। ৭০০০ স্কোয়ারফিট। বিশালের ফ্লাটের বারান্দা থেকে যেন আকাশ ছোঁয়া যায়।ঘরে মেঘ ঢুকে আসে।আর সেখানকার ঝোলা বারান্দায় দাঁড়ালে যেন মনে হয় কোনো এক স্বর্গরাজ্যে রয়েছি।যাই হোক সেদিন পার্টি দারুন জমে উঠেছিল। অরিন্দম বোধহয় একটু বেশিই খে য়ে ফেলেছিল।হাঁটাচলার মধ্যে একটা বেসামাল অবস্থা ছিল।সে পাশে গিয়ে গলা নামিয়ে বলেছিল,নো মোর অরু।

সরসী অরিন্দমকে অরু বলেই একান্তে ডাকে।তাদের মধ্যে কি প্রেম ছিল? না, শুধুই শরীর। শরীরী দেয়া নেয়া তো তাদের মধ্যে অনেকদিনই শুরু হয়েছিল। শরীরী অভিযানের ব্যাপারে ইন্ডাস্ট্রিতে একধরনের দুর্নাম বা সুনাম ভালোই ছিল অরিন্দমের। সরসী যখন প্রথম সিনেমা জগতে আসে তখন অরিন্দমকে নিয়ে অনেক গসিপই শুনেছিল।তখন আর তার বয়স কত ? সবে প্রপ্ত বয়স্ক হয়েছে। কলেজের গণ্ডি পেরোয়নি। সেই সময়ই কলেজের এক সেমিনারে এসেছিলেন সুজিত গাঙ্গুলি। অন্য ধারার পরিচালক। দু'বার সেরা চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। বাণিজ্যিক বাজারে তাঁর ছবি তেমন না চললেও দেশ বিদেশের ফেস্টিভ্যাল সার্কিটে তাঁর ছবির বেশ কদর আছে। সেই সেমিনারেই ওকে প্রথম দেখেন সুজিত গাঙ্গুলি। সে নিজে গিয়েই আলাপ করেছিল। কেননা সিনেমার প্রতি টান তখন থেকেই তার মধ্যে বেশ জন্মেছিল। নন্দনে দল বেঁধে সিনেমা দেখার ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা মারা। নন্দন আর বাংলা একাডেমির মাঝখানে নন্দনে ঢোকার একটা পথ আছে। সেখানকার রেলিং-এ আড্ডা মারত। এই রেলিং-এর নাম রেখেছিল তারা দাঁড়। তারা বলত দাঁড়ের আড্ড ডা।সেই দাঁড়ে একদিন জমজমাট আড্ডা।কখন বাংলা একাডেমির গেটে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি কেউই। গাড়ি থেকে নামলেন অন্যধারার পরিচালক সুজিত গাঙ্গুলি। তিনি আবার

ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন দাঁড়ের দিকেই।
এসে দাঁড়ালেন সরসীর সামনে, বললেন, তোমাকেই খুঁজছি।
মুখটা মাথায় ছিল। কিন্তু ফোন নম্বরটা নেওয়া হয়নি সেদিন।
যাইহোক এই আমার কার্ড। কাল আমাকে একটা ফোন কোরো।
সকাল দশটা নাগাদ, বলে আর দাঁড়ালেন না তিনি, হেঁটে গেলেন বাংলা একাডেমির দিকেই।

খানিক হতবাকই হয়ে গিয়েছিল সরসী। পরদিন ঠিক দশটাতেই ফোন করল সরসী, সুজিত গাঙ্গুলিকে। নিজেই ধরলেন ফোন,
নমস্কার, সুজিত গাঙ্গুলি বলছি।
আমি সরসী, আমাকে আজ ফোন করতে বলেছিলেন, কাঁপা কাঁপা গলায় সরসী বলে।
আমার নতুন ছবির জন্যর একটা মেয়ে খুঁজছি। ঠিক নায়িকা নয় কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয় চরিত্র।এই চরিত্রটার জন্যে আপনার মুখই বার বার মনে হচ্ছে। বলে রাখি, চরিত্রটা কিন্তু বেশ চ্যালেঞ্জের।

সরসী ঠিক বুঝতে পারে না স্বপ্ন দেখছে কিনা ! সুজিত গাঙ্গুলি তাঁর ছবিতে অভিনয় করার জন্যে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন !
যদি এই চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি থাকেন তাহলে আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করুন, আমার বাড়িতে, আর কোনো বাড়তি কথা নয়। ফোনটা কেটে দেন সুজিত গাঙ্গুলি।

বাংলায় একটা কথা আছে না কিংকর্তব্যবিমুঢ়। ঠিক সেই ভাবেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে। নন্দনে যে কার্ড দিয়েছিলেন তাতেই ঠিকানা লেখা ছিল। বালিগঞ্জ প্লেস। তখন তো সে উত্তর কলকাতার মোহনলাল স্ট্রিটে। উত্তর থেকে দক্ষিণে এসে পৌঁছেছিল ঠিক সময়ে।
বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি। অনেকেই চেনে দেখা গেল। দরজা খুললেন যিনি তাকে মনে হয় বলাই ছিল। দরজা খুলেই তাকে একবার সঠিকভাবে দেখে নিয়ে ভেতরে আসতে বললেন। বসার ঘরে চ্যাপলিনের বিশাল পোর্ট্রেট। ওপাশে যামিনী রায়। বুক সেলফে উঁকি মারছে গদার অন গদার।এসব যখন দেখছিল তখন কুখন যে পরিচালক তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন জানতেই পারেনি সরসী। সাহস রাখে বটে লোকটা। অনায়াসে তার ঘাড়ে হাত রাখে। চমকে ঘুরে দেখে সুজিতকে।
বা, তোমার লেফট প্রফাইলটা তো দারুন ফটোজেনিক। এটা সুচিত্রার ছিল। সামনে থেকেও তুমি কম সুন্দর নও।
সরসী হাসে, বলে, আপনি যতটা বলছেন ততটা নয়।
বেশ। আমার ছবির যে চরিত্র তার সঙ্গে দারুন মিল তোমার।জানো এই ছবির নায়ক কে ? অরিন্দম।
অরিন্দম ? সরসী আমূল চমকে ওঠে। তার স্বপ্নপুরুষ। অরিন্দমের সঙ্গে অভিনয় করবে সে। ভাবতে পারে না। বিড় বিড় করে বলে, ওর সঙ্গে আমার সিন আছে ? সংলাপ ?
এক নয় একাধিক। তুমিই তো সেকেন্ড লিড।
আর ফার্স্ট লিড?
অর্পিতা, অর্পিতা রায়।
ওরা তো সুপারহিট জুটি।কিন্তু আপনি তো অন্যরকম ছবি করেন।সেখানে তো আপনি গ্ল্যামার স্টার ইত্যাদি ব্যবহার করেন না।
না, এই ব্যাপারটা আলাদা। অরিন্দমের সখ হয়েছে ন্যাশানাল আওয়ার্ড পাবার।তাই আমার সঙ্গে একটা ছবি করতে চায়। এক এন আর আই প্রযোজকও জোগাড় করে ফেলেছে। দিলদার হোসেন। সঙ্গে অর্পিতাকে নিতে চাই। যাই হোক আমি তো কোনো কম্পোপ্রাইজ করি না।তাই আমার মতো করেই স্ক্রিপ্ট লিখেছি। তোমার চরিত্রটা যখন লিখছি তখন বার বার তোমার মুখ টাই মনে পড়ছিল।
কথা বলতে বলয়ে তার কাঁধের অপরে হাতটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামছে। তার স্তনটা স্পর্শ করতে চাইছে। আলতো করে হাতটা সরাবার চেস্টা করে সরসী। পারেনা। হাতটা আরও শক্ত করে চেপে বসে।

সত্যিই লোকটা সাহস ধরে। আজ এই ঘরবন্দি অবস্থায় তার কথা মনে পড়ল সরসীর। লোকটা সিনেমা দুনিয়ায় তার গডফদার। তাই কি ? ঠিকমতো ভাবলে সঞ্জয়ই তাকে সিনেমা দুনিয়া চিনিয়েছে, ঠিক কথা, এই দুনিয়ায় গডফাদার বললে অরিন্দমের নামই বলতে হয়। সঞ্জয়ের ছবির সেটেই অরিন্দমের সঙ্গে তার বেশ অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। না গড়ে ওঠার কোনো কারণ ছিল না। আর চূড়ান্ত ব্যাপারটা ঘটল ওই ছবিরই সাকসেস পার্টিতে।
এই প্রথম সঞ্জয়ের ছবি বাণিজ্যিকভাবে হিট করল। পাশাপাশি দেশবিদেশের ফেস্টিভ্যাল-চেনে ঘুরল ছবিটি। ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিল ছবিটি। সেরা অভিনেতা অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। এসব তো অনেক অরের কথা। তার আগেই তো ৪২নম্বর বাড়িতে ছবির সাকসেস পার্টি।৩৯ তলায়, মেঘের কাছাকাছি। মাঝরাত পার্টি তখন দারুণ জমে উঠেছে। সরসী তখন নেশায় বেশ টিপসি। আর অরবিন্দ তো বেশ আউট। অন্তত সেইরকমই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বোধহয় সেইরকম ছিল না। রাত বারটা বেজে গিয়েছিল। পার্টির ঘরের আলো ইচ্ছাকৃতভাবেই কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অদ্ভুত এক আলোছায়া পরিবেশ। একফুট দুরের লোককেও স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া

যাচ্ছিল না। হঠাৎ তার হাতে একটা টান, বেশ জোরেই। একটানে অরিন্দম তাকে একেবারে তার বুকের কাছে এনে ফেলেছে।

শব্দ কোরো না, ফিস ফিস করে বলল অরিন্দম।

বিরাট হলঘরের একটা খোলা দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল তারা। দরজার পরে ৩৯ তলার খোলা বারান্দা। সেখানেই টেনে নিল তাকে অরিন্দম।

ডানহাত দিয়ে তাকে বুকের কাছে টেনে রেখেছে। ঠোঁটে ঠোঁট। কথাবলার মতো অবকাশ নেই তার। বাঁহাতে দরজাটা টানে বন্ধ করে দিল অরিন্দম। নিচে মধ্যরাত্রির চৌরঙ্গী রোড, আকাশে ঝলমল করছে নক্ষত্রপুঞ্জ। খোলা বারান্দার মেঝেতে তাকে সযত্নে শুইয়ে ফেলল অরিন্দম। সামান্য বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু কোথায় যেন একটা সায়ও ছিল। সেই প্রথম, তারপর তো বহুবার।

৫

আপনার নাম ফয়েজ রানা?

জী।

আপনি কলকাতায় এসেছেন কবে?

২৬ সেপ্টেম্বর।

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয় কোথায় ?

২৬ সেপ্টেম্বর পার্টিতে।

এই পার্টিতে কে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল?

ছবির প্রযোজক বিশাল আদানি।

তাকে আপনি আগে থেকে চিনতেন?

হ্যাঁ। অনেকদিন। আমরা দুজনে একটা জয়েন্ট প্রডাকশন করার চেষ্টা করেছিলাম। শেষ অবধি হয়নি।

কেন?

সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া গেল না।

পাওয়ার তো কথা নয়। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের চলচ্চিত্র বাণিজ্যে তো নিষেধাজ্ঞা আছে। জানতেন না ?

না, সেভাবে জানতাম না।

বাই দ্য ওয়ে অরিন্দমকে সেই ২৬ তারিখের পার্টির পর থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না এটা কি আপনি জানেন ?

জানি, বিশাল বলেছে। পার্টির পর আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি অরিন্দমের ?

না। আমার সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ কোথায় ? বিশাল একটু ইতস্তত করে উত্তর দেয়।

জয়ন্ত তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় ফয়েজের দিকে।

সন্ধ্যে বেলা একটা অ্যাপয়মেন্ট করেছিল সে ফয়েজের সঙ্গে সোনার বাংলায়। এখানেই আপাতত রয়েছে ফয়েজ। ঠিক সাতটায়। নিচ থেকেই ফোন করে সে। ফয়েজকে বলে, নিচে আসুন সুইমিং সাইড বার-এ আছি। মিনিট দশেকের মধ্যেই নেমে আসেন ফয়েজ।

পাশে বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে, জয়ন্ত তাকে অর্ডার দেয় 'টু নিট রাম ওভার আইস'। ফয়েজের দিকে তাকিয়ে, আপনার।

আমি ড্রিঙ্ক করি না।

সামান্য হাসে জয়ন্ত, ও কে, সাবকে লিয়ে কফি।

ড্রিঙ্কস আর কফি আসার পর মূল কথাবার্তা চলছে। জয়ন্তর দেড় পেগ শেষ হতে চলল। মানে ঘন্টা খানেক হতে চলল। ও ড্রিঙ্ক করে খুব স্লো। আস্তে আস্তে তার বুদ্ধিটাও খুলতে থাকে। অনেক নতুন নতুন দিক খুঁজে পায় ।স। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ভাবনা চলে আসে। দেখা যায় সেটা সঠিক। জয়ন্ত আবার ফয়েজকে প্রশ্ন করতে শুরু করে।

আপনি বলছেন পার্টির পর আপনার সঙ্গে আর অরিন্দমের দেখা হয়নি।

বার বার এক কথা বলছেন কেন ? বললাম তো হয়নি।

বার বার এক প্রশ্ন করছি এই কারণে যে যদি কখনও সত্যি কথাটা বলে ফেলেন।

কী বলতে চাইছেন আপনি ?

যাক, এই প্রসঙ্গে পরে আসছি। আগে বলুন তো আপনি কি পাকিস্তানের নাগরিক ?

হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন ?

কারণ আছে মিস্টার ফয়েজ। প্লিজ অ্যান্সার মাই কোয়েশ্চেন।

আমি কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য ?

অ্যাজ ইয়োর উইস, তবে উত্তরটা আমার জানা, মানে আমি খেটেখুটে উত্তরটা বার করে ফেলেছি।

তাহলে আর প্রশ্ন করছেন কেন ?

আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইছি।

আমি ছবি তৈরির জন্যে বেশিরভাগ সময়টাই পাকিস্তানে থাকি।

সেটা আমি জানি, কিন্তু এটা তো আমার প্রশ্নের জবাব হল না।

আমার বাড়ি দুবাই-য়ে।

আর সেই জন্যেই আপনি সহজে ভারতে আসতে পারেন। এসব কথার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না।

পারছেন না, না, খোঁজার চেষ্টা করছেন না।

প্লিজ। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। আজ সন্ধেতে আমার ফ্লাইট। আমি আর আপনাকে সময় দিতে পারছি না।

সময় তো আপনাকে দিতেই হবে, মিস্টার রানা। যতক্ণ না আপনি জানাচ্ছেন অরিন্দম চ্যাটার্জি এখন ঠিক কোথায় যতক্ষণ ।

সেটা আমি জানব কী করে ?

এটা কি ঠিক বলছেন মিস্টার রানা ? আপনার সঙ্গেই তো শেষ দেখা হয়েছিল অরিন্দম চ্যাটার্জির।

হ্যাঁ , সে তো পার্টি-তে।

না। এরপরেও আপনার সঙ্গে দেখা হয় অরিন্দমের।

মানে কি ?

হ্যাঁ। তাজ হোটেলে। ওখানে আপনার নামে একটা ঘর বুক ছিল। নভোটেলের পার্টি থেকে বেরিয়ে সেখানেই যান

অরিন্দম। তারপর সেখানে পৌঁছোন সরসী দেবী। অবশ্য তার আগে আরেকজনের সঙ্গে আপনার কফি শপে বসে কথা হয়। সে হল রিপোর্টার অনির্বাণ।
আপনার এই স্টেটমেন্টে একটি মাত্র ঠিক কথা আছে, তাহল কফি শপে আমার আর একজন রিপোর্টারের কথাবার্তা। অনির্বাণকে আমিই অ্যাপয়ন্টমেন্ট দিয়েছিলাম। আমার পুরো স্টেটমেন্টটাই ঠিক মিস্টার রানা। আপনি পার্টি থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে যান। তাজ-এর কফি শপে বসে অনির্বাণকে ইন্টারভিউ দেন। সেখানেই এক এক করে আসেন অরিন্দম এবং সরসী দেবী। এই অবধি অল ও কে।
কিন্তু তারপর কী হল মিস্টার রানা ?
অ্যাবসার্ড। আজগুবি গল্প বলছেন আপনি।
বেশ, তাহলে আমার একটা প্রশ্নই বাকি থাকে।
আবার প্রশ্ন ?
আজ্ঞে হ্যাঁ, আর সেটা হল অরিন্দম আপনার রুম থেকে পুরোপুরি ভ্যানিস হয়ে গেলেন কী ভাবে ? আপনি কি ম্যাজিক জানেন ?
বোগাস ? আমার কাজ আছে। আর আপনাকে সময় দিতে পারছি না।
আমিও তো আপনাকে আটকাতে চাইছি না। শুধু যদি বলেন সেদিন অরিন্দম আপনার রুম থেকে কোথায় গেলেন !
আপনাকে তো আমি বার বার বলছি পার্টির পর আমার সঙ্গে আর অরিন্দমের দেখা হয়নি।
কেন মিথ্যে বলছেন মিস্টার রানা ? আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে সেদিন রাতে আপনার ঘরে গিয়েছিলেন অরিন্দম এবং সরসী দেবী।
ইম্পসিবল।
কিন্তু তাজ হোটেলের সি সি টিভি ক্যামেরা তো সেই কথাই বলছে মিস্টার রানা।

জয়ন্ত মোবাইল বার করে রানাকে একটা ক্লিপিং দেখায়। বলে, কী দেখলেন , আপনার হোটেলের ঘরের দরজায় অরিন্দম আর সরসী। আপনি দরজা খোলেন। নিজেকে চিনতে পারছেন রানাজী ?
ফয়েজ রানা উঠে দাঁড়ায়। চলে যাবার উপক্রম করে।
পালাবার পথ নেই রানা সাহেব। আপনার সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে।
ইতিমধ্যে জয়ন্তের ইঙ্গিতে চারজন লোক রানা সাহেবকে ঘিরে ফেলেছে।
য়ু আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

৬

ভিক্টোরিয়ার পরীটার গায়ে শেষ সূর্যাস্তের আলো এসে পড়েছে। মায়াবী আলোয়ভরা কলকাতা স্কাইলাইন। মনটা আরও বিষণ্ণ হয়ে যায়। হঠাৎ অরিন্দমের কথা মনে পড়ে। তার শরীরটা নিয়ে অনেক খেলেছে অরিন্দম। নানা সময়ে ভারতের নানা প্রান্তে গেছে তারা একসঙ্গে। কখনও শুটিং-এ, কখনও বা ফেস্টিভ্যালে। শুধু ভারত কেন, ভারতের বাইরেও তো তারা দু'একবার গেছে। যেমন কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। সেখানে ছবি ছিল তাদের। ততদিনে তো অরিন্দম আর অর্পিতা বাংলা ছবির সুপারহিট জুটি নয়। সুজিতের ছবির সাকসেস পার্টির পর থেকেই সে আর অরবিন্দ বাংলা ছবির সুপারহিট জুটি। এর জন্যে অবশ্য অরিন্দমের অনেকটাই হাতযশ ছিল। কেননা অরিন্দমই তো বাংলা ছবির মিস্টার ইন্ডাস্ট্রি। সেই অতি দ্রুত তাকে বাংলা ছবির নায়িকা করে তোলে। যাকে বলে নায়িকা নির্মাণ। পাশাপাশি এই ব্যাপারটাও ঘটতে থাকল, প্রচুর আর্ট ফিল্মের পরিচালক অরিন্দমকে নিয়ে ছবি করতে চাইল। আর অরিন্দমও তার বাণিজ্যিক ইমেজ থেকে একটু বেরোতে চাইছিল। ফলে বেশ কিছু অন্যধারা বা আর্টফিল্মের নায়ক হয়ে উঠল সে। আর সব ছবি ক্ষেত্রেই অরিন্দমের অলিখিত প্রাথমিক শর্ত ছিল ছবিতে সরসীকে নিতে হবে। আর সেই সুত্রেই তো কান ভ্রমণ।এশিয়ান ডিরেক্টর ফোরামে ছিল ছবিটা। কী যেন নাম ? শুন্যতার খোঁজে । পরিচালক দীপেন্দু চক্রবর্তী তখনই বেশ

আন্তর্জাতিক মানের পরিচালক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরই ছবি। সরসীও ততদিনে অন্যধারার পরিচালকের নায়িকা হয়ে উঠেছিল, বাই ডিফল্ট। শেষের দিকে তো সে ক্রমশ অরিন্দমের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। অন্য নায়কের সঙ্গেও তার কেমেস্ট্রি ততদিনে শুরু হয়ে গেছে। এইতো সদ্য যে ছবিটির জন্যে সে সেরা নায়িকা হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেল তার নায়কই তো অন্য।

সন্ধ্যা নামছে। কলেজ জীবনে টি এস এলিয়টের কবিতায় পড়েছিল সন্ধ্যা নামে , যেন অপারেশন টেবিলে রুগী ইথাররাইজড হচ্ছে , মানে অবশ হয়ে আসছে। ইংরেজিতে অনেকটা এইরকমই কিছু লেখা ছিল। হেসে ফেলে সরসী। কবিতা ? সে সবই অতীত। একটা সময় ছিল সুনীল গাঙ্গুলির মতো তারও মনে হত কবিতার জন্যেই এই জন্ম। আবার হেসে ফেলে সরসী। সে সব দিন আর নেই। কবিতার সঙ্গে এখন সম্পর্কহীন সে। এখন তার জীবনে অনেক জটিলতা।
সেই কান চলচ্চিত্র উৎসব। সে আর অরিন্দম পাশাপাশি বসে একের একের পর এক ছবি দেখেছিল। সিনেমা সম্পর্কে ধারণাটাই পালটে যাচ্ছিল তাদের। অরিন্দম সিনেমা পরিচালক হবার স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু কলকাতায় ফিরে ঘটল উল্টোটাই। সরসী ক্রমেই আরও আরও ভালো অভিনেত্রী হয়ে উঠতে শুরু করল। তার জীবনে নতুন নতুন নায়ক এল। এটা সহ্য করতে পারছিল না অরিন্দম। একটা দূরত্ব তৈরি হয়েই যাচ্ছিল।

দরজায় একটা আওয়াজ হল। কেউ বাইরে থেকে দরজাটা খুলছে। কলিং বেলের আওয়াজ। সরসী দরজা খুলে দেখে জয়ন্ত।
গুড ইভনিং ম্যাডাম।
গুড ইভনিং। কিন্তু এসব কী হচ্ছে, আমি কখন মুক্তি পাব ?
আপনার মুক্তির দিন সমাগত ম্যাডাম।
এত বিরক্তির মধ্যেও জয়ন্তর বলার ভঙ্গিমা দেখে হেসে ফেলে সরসী। বলে,
অনেক নাটক হল। এবার আমায় ছাড়ুন।
নাটক তো শেষ অঙ্কে এসে দাঁড়িয়েছে।

অরিন্দমের খোঁজ পাওয়া গেল ?
সেটা এখন আপনার কোর্টে।
মানে কি ?
একটু ধৈর্য ধরুন। আর আমার প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দিন।
আবার প্রস্ন?
হ্যাঁ। কাজের কথায় আসা যাক। সেদিন রাতে আপমি আর অরিন্দম তাজ-এ গেছিলেন কেন ?
আমি আর অরিন্দম একসঙ্গে তাজ-এ যাইনি। তাজ-এ গিয়ে অরিন্দমের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।
আপনি জানতেন না অরিন্দম ওখানে থাকবেন ?
না। নভোটেল থেকে বেরোবার সময় ও আমাকে বলেছিল বাড়ি চলে যাচ্ছে। কেননা সকালের ফ্লাইটে ওর দুবাই যাবার কথা। আর আপনার ফ্লাইটটা ছিল এক সপ্তাহ পরে রাতে।
হ্যাঁ। উপায় ছিল না। আমার সন্ধেতে দিল্লিতে জাতীয় পুরস্কার নেওয়ার জন্যে থাকতে হল যে।
আপনারা দুবাই যাচ্ছিলেন কেন ?
শুটিং সিডিউল ছিল।
কার ছবি ?
ফয়েজ রানার।

কিন্তু ফয়েজ তো কলকাতায়।
জানি। ওর এখানে কিছু কাজ আছে। তাই আমি যাবার দুদিন পরে যাবে বলে ঠিক করেছিল। ওখানে ওর সেকেন্ড ইউনিট কাজ করবে। বেশিটাই অ্যাকশন ডিরেক্টরের কাজ। ওদের ছবির শুটিং-এ ওই সময় পরিচালক না থাকলেও চলে।
কিন্তু কোথাও একটা গোলমাল হচ্ছে। আমার হিসেব মতো অরিন্দমের টিকিট ছিল আপনার সঙ্গে একই দিনে। কিন্তু তার আগেই কিন্তু অরিন্দম নিখোঁজ হয়ে যান। কিন্তু আপনি দুবাই যাচ্ছিলেন ? অরবিন্দ নিখোঁজ জেনেও। নায়ক ছাড়াই দুবাই-য়ে শুটিং হত।
না। ওর আগেই চলে যাবার কথা ছিল। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল তো।
কিন্তু দুবাই যাওয়া বন্ধ হল না।
যাওয়া তো হল না।
জয়ন্ত হাসে, অপরাধে জড়িয়ে পড়লেন যে।

সরসী বেশ বিরক্ত মুখে বলে, কী অপরাধ ?
অরিন্দম অন্তর্ধান রহস্য।
তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ? আমি তো তাজ থেকে অনেক আগেই চলে আসি। তখন ও তো ফয়েজ রানার ঘরেতেই ছিল।
কিন্তু তারপর কী হল ? ফয়েজ আপনাকে কিছু বলেনি।
যখন জানা গেল অরিন্দমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন আমি ফয়েজের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ও জানায় আমি বেরোবার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই অরিন্দম নাকি বেরিয়ে পড়ে।
ফয়েজের কথা মানলে মানতে হয় যে অরিন্দম মাঝ রাস্তাতেই হারিয়ে গেছেন।
সাতদিন পর আপনার আর অরিন্দমের একসঙ্গেই দুবাই যাবার কথা।কিন্তু অরিন্দম নিখোঁজ হবার পর আপনার যাওয়া তো ক্যানসেল হয়নি। কার সঙ্গে শুটিং করতেন ওখানে ?
আমি তো যাওয়া ক্যানসেল করতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু ফয়েজ বলল আপাতত আমার অংশের শুটিংটা ও সেরে রাখতে চায়। তাই আপনি যাবার জন্যে তৈরি হয়ে গেলেন।
উপায় কি। শুটিং-এর সবকিছু তো রেডি। অনেক টাকার ইনভেস্টমেন্ট। আমি না গেলে দায়ভার তো আমার ঘাড়েই চাপত। আমি তো কন্ট্রাক্ট সই করেছি।
ঠিক। কিন্তু আপনি এখনও কিছু গোপন করছেন।
বুঝলাম না।
আপনাকে একটা কথা জানাই, ফয়েজ রানাকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।
সরসী হঠাৎ চমকে ওঠে, না তো। কেন ?
আপনার সুটকেশ যেটা নিয়ে আপনি দুবাই যাচ্ছিলেন সেটা আমরা দিল্লির হোটেল থেকে সিজ করেছি সরসী দেবী। ওই সুটকেস থেকে ড্রাগ পাওয়া গেছে।
মানে?
নিজের ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বার করে জয়ন্ত। সরসীকে সেটা দেখিয়ে বলে, এটা কি ?
এটা তো ফাইন্যাল শুটিং স্ক্রিপ্ট। দুবাইয়ে সেকেন্ড ইউনিটের চিফ ডিরেক্টরকে দেওয়ার কথা।
না। এটা অপর থেকে দেখতে একটা খাতা। কিন্তু ভেতরটা ফাঁপা। সেখানেই তিন কেজি ড্রাগ।ক্যানাবিস।

আমি তো পুরো ফেঁসে যেতাম।
অবশ্যই।
আপনার সঙ্গে সম্পর্কটা আর তেমন ঘন নয়। তাই তো। আপনাদের প্রেমের কেমেস্ট্রিটা তো পালটে গেছে।
সরসী এই কথার কোনো উত্তর দেয় না।
জয়ন্ত বলে চলে, লকআপে সব কিছু স্বীকার করেছে ফয়েজ। ও আসলে যতটা না পরিচালক তার চেয়ে অনেক বেশি ড্রাগ পেডলার। পাকিস্তান থেকে ফিল্ম ডিরেক্টরের ভিসায় ভারতে এসে ও নানা জায়গায় নানা তরিখায় ড্রাগ চালান করে। আপনিও আর ছিলেন তার ভিকটিম।
কিন্তু অরিন্দম ?
হি ইজ নো মোর। অরবিন্দ ফয়েজের স্বরূপটা জেনে গিয়েছিল। তাজ থেকে ফেরার দিন গাড়িতেই অরিন্দমকে খুন করে ফয়েজ। লাশ ভাসিয়ে দেয় গঙ্গায়। এখন লাশের সন্ধান চলছে।

সরসী কান্নায় ভেঙে পড়ে।

তোমার জন্যে ভিলানেল

অনিন্দ্য রায়

তোমার চোখে চোখ রেখেছি ঃ কিছু দেখতে পাই না।
এই কি তোমার প্রেমের ম্যাজিক, যা কেবলই ঠকায়?
তোমার আকাশ ভেঙে পড়ছে চোখের ওপর— তাই না?

আড্ডা মেরে সময় কাটাও?— রক্ তো তোমার ঠাঁই না।
গাঁয়ের শিশু চিকিৎসাহীন— তাও নেই কি কোনো দায়?
তোমার চোখে চোখ রেখেছি কিছু দেখতে পাই না।

আমরা তো আর ভুলেও কোনো মিছিল-টিছিল যাই না।
শূন্য হাতে ভিখিরি মা দাঁড়িয়েছিল ঠায়।
তোমার আকাশ ভেঙে পড়ছে চোখের ওপর— তাই না?

ওরা বলছে, বোকা আমরা— সংসারই সামলাই না!
ফল্গু কি তাই চোখের ও জল— কেউ দেখতে না আর পায়?
তোমার চোখে চোখ রেখেছি কিছু দেখতে পাই না।

না, একা মোর গানের তরী ভাসাতে আর চাই না।
টিটকিরি খাই কিম্বা ধোলাই— কীই বা আসে যায়?
তোমার আকাশ ভেঙে পড়ছে চোখের ওপর— তাই না?

কমরেডরা খেঁকিয়ে উঠল ঃ এ আমার লড়াই না!
ভাঙা আয়নায় দেখলে কি মুখ— কবি অনিন্দ্য রায়?
তোমার চোখে চোখ রেখেছি ঃ কিছু দেখতে পাই না।
তোমার আকাশ ভেঙে পড়ছে চোখের ওপর— তাই না?

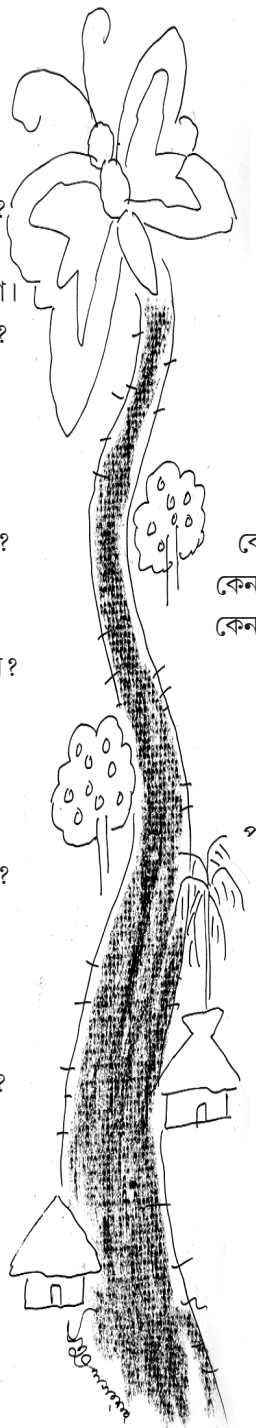

একলা আমি

সঞ্চারী ভট্টাচার্য

কেন দেখিস দু হাত তুলে ভেসে বেড়াবার স্বপ্ন,
যখন জানিস এই চারদেয়ালই তোর সঙ্গী ।
কেন ভাবিস তার হাত ধরে মুক্তির পথে হেঁটে যাবি?
কেন ভাবিস তোর বন্ধ নিঃশ্বাসে আবার প্রাণ ফিরে পাবি!
কেন ভাবিস স্তব্ধ হয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলো আবার ফিরবে?
একে একে যা হারিয়েছে তোর,
কেউ আবার ফিরিয়ে দেবে?
পারবি কি একচোখ স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে?
পারবি কি পায়ের শেকলগুলো কাটতে!
পারবি না বলেই বোধহয় তার কল্পনা নিয়ে থাকিস!
বুঝিয়ে যখন ক্লান্ত নিজেকে,
তবুও কেন ভাবিস?

ধূসর পাণ্ডুলিপি

অদিতি সেনগুপ্ত

হঠাৎ করেই পরিচয় হল তোমার প্রথম যৌবনের সঙ্গে
একবুক বিপ্লবের লাল ফানুসে হঠাৎই বসন্তের ছোঁয়া...
তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে...
আর পাল্টে গেল বিপ্লবের চেহারা!
ক্যাম্পাসে তখন হাওয়ারা চঞ্চল

তারপর জীবন গিয়েছে চলে কুড়ি কুড়ি বছরের পার...
অন্য বসন্তের ছোঁয়ায় জীবনে নতুন রং

তবু, প্রথম পাণ্ডুলিপি ধূসর হলেও অমূল্য...

বৈশাখ

সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশাখ এলেই এলোমেলো বাতাসে বিক্ষিপ্ত রসদ
সাবলীলভাবে শোনাতে থাকে শারীরিক
মেঘলা দুপুরের পথে ছড়ানো বাসনা

সন্ধ্যার গায়ে আনকোরা রাত ঢললেই,
চাঁদ বাঁধা মেয়েমানুষের মতো সামনে দাঁড়ায়
চুলে বেণীতে সাজানো জুঁইবেলী
নগরীর পাহারায় ষড়ঋতু

প্রহরেরা আজকাল বেশ সাবধানী
প্রেমের অভীপ্সায় জানু পেতে বসে
দীর্ঘকালীন ম্যাপ এঁকে যাওয়া চাদর জানে
এ নগরীর অধিপতি কালবৈশাখী।।

মেয়েদের মন

তুলিকা মজুমদার

পাহাড়ি ঝর্ণা দেখেছ?
মেয়েরা অনেকটা তেমন!
ভালোবাসার বৃষ্টিতে স্নাত হলে,
উচ্ছল, উত্তাল যেমন।
আবার, তাকে কাঠিন্য যদি দাও,
শুষ্কতাকে অঙ্গে মেখে,
শুকিয়ে যাবে তাও!
কঠোর পাথরের গা বেয়ে,
রুপোলি যে জলের ধারা,
মেয়েরাও প্রেমিকের মনে,
প্রেম খোঁজে, তেমনই পাগলপারা।
রোদের উজ্জ্বলতা সেই অবগাহে,
যেমন রত্নপ্রমাণ সৌন্দর্য্য আঁকে,
ভালোবাসার আলোয় মেয়েরাও, ঝিকিমিকি
তারাদের মতো থাকে।
কিন্তু, দুর্যোগের করাল আঘাত,
যদি হানা দেয় সেই স্বতঃস্ফূর্ত ধারায়,
ভয়ংকরী প্রপাতের প্রতিঘাতে,
অনুরাগ চিরতরে হারায়।
হায়, কজনই বা বোঝে সেইক্ষণ,
পাহাড়ি ঝর্ণার মতোই, মেয়েদের মন।

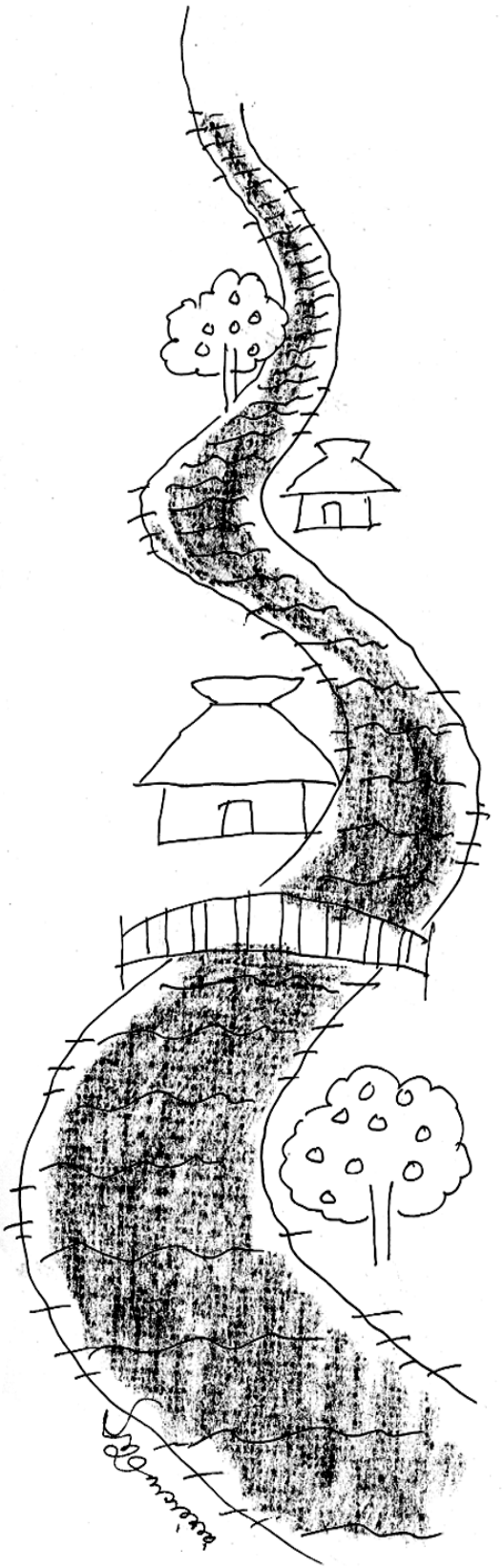

লাশ

মালবিকা মিত্র

বামুনপাড়ার পুকুরে একটা মেয়ের লাশ পাওয়া গেছে।
হেমন্তের বিকেলের মরে আসা আলোয় সেই লাশ দেখতে ভিড় জমিয়েছে
তামাম গ্রামবাসী।
এলো চুল, অবিন্যস্ত লাল পেড়ে সাদা শাড়ি।
হাতের গোছায় সরু শাঁখা, পলা।
আগের দিনের সিঁদুর লেপ্টে আছে সারা কপালে।
হেমন্তের ফ্যাকাশে রোদ এসে পড়েছে তার মুখে।
ভাসানের দেবীর মতো সে মুখ...
মেয়েটা বুঝি ডুবে মরেছে।
মেয়েটার চোখের নীচে কালশিটে,
মেয়েটার ঠোঁটের তলায় রক্তঝরার চিহ্ন।
মেয়েটার মুখের রেখায় রেখায় অপমানের ছবি আঁকা।
কে করেছে অপমান?
এমন করে মেরেছে কে?
কানাঘুষো চলছিল...
জানা গেল না কিছু।
শুধু জানা গেল মেয়েটা ডুবে মরার আগে তার মায়ের কাছে গিয়েছিল।

মা তাকে বলেছিলেন, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে...

মেয়েটা তবে মরল কবে?
আজ? না সেই দিনই, যেদিন তার জন্ম হয়েছিল?

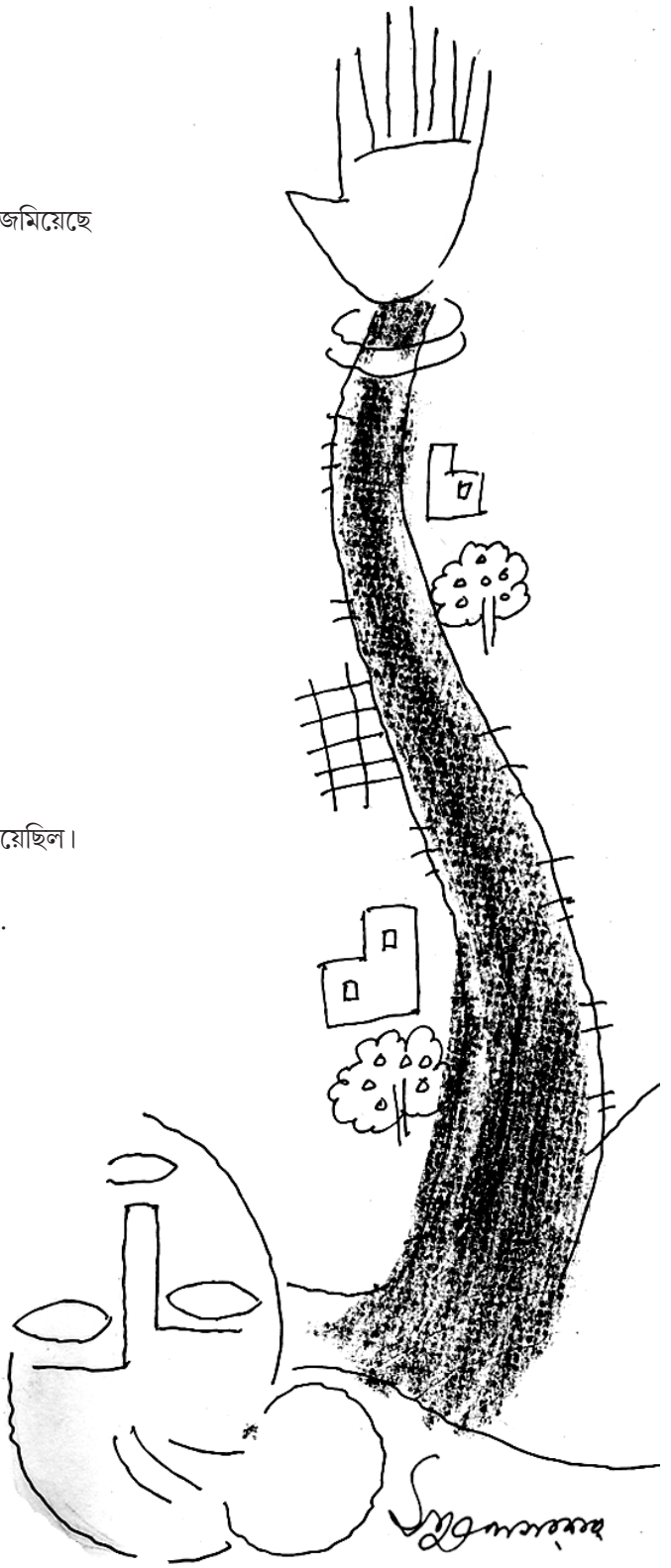

দূরের আকাশ

অস্ট্রেলিয়ার রয়্যাল ফ্লাইং ডক্টরস্

রাজর্ষি পাল

২০১৬ সালের অগাস্টের ৩০ তারিখে নেমেছিলাম পার্থ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। দেখতে দেখতে কয়েক বছর হতে চলল। বেশ কয়েক বছর ইংল্যান্ডে শিশু বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করে অস্ট্রেলিয়াতে এসেছিলাম অন্যধরনের কাজ নিয়ে— রয়াল অস্ট্রেলিয়ান ফ্লাইং ডক্টরসে।

ভারতবর্ষের প্রায় চারগুণ বিশাল এই মহাদেশে জনসংখ্যা সীমিত। দূরে দূরে ছড়ানো শহর বা জনবসতিগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। অনেক জায়গাতেই নেই চিকিৎসার সুব্যবস্থা। উন্নত এবং সর্বাধুনিক পরিষেবা পাওয়া যায় বড়ো শহরগুলিতেই। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এরোপ্লেনে বা হেলিকপ্টারে রোগীকে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয় বড়ো শহরগুলিতে। ট্রেন্ড ডাক্তার এবং নার্সদের নিয়ে উড়ে যায় বিমান। ইমারজেন্সি বা ফার্স্ট এড দিয়ে নিয়ে আসা হয় দূরদূরান্তের বড়ো শহরে— সিডনি, মেলবোর্ন, ব্রিসবেন, অ্যাডেলেড বা পার্থ-এ। চলে সর্বাধুনিক চিকিৎসার পরবর্তী পর্যায়।

এই যে বিমানে করে উড়ে গিয়ে ইমারজেন্সি বা প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া, এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের ট্রেনিং— অন্য ধরনের শারীরিক এবং মানসিক ফিটনেস। অত্যন্ত শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমের কাজ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা না খেয়ে, বা শুধুমাত্র গলা ভেজানোর জন্য সামান্য জলপান, নাগাড়ে দুই বা তিনদিন না ঘুমিয়ে, প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া না দিয়ে কর্তব্য কর্ম করে যাওয়া, প্রয়োজন মিলিটারি ফিটনেস। আমার দেখা অনেক চিকিৎসক বন্ধুই এই ধরনের কাজ থেকে শত যোজন দূরে থাকতে পছন্দ করেন।

সারা পৃথিবীতে একমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই এই ধরনের পরিষেবার ব্যবস্থা সুবিদিত। ডেডিকেশন, ইনটেগ্রিটি, ইনোভেশন হল ফ্লাইং ডক্টরসদের আদর্শ। ফ্লাইং ডক্টরসদের খরচের একটা বড়ো অংশ আসে চ্যারিটি বা ডোনেশন থেকে।

রেভারেন্ড জন ফ্লিন নামে এক খ্রিস্টান ফাদারের মাথায় প্রথম

আসে কীভাবে চিকিৎসার পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায় দূরদূরান্তের জনবসতিগুলিতে।

১৯১৭ সাল; ইউরোপ মহাদেশে তখন প্রথম মহাযুদ্ধের ডামাডোল। লেফটানেন্ট ক্লিফোরড পীল নামে এক অস্ট্রেলিয়ান পাইলট তখন ফ্রান্সে। সেখানে তাঁর অভিজ্ঞতা, কীভাবে রণক্ষেত্রে দূরদূরান্তে বিমানে করে সেনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে পরিষেবা। তাঁর অভিজ্ঞতা চিঠিতে ফাদার ফ্লিনকে জানান লেফটানেন্ট পীল। ১৯১৮ সালে রণাঙ্গনে মারা যান পীল। কিন্তু তাঁর আইডিয়া তিনি পৌঁছে দিয়েছেন ফাদার ফ্লিনকে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায় তখন। ১৯২৮ সালে ফাদার ফ্লিন জনসাধারণ এবং ব্যবসায়ী ও কোম্পানিগুলির কাছ থেকে জোগাড় করেন যথাসম্ভব আর্থিক অনুদান। অবশেষে ১৯২৮ সালের ১৭ মে, রয়্যাল ফ্লাইং ডক্টরদের প্রথম বিমান আকাশে ওড়ে কুইন্সল্যান্ড-এ। পাইলট আরথার অ্যাফ্লেক।

বর্তমানে ফ্লাইং ডক্টরদের খরচের বড়ো অংশ আসে সরকারি সাহায্য হিসাবে। খরচের আরেকটা অংশ আসে জনসাধারণের কাছ থেকে অনুদান হিসাবে। মহাদেশকে সাতটি অঞ্চলে ভাগ করে নিয়ে চিকিৎসা পরিষেবার মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করে ফ্লাইং ডক্টরস।

আমার বর্তমান কর্মস্থল পার্থ— মহাদেশের পশ্চিম তীরে ভারত মহাসাগরের পাড়ে। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, ছড়ানো শহর, ঝকঝকে পরিস্কার আকাশ আর দিগন্ত বিস্তৃত সীমাহীন মহাসাগর আমার কর্মভূমি। শহরের কেন্দ্রে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়ানো Childrenós Hospital– কিছু দুরেই কিংস পার্ক এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন। আদতে প্রাচীন অস্ট্রেলিয়ান অরণ্য ভূমির অবশিষ্টাংশ। বেশ কয়েক কিলোমিটার জুড়ে ছড়ানো, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাইকিং ট্রেল। জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়ে উঠলে দিগন্ত বিস্তৃত সোয়ান নদীর মোহানা এবং অন্যদিকে পার্থ শহরের গগনচুম্বী অট্টালিকা ও প্রাসাদের সারি।

ফ্লাইং ডক্টরদের বেস শহর থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে জ্যান্ডাকোট-এ। গোটা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ফ্লাইং ডক্টরদের হেড কোয়ার্টার। সঙ্গে ফ্লাইং ডক্টরদের আলাদা এয়ারপোর্ট এবং রানওয়ে।

আমার বিভাগ শিশুচিকিৎসা বা পেডিয়াট্রিক্স। শিশুদের ইনটেন্সিভ কেয়ার আমার স্পেশালিটি। মরণাপন্ন নবজাতক বা শিশুদের ভেন্টিলেটর দিয়ে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস এবং কৃত্রিমভাবে হার্ট, মগজ এবং অন্যান্য অঙ্গকে জীবিত রেখে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা অত্যন্ত ধৈর্য এবং মানসিক ও আবেগজনিত পরিশ্রমের কাজ।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অত্যন্ত জটিল এই চিকিৎসার কাজ

চলে; প্রয়োজন বিশেষ ধরনের চিকিৎসা এবং নার্সিং-এর ট্রেনিং। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যন্ত জটিল এই বিভাগ। অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই ধরনের চিকিৎসা। উন্নত দেশগুলিতে সরকার বহন করে এই ধরনের পরিষেবার খ রচ। অনন্তর গবেষণা হয়ে চলেছে কীভাবে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় মরণাপন্ন রোগীর বিভিন্ন অঙ্গকে।

আমাদের পরিষেবা ফ্লাইং ডক্টরদের পরিষেবার থেকে কিছুটা আলাদা। ফ্লাইং ডক্টরদের পরিষেবা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। দূরদূরান্ত থেকে যখন অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসার ডাক আসে, তখন আমাদের ডাক্তার এবং নার্সদের নিয়ে ফ্লাইং ডক্টরদের বিমান এবং পাইলট উড়ে যায়। আমাদের পরিষেবার নাম NETS বা Neonatal and infant Emergency Transport Service। আমাদের আছে নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। কিন্তু বিমান এবং পাইলটের প্রয়োজন হলে ফ্লাইং ডক্টরস বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের হাত।

দিনরাত্রি, ঝড়বাদল, শীতগ্রীষ্ম উপেক্ষা করে সাড়া বছর ধরে চলে এই পরিষেবা। আর্থিক লাভলোকসানের কোনো স্থান নেই এখানে। প্রয়োজন একমাত্র আবেগের তাড়না।

প্রতিদিনই পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কোথাও না কোথাও থেকে ডাক আসে আমাদের কাছে। টেলিফোন বা রেডিওতে আসে প্রথম কল। জেনে নেওয়া হয় অসুস্থ শিশুদের বিশদ বিবরণ। জানিয়ে দেওয়া হয় কী কী চিকিৎসা শুরু করতে হবে, যতক্ষন না ফ্লাইং ডক্টরদের টীম ঘটনাস্থলে পৌঁছচ্ছে। এরপর যোগাযোগ করা হয় জ্যান্ডাকোট-এ ফ্লাইং ডক্টরদের হেড কোয়ার্টারে। জেনে নেওয়া হয় আবহাওয়ার বিশদ বিবরণ এবং ঝড়বৃষ্টির আগাম সতর্ক বাণী। আমাদের স্পেশালিস্ট ডাক্তার এবং নার্সকে বিশেষ ট্যাক্সি বা অ্যাম্বুলেন্স-এ করে পৌঁছে দেওয়া হয় জ্যান্ডাকোট-এ। সঙ্গে জীবনদায়ী ওষুধপত্র এবং যন্ত্রপাতি— ভেন্টিলেটর এবং আরও নানা জটিল যন্ত্র।

আকাশে উড়ে যায় পাইলেটাস বিমান। কম করে এক থেকে পাঁচ ঘণ্টার আকাশ যাত্রা। আমার দেখা দূরদূরান্তের জনবসতি অঞ্চলে (শহরও বলা যায় না, ভারতের গ্রামগুলিতে এর থেকে বেশি মানুষ বসবাস করে) এয়ারপোর্ট যা, তাকে এয়ারপোর্ট বলা যায় না। ধূ ধূ লালমাটির দেশে অরণ্যের মধ্যে এয়ার স্ট্রিপ। ক্যাঙারুর পাল এসে বসে থাকে। বিমান নামার আগে নিকটবর্তী জনবসতি থেকে প্যারামেডিক'রা এসে ক্যাঙারু তাড়িয়ে প্লেন নামার ব্যবস্থা করে।

গন্তব্যস্থানের এয়ারপোর্ট-এ অপেক্ষারত সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নেওয়া হয় অত্যন্ত ভারী জীবনদায়ী যন্ত্রপাতি— ভেন্টিলেটর, ইনকুবেটর, অক্সিজেন সিলিন্ডার, সিরিঞ্জ পাম্প, ইলেক্ট্রনিক মনিটর, এবং বিশাল ব্যাগ ভর্তি জীবনদায়ী ঔষধপত্র, ইঞ্জেক্সন ও সরঞ্জাম। এরোপ্লেন থেকে নামিয়ে আম্বুলেন্সে এই সব জটিল এবং ভারী যন্ত্রপাতি তোলা অত্যন্ত জটিল এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ। বিশাল চেহারার ব্যায়ামপোক্ত প্যারামেডিকদের

দেখেছি এই কাজ সম্পন্ন করতে খুবই পোক্ত। প্রয়োজনে চিকিৎসক বা নার্সকেও হাত লাগাতে হয়।

আম্বুলেন্সে করে এবার পৌঁছানোর পালা নিকটবর্তী হাসপাতালে— সাধারণত আধঘণ্টার অ্যাম্বুলেন্স যাত্রা। দিগন্ত বিস্তৃত জনমানবহীন ভূ খণ্ডের মধ্যে প্রসারিত চওড়া পিচ ঢালা কালো রাস্তা, কখনো বা লাল মাটির দেশ, কখনো বা দুপাশে গভীর অরণ্যানী। লাফাতে লাফাতে রাস্তা পেরোয় ক্যাঙারুর পাল। পাহাড়, অরণ্য পেরিয়ে জনবসতি, এবং সেখানকার হাসপাতাল, শিশু রোগীর অবস্থা নির্ণয়, প্রয়োজনে নতুন করে চিকিৎসা শুরু এবং নতুন ওষুধ-পত্র এবং মনিটরিং। ফোনে বা প্রয়োজনে স্যাটেলাইট টেলিফোনে পার্থ-এ আমাদের হাসপাতালে যোগাযোগ করে জানাতে হয় রোগীর শারীরিক অবস্থা, চিকিৎসার পর্যায় এবং ভবিষ্যতে কী ধরনের চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলে এবার ইনকিউবেটরে তুলে আম্বুলেন্সে নেবার পালা। বেশ জটিল কাজ। ভেন্টিলেটর এবং অক্সিজেন দিয়ে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস, শিরার মধ্যে জীবনদায়ী ইঞ্জেক্সনের সারি, সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয় কোথাও যাতে কোনো বিচ্যুতি না ঘটে।
রওনা হবার আগে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবিভাবকদের জানাতে হয় শারীরিক অবস্থার বিবরণ এবং আনুমানিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা। পাহাড় অরণ্য পেরিয়ে আবার এয়ারপোর্ট এবং অ্যাম্বুলেন্স থেকে প্লেনে তোলার ঝকমারি, আবার কয়েক ঘণ্টার ফিরতি যাত্রা।

জ্যান্ডাকোট-এ নেমে আবার অপেক্ষারত অ্যাম্বুলেন্সে তোলা এবং ফিরে আসা আমাদের হাসপাতালে। অসুস্থ শিশুদের তুলে দেওয়া হয় অপেক্ষারত সার্জন, স্পেশালিস্ট এবং নার্সদের হাতে। হয়তো বা আবার বিমানে করে উড়ে যেতে হবে মহাদেশের অন্য কোনো প্রান্তে।

আমার অভিজ্ঞতায় এখন পর্যন্ত সব থেকে চ্যালেঞ্জিং উদ্ধারপর্বের এক বিবরণ—
মহাদেশের এক্কেবারে উত্তরে, সমুদ্রপাড়ে অবস্থিত শহর ডারউইন। পাশেই মালাক্কা প্রণালী। প্রণালীর ওপারে এশিয়া মহাদেশ। মালাক্কা প্রণালী দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে জাহাজ চলাচলের রুট। বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মালাক্কা প্রণালীর গুরুত্ব অপরিসীম।

ডারউইনের হাসপাতাল থেকে রেডিওতে মেসেজ আসে এক নবজাতককে উদ্ধারের আবেদন। জন্মলগ্ন থেকেই হার্টের অসুখ; প্রয়োজন ইমারজেন্সি অপারেশন। নইলে মৃত্যু অনিবার্য।
সড়ক পথে পার্থ থেকে ডারউইন প্রায় সাড়ে চারহাজার কিলোমিটার। প্রয়োজন দ্রুতগতি সম্পন্ন জেট বিমান। সাধারণ বিমানের কাজ নয়।

ডারউইন থেকে সাহায্য চেয়ে যোগাযোগ করা হয়েছিল অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী শহর ব্রিসবেন-এ। কিন্তু ব্রিসবেনের হাসপাতাল হার্টের এই জটিল অপারেশন করতে অপারগ। সাহায্যের আবেদন যায় অন্যান্য শহরগুলিতেও মেলবোর্ন এবং সিডনিতে। একমাত্র পার্থের হাসপাতালই সেই মুহূর্তে পারবে এই জটিল অপারেশন সম্পন্ন করতে।
সমস্যা এবার কী করে উড়িয়ে নিয়ে আসা যাবে এই শিশুকে। দ্রুতগতিসম্পন্ন এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজন— যা সেই মুহূর্তে ফ্লাইং ডক্টরদের নেই। শেষে মেডিক্যাল এয়ার নামে এক প্রাইভেট বিমান কোম্পানি তাদের দ্রুতগতি সম্পন্ন জেট বিমান ধার দিতে রাজি হল। প্রয়োজন এবার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ চিকিৎসক এবং নার্স। শেষে নার্সিং কলেজের বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্না এক বয়স্কা নার্সিং টিউটর এই দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন।
বিভিন্ন দেশে এবং জটিল পরিস্থিতিতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকায় ডাক পরে আমার। ইংল্যান্ডে বেশ কয়েকবছর শিশুদের হার্টের ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে কাজের অভিজ্ঞতা আমার আছে।

বিমান উড়ে যাবে ভোর চারটায়। আমার ডাক পড়ে রাত এগারোটায়। বলা বাহুল্য সেই রাতের সুখ-নিদ্রা নাস্তি। আমার ব্যাকপ্যাকে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ভরে মাঝরাতে পৌঁছালাম হাসপাতালে। আমাদের বিভাগে তখন যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। চেক করে নেওয়া হচ্ছে জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং ঔষধপত্র। ভেন্টিলেটর, ইনকিউবেটর, অক্সিজেন সিলিন্ডার, মনিটর, ব্যাটারি, সিরিঞ্জ পাম্প, রকমারি ইনজেকশন, সিরিঞ্জ, এবং আরও কত কী। যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি। একদল দক্ষ নার্স, প্যারামেডিক এবং টেকনিশিয়ান ব্যস্ত সবকিছু চেক করে নিতে।

ভোর তিনটেয় অ্যাম্বুলেন্সে সব জিনিসপত্র তুলে জ্যান্ডাকোট। অপেক্ষারত ঝকঝকে নীল রঙের নতুন জেট বিমান এবং দুজন বিশাল চেহারার ধোপদুরস্ত সাহেব পাইলট। বিমানে তোলা হল ভারী ভারী যন্ত্রপাতি এবং ব্যাগ। রানওয়েতে উড়ল বিমান। মিনিট দশেক পরে নামলো পার্থ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। জ্বালানি ভরে আবার আকাশে উড়ল।

রাতের অন্ধকার কেটে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে মহাদেশ। মেঘের অনেক ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে জেট। সূর্যোদয়ের অবর্ণনীয় দৃশ্য দেখছি অন্য এক জগত থেকে। মেঘের ফাঁক দিয়ে কখনো বা দেখা যায় হাজার হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত প্রাচীন মহাদেশ। দূরে দেখা যায় মহাসাগরের আভাস। যেন এক মহাজাগতিক, অপ্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা।
প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক বিমান যাত্রা। সাধারণ বিমানে এলে সময় লাগত এর প্রায় দ্বিগুণ। যন্ত্রপাতি বোঝাই ছোট্ট বিমানে নড়া চাড়া করারও জায়গা নেই। এয়ার অ্যাম্বুলেন্স। টয়লেটেরও ব্যবস্থা নেই। খাওয়ার কথা অনেক দুরের ব্যাপার। শুধু মাত্র গলা ভেজানোর জন্য কয়েক ফোঁটা করে জল। নিদ্রাহীন রাত আর একটানা জেট ইঞ্জিনের আওয়াজে ঘুমে জড়িয়ে এল চোখ। কিছুক্ষণের নিদ্রা প্রয়োজন। ফিরতি পথে টানা জেগে থাকতে হবে। প্রয়োজন অতিরিক্ত সতর্কতা।
ঘণ্টা পাঁচেক পর ডারউইনের এয়ারপোর্টে নামল বিমান। অপেক্ষারত

সমস্ত লেখক পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতা বন্ধুদের

জানাই আসন্ন উৎসবের শুভেচ্ছা

+91 33 2321 0004
CE 17, 3rd Cross Road, Sector 1
Salt Lake, Kolkata 700064, WB
www.banglastreet.online

বাংলাস্ট্রিট.online

Published by Look East Media Pvt. Ltd.

Powered by diahome
DIABETES CARE COMES HOME

অ্যাম্বুলেন্স এবং প্যারামেডিকরা। বিমান থেকে যন্ত্রপাতি নামানো এক বিশাল ঝকমারি। সাহায্যের আবেদন জানানো হল এয়ারপোর্টের ফায়ার ব্রিগেডকে। তাদের সাহায্যে নামানো হল যন্ত্রপাতি, তোলা হল অ্যাম্বুলেন্সে। আধঘন্টার যাত্রার পর পৌঁছানো গেল ডারউইনের হাসপাতাল-এ।

অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থা শিশু রোগীর। আদতে অস্ট্রেলিয়ার আদিম জনগোষ্ঠীর বা Aboriginal– তার জন্য এই বিশাল মহাযজ্ঞ দেখে আমি অভিভূত। চলছে ভেন্টিলেটর, শিরার মধ্য দিয়ে দেওয়া হচ্ছে রকমারি জীবনদায়ী ঔষধ। কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে ছোট্ট শরীরটাকে। সন্ত্রস্ত চিকিৎসক এবং নার্সরা। এভাবে আর বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। অত্যন্ত প্রয়োজন ইমারজেন্সি হার্ট সার্জারি, কয়েক ঘন্টার মধ্যে। সামান্য নাড়াচাড়া করতে গেলেই পড়ে যাচ্ছে ব্লাড প্রেসার, হতে চলেছে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। ইনজেকশনের ডোজ বাড়িয়ে আবার সচল করতে হচ্ছে হার্ট। ছোট্ট শরীর জুড়ে ইনজেকশনের সূচ, রকমারি টিউব এবং মনিটরের তার।
সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বুঝে নেওয়া হল। চেক করা হল সমস্ত রিপোর্ট এবং স্ক্যান। ফোনে যোগাযোগ করা হল পার্থে আমাদের হাসপাতালে। টেলি কনফারেন্সে অনেকক্ষণ চলল আলোচনা, হার্ট সার্জন এবং অন্যান্য স্পেসালিস্টদের সঙ্গে। পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলে সব্যস্ত হল আমাদের ইনকিউবেটরে তোলার। ভেন্টিলেটরের টিউব জোড়া হল আমাদের নিয়ে যাওয়া ভেন্টিলেটরে। আটখানা সিরিঞ্জ পাম্প লাগানো জীবনদায়ী ইনজেকশনগুলি লাগানো হল আমাদের সিরিঞ্জ পাম্পে। পালটে নেওয়া হল মনিটর।
ইনকিউবেটরে তোলার সময় আবার পড়ে গেল ব্লাডপ্রেসার। আঙ্ক বার বাড়ানো হল ইনজেকশনের ডোজ, আবার সচল করা হল হার্ট। ঘন্টা চারেক লাগল পরিস্থিতি সামাল দিতে। আবার অ্যাম্বুলেন্সে করে এয়ারপোর্ট। ফায়ার ব্রিগেডের পোক্ত ফায়ারম্যানদের সাহায্যে আবার তোলা হল বিমানে। ফের আকাশে উড়ল বিমান।

ফিরতি যাত্রায় এবার অতিরিক্ত সতর্কতা। বাইরের দৃশ্য উপভোগ করার আর সময় নয়। সারাক্ষণ মনিটরে সতর্ক চোখ রেখে বসে থাকা। পাঁচ ঘন্টার একঘেয়ে বিমান যাত্রা, গলা ভেজানোর জন্য নামমাত্র জল। হাত-পা নাড়তে গেলেও দুবার ভাবতে হচ্ছে। অপ্রশস্ত স্থান সংকুলান।

এই বিমান যাত্রাতেও কয়েকবার পরিস্থিতি সামাল দিতে হল। ইনজেকশনের ডোজ বাড়িয়ে সচল রাখতে হল হার্ট। সন্ধ্যে প্রায় ছটা নাগাদ জ্যান্ডাকোটের রানওয়েতে নামল বিমান। ফোনে যোগাযোগ করে হাসপাতালে জানাতে হল পরিস্থিতি।
জ্যান্ডাকোটে উপস্থিত অ্যাম্বুলেন্স এবং প্যারামেডিক। অনেক ঝকমারির পর অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল রোগীসহ ইনকিউবেটর, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং ঔষধপত্র। সাইরেন বাজিয়ে আধঘন্টার যাত্রার পর হাসপাতাল। নিয়ে যাওয়া হল ইন্টেন্সিভ কেয়ারে। হ্যান্ডওভার করে দেওয়া হল অপেক্ষারত সার্জন এবং অন্যান্য স্পেশালিস্টদের।
ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে শুরু হল হার্ট অপারেশন। কয়েক ঘন্টার জটিল সার্জারি। আরো কয়েক সপ্তাহ লাগল সম্পূর্ণ সুস্থ হতে। অবশেষে মহাদেশের উত্তরে নিজের জনগোষ্ঠীতে ফিরে যায় সম্পূর্ণ সুস্থ শিশুটি। অন্য বিমানে বিশেষ ব্যবস্থা করে নিয়ে আসা হয়েছিল অবিভাবকদের। কয়েক সপ্তাহ তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল হাসপাতাল সংলগ্ন গেস্ট হাউসে।
প্রায় ছত্রিশ ঘন্টার নিদ্রাহীন, খাদ্যপানীয়হীন অবস্থায় আমাদের থাকতে হয়েছিল চূড়ান্ত সতর্ক। আর দুদিন লেগেছিল স্বাভাবিক হতে।

STUDENTS OF 11 & 12
ATTENTION!
ADMISSION OPEN
GETTING STUDY VISA
FOR CANADA
IS EASY NOW
ONTARIO SECONDARY
SCHOOL DIPLOMA
Online classes delivered by
Colligiate
GROVEVILLE
elit World
Introduced in India by
Overseas Consultants
+91 33 2321 0004
+91 9830500609
overseasworkossd@outlook.com
website-www.overseas-consultants.com
CE-17, SECTOR-1, SALT LAKE CITY, KOLKATA-700064, INDIA

শতাব্দীর নায়ক

তিনি ভারতের প্রথম স্টাইল আইকন।

এবং হ্যাঁ , সেই ১৯৪৬ থেকে এই আজ অবধি স্টাইল বলতে আপনি যা বোঝেন তা-ই। এবং সেই স্টাইল তিনি নিয়েই এসেছিলেন , যাকে বলে কিনা একদম ইনবিল্ট।

নইলে প্রযোজক বাবুরাম পাইকে 'কী নাম ?' প্রশ্নের জবাবে বলতে পারতেন কি, 'দেব আনন্দ সার।' শুধু দেব আনন্দ ? জিজ্ঞাসা বটে।এবং বন্দুকের গুলির চেয়েও প্রম্পট উত্তর, 'দেবটা সার নাম, আর আনন্দ আমার পদবী। অবিশ্যি আগে ধরম আছে বটে একটা , কিন্তু ধরম নিয়ে যা চলছে দেখছি তাতে ও জিনিস উড়িয়েই দিলাম।শুধু দেব আনন্দ।'

আজ্ঞে হ্যাঁ , এই ছিল ধরমদেব পিশোরিমল আনন্দের উত্তর।এবং কখন ? না, দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি, চারের দশকের সেই অসম্ভব উত্তাল সময়টায়। এবং ঘটনাটা হল, সেই থেকে এই বছর ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত , মানে যখন তিনি পূর্ণ করে ফেললেন শতবর্ষের সোনালি দূরত্বরেখা, তখনো তিনি কিন্তু ওই দেব আনন্দই, আর কিছু নয়, কিচ্ছু না।

একটা সময়ে সেনা বাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরের বাসিন্দা , বড়ো আইনজীবীর পুত্রটি।অথচ বিশ্ব সিনেমায় যে হয়ে উঠবে সম্ভবত সেই এক নম্বর অভিনেতা, যার কেরিয়ার ছড়িয়ে থাকবে এক নয়, দুই নয়, দীর্ঘ আট আটটা দশক ধরে, এবং কেবল চরিত্র হিসেবে নয় , যাকে মুখ্য চরিত্রেই দেখতে চেয়ে আসবে আপামর ভারতবাসী, তার জীবন কি সেনা বিভাগে

সেন্সর অফিসের নিছকই একটা চাকরিতে বাঁধা থাকতে পারে ?
সারাটা জীবন বিশ্বাস করে এসেছেন গতিতে।তাই পকেটে মাত্র তিরিশ টাকা নিয়ে ১৯৪৩-এ ফ্রন্টিয়ার মেল ধরে বম্বে চলে আসা মানুষটি ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৪, দীর্ঘ এই দশটা বছর ছিলেন ভারতীয় মেইন স্ট্রিম সিনেমার সর্বাধিক রোজগেরে নায়ক। প্রত্যেক ছবিতে তখন তাঁর পারিশ্রমিক ছিল ৬০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা । আর এই সময়টায় কী কী ছবি করছিলেন তিনি ? 'ইনসানিয়াত', 'মুনিমজি', 'সি আই ডি', 'ফান্টুশ' 'পেয়িং গেস্ট', 'কালা পানি', 'মঞ্জিল', 'জব প্যার কিসিসে হোতা হ্যায়', 'হাম দোনো', 'আসলি-নকলি','তেরে ঘর কে সামনে' , 'গাইড' সহ সেই সব ছবি যা তখন ভারতীয় মেন স্ট্রিম হিন্দি সিনেমাকে বলে বলে পথ দেখিয়েছে। শুধু অভিনয়ই বা কেন, প্রযোজনাও করেছেন তিনি, পরিচালনাও করেছেন, কেবল তা-ই নয়, ১৩টি ছবির স্ক্রিপ্ট লিখেছেন , ছবিও করেছেন পরে সেসব স্ক্রিপ্ট নিয়ে। আবার অন্য দিকে জরুরি অবস্থার সময়ে যখন ইন্দিরাজীর সরকার একনায়কতন্ত্রী অবস্থান নিয়েছে দেব সাব তখন তার বিরোধিতা করতেও পিছপা হননি। কেবল তাই নয় এই সময়ে নিজে একটি রাজনৈতিক দল বানাতেও দ্বিধা করেননি তিনি। নাম দিয়েছিলেন 'ন্যাশনাল পার্টি অফ ইন্ডিয়া'। পরে নিজেরই হাতে অবশ্য সেই পর্বে ইতিও টানতে আঙুল কাঁপেনি তাঁর ।
প্রেমে পড়েছেন বারবার। চেয়েছেন পছন্দের নারীকে নর্ম্য সঙ্গিনী হিসেবে পেতে। কিন্তু যত বার প্রেম এসেছে ততবার নিঃসঙ্গতা এসে আছড়ে পড়েছে সাগরের ঢেউয়ের মতো। কখনো সে প্রেম কাহিনির কুশীলব তথা নায়ক নায়িকা দেব-সুরাইয়া, কখনো দেব-জিনাত আমন।আবার শুটিংয়ের মধ্যিখানেই গোপনে বিয়ে করে বসেছেন কল্পনা কার্তিককে। দেব আনন্দের এই সমস্ত প্রেম কাহিনিতে চোখ রাখলে কখনো কখনো মনে হয় নজরুল বুঝি তাঁকে দেখেই লিখেছিলেন সেই মারাত্মক লাইন 'আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা/ করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা/আমি উন্মাদ , আমি ঝঞ্ঝা ।' এমন জনপ্রিয়তার বহর ছিল দেব সাবের যা দেখে শেষে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয় এমনকি আদালতও। তখনকার বোম্বে আদালত দেব সাবের কালো পোশাকে বিধিনিষেধ অব্দি জারি করেছিল বলে শোনা যায়।

হিসেব মতো আটের দশক। দেবের বয়েস তখন ষাট ছুঁইছুঁই , তখনও নায়ক মানেই দেব না হলেও নায়কের ভূমিকায় কাজ করেছেন তিনি। সেই হিসেবে দেখলে দেবের ছবি ১১৫টি হলেও সমসাময়িক তো বটেই, এমনকি পেশোয়ারে প্রতিবেশী রাজ কাপুরের ছবি মাত্র ৩০ আর আরেক সহচর, লেজেন্ড দিলীপ কুমারের ? হাতে গুণে দেখুন, ৪৮। অথচ প্রায় একই সময়ে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন তিন জনেই।এমনকি সাফল্যের খতিয়ানও যদি দেখেন , দেখা যাবে সেখানেও তাঁরা পরস্পরের কাছাকাছি।

সিনেমাকেই জীবনে ধ্রুবতারা করে নিয়েছিলেন তিনি।এক কথায় প্রাচ্যের গ্রেগরি পেক। সিনেমা বলতেন না দেব সাব। বলতেন মোশন পিকচার।ছিলেন অনমনীয় রোম্যান্টিক। সে রোম্যান্টিসিজমের টুকরো কথন উঠে এসছে কখনো তার নায়িকা ওয়াহিদা রেহমানের কথায়, কখনো আবার আশা পারেখ্, কখনো বা অন্য কারো জবানীতে।

এমনিতে খুবই অল্প খেতেন দেব সাব। কিন্তু ছিলেন অভাবনীয়রকম শৌখিন , বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়ায়। আর যেখানেই যান না কেন, হিসেব বলছে, ভারতীয় খাবার ছাড়া চলত না তাঁর । রাতে রুটি আর দুপুরে ভাত ছিল মানুষটির ডায়েট। এবং সেটা সেই ৮৮ বছর বয়েসে লন্ডনের গ্রিন পার্কের ওয়াশিংটন মে ফেয়ার হোটেলে ২০১১-র ডিসেম্বরে

Overseas Consultants

26 Year

PUJA WISHES FROM

OVERSEAS CONSULTANTS
OC CONSULTANTS PVT. LTD.
OVERSEAS EDUCATION TRUST
BANGLASTREET
SEMEY MEDICAL UNIVERSITY, KAZAKHSTAN
LOOK EAST MEDIA PVT. LTD.
PROVIVA CONSULTANTS(INDIA)LLP
MEERA INTERNATIONAL FILMS
KROMOSOM DIAGNOSIS LLP
PSC MEDISERVICES PVT LTD
DIAHOME
ONTARIO SECONDARY SCHOOL DIPLOMA (OSSD), CANADA
NATIONAL INSTITUTE OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT

CE –17, SECTOR – 1, SALTLAKE
KOLKATA – 700064

Study Abroad

MBBS IN KAZAKHSTAN

SMU
1953 SEMEY MEDICAL UNIVERSITY

SEMEY STATE MEDICAL UNIVERSITY

Celebrating

25th Anniversary of the introduction of "English Language" as Medium of Studies in Kazakhstan and Central Asia Pioneered by

Semey Medical University

Following all NMC guidelines

- Course duration 5 Years + 1 Year internship
- Own Hospital for Practice / Internship
- License to Practice Available (Exam in English language)

- No.1 ranked university in Kazakhstan
- Seperate floors for Boys and girls in campus hostel with Indian food available
- No entrance exam / affordable fees structure
- Large number of Indian students
- Direct flights from India have been introduced

+91 33 2321 0004 +91 9830500609 overseaswork99@gmail.com
website-www.overseas-consultants.com
CE-17, SECTOR-1, SALT LAKE CITY, KOLKATA-700064, INDIA

চোখ বুজবার দিনটি পর্যন্ত।

২০০৭-এ বেরোনো আত্মজীবনী 'রোম্যান্সিং উইথ লাইফ অ্যান অটোবায়োগ্রাফি'-র পাতায় নিজেকে মেলে ধরেছিলেন নিঃসঙ্কোচে সব কিছু প্রকাশ করার আর্জি নিয়ে। এ বই বেরিয়েছিল তখন পেঙ্গুইন ভাইকিং থেকে। এবং সে বই প্রকাশ ও বিশ্বে এ বই প্রচারের অনুষ্ঠান নিয়ে গোটা পৃথিবীই প্রায় দেব সাবের সঙ্গে যিনি টহল দিয়েছিলেন তিনি বাংলা স্ট্রিট পত্রিকার কর্ণধার আশিস পণ্ডিত এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭-এ কলকাতায় স্বয়ং দেব আনন্দ এবং প্রয়াত প্রাক্তন ক্রীড়া মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী সহ বহু বহু বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে পার্ক হোটেলে সে বই প্রকাশ অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্বে ছিল লুক ইস্ট মিডিয়া। ২০১১-র ডিসেম্বরে দেব সাব লন্ডনে ওয়াশিংটন মে ফেয়ার হোটেলে যেদিন প্রয়াত হন ঘটনাচক্রে সেই দিনেও লন্ডনে ওই হোটেলের কাছাকাছি আরেক হোটেলে উপস্থিত ছিলেন শ্রী পণ্ডিত এবং বাংলা স্ট্রিট পত্রিকায় সেই দিনের ঘটনার প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপে দেব সাবের বহু গল্প শুনেছে এই প্রতিবেদক। তাঁর সঙ্গে সাম্প্রতিক এক কথোপকথনে মনে আছে তিনি বিশ শতকের এই সুপার স্টার তথা স্টাইল আইকনের সম্পর্কে বলেছিলেন , 'দেব সাব দশকের আনন্দ সঙ্গী হতে চাননি, তিনি আমাদের শতাব্দীর নায়ক।'

WITH BEST COMPLIMENT FROM

(+60) 11 3999 2628, (+60) 19 254 4099

Tel : +603 9775 0526

SRAM & MRAM RESQURCES BERHAD

LEVEL27, MENARA EXCHANGE

106 LINGKARAN TRX, TUN RAZAK EXCHANGE

55188 KUALAUMPUR,MALAYSIA

www.srammram.com

SAPTHAGIRI, PADMAVATHI &
PEE GEE GROUP OF INSTITUTIONS, DHARMAPURI
(An ISO 9001: 2008 Certified Institutions)

Education Can Change the World

SAPTHAGIRI GROUP OF INSTITUTIONS DHARMAPURI — Excellence In Education — Since 1993

SAPTHAGIRI College of Engineering — Creating Tomorrow

SAPTHAGIRI COLLEGE OF ENGINEERING
(Approved by AICTE New Delhi & Affiliated to Anna University,Chennai)

BE	Civil I Mech I EEE I ECE I EIE I CYBER SECURITY
BTECH	IT I ARTIFICIAL INTELLIGENCE(AI) DATA SCIENCE
M.E	CSE I PSEI SE
MCA	MBA

SAPTHAGIRI COLLEGE OF EDUCATION
(Approved by The Govt. of Tamil Nadu- Recognized by NCTE, Bangalore & Affiliated to Tamil Nadu Teacher's Education University, Chennai)

B.Ed. (2 years)

D.Ted (2 years)

PEE GEE COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
(Approved by AICTE New Delhi & The Govt of Tamil Nadu Affiliated to the Periyar University,Salem)

UG	PG
BSC (Mathematics, Computer science, Bio chemistry,Microbiology,Physics, Chemistry, Bio Technology)	MSC (Mathematics, Computer science, Bio chemistry,Microbiology,Physics, Chemistry, Bio Technology)

UG:
- B.C.A
- B.B.A
- B.COM
- B.A (TAMIL/ENGLISH)
- B.Lit. (TAMIL)
- B.SC Hotel Management

PG:
- M.Com
- M.A (TAMIL)
- M.A (ENGLISH)
- M.SC Industrial Microbiology
- M Phil (Commerce/Management (Part Time/Full Time)
- M.Phil (TAMIL) (Part Time/Full Time)
- M.B.A
- M.C.A

PEE.GEE POLYTECHNIC COLLEGE
(Approved by AICTE New Delhi & Affiliated to DOTE, Chennai)

- DECE
- DEEE
- DCSE
- DME

PADMAVATI COLLEGE OF PHARMACY
(Affiliated To The Tamil Nadu Dr M.G.R University,Chennai, Approved By AICTE, PCI- New Delhi)

Doctor of Pharmacy (Pharm.D) - 6 years
Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) - 4 years
Diploma in Pharmacy (D.Pharm) - 2 Years
Master of Pharmacy (M. Pharm) – 2 Years
Master of Pharmacy (M. Pharm) – 2 Years

- Pharmaceutics
- Pharmacognosy
- Pharmacology
- Pharmacy Practice
- Pharmaceutical Analysis
- PH.D

PADMAVATI COLLEGE OF NURSING
(Affiliated To The Tamil Nadu Dr M.G.R University, & TNNMC Chennai. Indian Nursing Council, New Delhi)

BSC Nursing (4 Years)

GNM (3 years)

NO DONATION | 100 % PLACEMENT | 100 % SCHOLARSHIP | HOSTEL AVAILABLE | BUS FACILITIES AVAILABLE

FOR FURTHER DETAILS CONTACT
87544 37007 I 97864 34244 I 90877 02696
87548 72666 I 87548 73666 I (04348) 247782/ 27880

CAMPUS- NH-44 BANGALORE-SALEM MAIN ROAD, PERIYANAHALLI, DHARMAPURI- 635 205
EMAIL- admissions@sapthagiri.edu.in WEBSITE- https://sapthagiri.edu.in

Banglastreet, UTSAV, Registered: KOLRMS/2012-2014 RNI NO: WBBEN/200935299 INR: 100.00 Printed at Calcutta Graphic Pvt. Ltd., 3B Maniktala Industrial Estate, Ultadanga , Kolkata-700054 & Published by Ashis Pandit at CE-17, Saltlake, Sector-1, Kolkata-700064

(A Satyam Roychowdhury initiative)

TECHNO INDIA GROUP

Harnessing Technology. Enriching Lives.

Techno India Group

The power to empower

Best Wishes

EDUCATION | MEDIA & ENTERTAINMENT
HEALTHCARE | HOSPITALITY

Head Office: Chatterjee International Centre, 12th Floor, 33A, Chowringhee Road, Kolkata 700 071, West Bengal, India | Ph : +91 33 2226 4396/9785, 2217 0733

Corporate Office: Techno India Group, 7th Floor, EM 4/1, Sector V, Salt Lake, Kolkata - 700 091, West Bengal, India | Ph : +91 33 2357 6163/6164/ 6183/6184

Techno India Group Global Headquarters: DG 1/2 Action Area 1, New Town, Kolkata - 700 156
Toll-Free: 18002588155

www.technoindiagroup.in